



ଓଢ଼ିଆ ଶିକ୍ଷା

ସୁରେଶଚନ୍ଦ୍ର ନନ୍ଦୀ
ପ୍ରଣୀତ

ଇତିହାସାଚାର୍ଯ୍ୟ
ଉତ୍ତର ସହନାଥ ମହାବଳ, କେ-ଟି, ମି-ଆଇ-ଇ
ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ, ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ

ବସୁନ୍ଧରୀ ମାହିତ୍ୟ ମନ୍ଦିର
(ବସୁନ୍ଧରୀ କର୍ପୋରେସନ ଲିମିଟେଡ)
୧୦୦, ବିନିମିତ୍ତ ବିହାରୀ ମାଲୁଣୀ ଗ୍ରୀଟ, କଲିକତା—୭୦୦୦୧୨

বঙ্গবতী কর্পোরেশন লিমিটেড
১৩৯, মিনি বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০১২



মূল্য—আট টাকা

DIPSIKHA LIBRARY
1469 No. 4.6.8

শ্রীমদীন্দ্রলাল দত্ত কর্তৃক
বঙ্গবতী প্রেস হইতে
মুদ্রিত ও প্রকাশিত



পরম শ্রদ্ধাস্পদ

ইতিহাসাচার্য্য

স্যর যতুনাথ সরকার কে-টি, সি-আই-ই

করকমলেন্দু—

আচর্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অন্তিমত :

শ্রদ্ধাঙ্গদেবু,

ইদানীং আমার শরীর অগটু। এই কারণে আপনার পুস্তিকাখানি রাখিয়া দিয়াছিলাম যে শূন্য হইলে ধীরে ধীরে পড়িব। কিন্তু সেদিন খুলিবারাত্র আর পড়িবার লোভ সামলাইতে পারিলাম না। কয়েক দিনে অল্প অল্প করিয়া আত্মোপাস্ত পড়িয়া ফেলিলাম। বাস্তবিক বাংলা-সাহিত্যকে আপনি একটি অপূর্ণ রত্ন উপহার দিলেন। “ওমর খৈয়াম” বুঝিতে হইলে সেই সময়ের কি প্রকার আবেষ্টন ও পারিপাশ্বিক অবস্থার মধ্যে কবি জালিত ও বদ্ধিত হইয়াছিলেন, তাহা বিশদরূপে জানা আবশ্যক। এই হিসাবে “মুসলিম দর্শনে গ্রীক প্রভাব” পরিচ্ছেদটি বড় শিক্ষাপ্রদ হইয়াছে। এই পুস্তক লিখিতে আপনি যে কত গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহার মর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাহা পাদটীকা দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। আমি সন্দেশ পাঠিয়া Imperial Library হইতে Arabic Thought and its Place in History, by De Loay O' Lary ও Literary History of Arabs by Nicholson আনাইয়া পাঠ করিতেছি। বাংলা-সাহিত্য আজ গল্প, উপন্যাস ও নভেল দ্বাবিভ। এককথার বলিতে গেলে, কথাসাহিত্য বাদ দিলে বাংলা-সাহিত্যের কিছুই থাকে না। আপনার “ওমর খৈয়াম” এই অল্প বড়ই আদরের সামগ্রী। আশা করি, সাহিত্য-সেবিগণ ইহার রসপানে পরিতৃপ্ত হইবেন।

ইউনিভার্সিটি কলেজ অব

সাহিত্য

কলিকাতা

তাং—২৪/১০

দ্বিতীয়—

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায়

ওমর খয়াম

জীবিকা-সংগ্রাম-ক্ষেত্রে যুদ্ধাঙ্গন দরিদ্রের ঘরে
অগ্নিরা, মনোবা-শীর্ষে উঠেছিলে বিধাতার ঘরে ;
সৃষ্টির মরম-লীন বৈত-হীন একেতে প্রভাস
অন্তরে প্রদীপ্ত রাখি' জ্ঞান-রাজ্য করে' গেছ অর ;
ব্যাখ্যাত জীবন-তত্ত্ব, ছিল সত্য কে ভাবে কোরাণে,
তুমি তবু অর্থ লাগি, চেয়েছিলে বিশ্ব-গ্রন্থ-পানে ।

কালের বিশাল বক্ষ বিদারিয়া শানিত গণিতে,
দেখে গেছ—কী বীজাণু প্রবাহিত তাহার ষোণিতে ;
ব্যাপ্তিয়ে শতধা করি' জ্যামিতির রেখা-শরজালে
পরীক্ষিলে—কান্ তথা লীলারিত তা'র অন্তরালে ;
ঐকল-প্রাণের কল বায়ু-জল-ওবধির সাথে
যুক্ত কোন্ রসায়নে—দেখিলে তা' ধ্যান-নেত্র-পাতে ।

রক্তে রক্তে উদঘাটিয়া নক্ষত্রের জ্যোতির্ময় দ্বার,
দ্যালোকের নিমন্ত্রণ নিয়ে যবে এল অন্ধকার—
বাহিরিলে মহোল্লাসে, গুণিতে কী আলোকিত বাণী
জ্যোতিষ্কের লীলাচক্রে শূণ্যে শূণ্যে করে কানাকানি ।
মথিয়া জীবন-সিদ্ধু—সু-চিহ্নিত সুধা-বিষ তার
কবিতার পানপাত্রে পিপাসুরে দিলে উপহার ।

অস্তিম্বে, চরম-অর্থ কেদ্রীভূত একটি নতি-তে
জীবন আহুতি দিলে না-জানি-কি-পরমা-জ্যোতিঃতে—
ভেসে এল শেষ কথা—“অমৃতোর তোমারি সন্ধান
করেছি বিচিত্র পথে...আজ বন্ধু...অর্থ্য লও প্রাণ”—
নির্মীলিত নেত্রযুগ্ম সৌর-দৃষ্টে খুলিল না আর,
শিগেরা মাটির মা'কে সমর্পিল মর্ত্যদেহ তার ।

—ঐবিকল্পক বোম

আত্মকথা

বিভিন্ন সময়ে ‘প্রবাসী’, ‘বহুমতী’, ‘ভারতবর্ষ’, ‘কল্লোল’ প্রভৃতি মাসিকে প্রকাশিত ওমর খৈয়াম সম্পর্কীয় প্রবন্ধগুলি আবশ্যিকমত সংশোধিত হইয়া এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইল। যে সমস্ত পুস্তক ইহাতে ওমর-সদৃশীয় তথ্য সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহাদের সংখ্যাবাহুল্য পৃথক পৃথক ভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকারের পরিপন্থী হওয়ায় পাঠসিদ্ধার কল্পনামে ঋণের নিদর্শন-রূপে দেখানো গিয়াছে। ইতিহাসাচার্য্য পরম প্রকাশ্য ‘মুদ্রা’ সম্রকার কে-টি, সি-আই-ই মহোদয় আমার এই যত্নসামান্য গ্রন্থের মূল্যবান ভূমিকা লিখিয়া এই নগণ্যের ললাটে রাঙটিকা পরাইয়া সম্মানিত, উৎসাহিত এবং এই পুস্তকের মূল্য বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছেন।, একান্ত তাঁহার নিকট চিরকৃতজ্ঞ রহিলাম।

এই পুস্তকে ব্যবহৃত ‘রুবাইগুলি’ সুলেখক বন্ধুবর, শ্রীযুক্ত ‘বিভিন্নরক’ ঘোষের অনূদিত ‘রোবাইয়াৎ’ ও তাহার অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি; ইহাতে গৃহীত। তিনি ওমর খৈয়ামের উদ্দেশে একটি কবিতা লিখিয়া এবং অসঙ্গত সাহায্যদানে পুস্তকের সৌষ্টব্য-বৃদ্ধির দিকেও প্রচুর সহায়তা করিয়া অমুগৃহীত করিয়াছেন।

ভারতবর্ষ সম্পাদক অগ্রঅপ্রতিম রাঘবহাভর শ্রীযুক্ত জলধরদাস ও কল্লোল সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীযুক্ত দীনেশরঞ্জন দাশ, যথাক্রমে কবি ওমর, ওমর খৈয়ামের সমাধি এবং জ্যোতির্বিদ ওমরের রুক ব্যবহার করিবার অহুমতি দিয়া আমাকে অমুগৃহীত করিয়াছেন।

নিবেদন

পরমপূজ্য পিতৃদেব রচিত ‘ওমর খৈয়াম’ গ্রন্থখানির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হল। বইখানি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩৬ সালে। দীর্ঘকাল পরে মাসিক বঙ্গুমতীয় তদানীন্তন সম্পাদক ও প্রকাশন বিভাগের অধিকর্তা অক্সেয় প্রাণতোষ ঘটকের আগ্রহে ১২৭০ সালে দ্বিতীয়বার মুদ্রিত হয়। প্রথম প্রকাশের সময় সাহিত্যজগতে বইখানি যেমন সাড়া জাগিয়ে ছিল, দ্বিতীয়বার প্রকাশের সময়ও ঠিক তেমনি আলোড়ন সৃষ্টি করে। কয়েক বছরের মধ্যেই বইখানি নিঃশেষিত হয়ে যায়। তৃতীয় মুদ্রণের জন্য বারবার তাগিদ আসে বিদগ্ধ পাঠকবর্গের কাছ থেকে।

এবার গ্রন্থের পরিশিষ্টে কয়টি বিষয় সন্নিবেশিত করা হল, প্রথম গ্রন্থকার কর্তৃক অনূদিত (ই. এইচ. ছইনকিল্ডের অনুবাদ অনুসরণে) সাতাশটি রুবাই, দ্বিতীয় গ্রন্থকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ও একটি সুদৃশ্য চিত্র। এবার গ্রন্থের ষষ্ঠাঙ্কানে দেওয়া হল কবি ওমর খৈয়াম, জ্যোতির্বিদ ওমর খৈয়াম ও ওমর খৈয়ামের সমাধির চিত্র। রুবাইগুলি প্রথম প্রকাশিত হয় আজ থেকে বাহার বছর আগে অধুনালুপ্ত “বীণারী” মাসিকপত্রে। সংক্ষিপ্ত লেখক পরিচিতিটি লেখকপুত্র কর্তৃক রচিত। নির্ঘণ্টটি প্রস্তুত করেছেন লেখকের পৌত্র শ্রীমান শ্রুতকুমার নন্দী। গ্রন্থের শ্রী ও সৌন্দর্য বর্ধনে নানাভাবে সহায়তা করেছেন অগ্রজপ্রতিম প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীশৌরীন্দ্র কুমার ঘোষ। এঁদের সকলকে আমার সন্তুষ্টিভাৱে অভিবাদন জানাই।

নতুন সংযোজনগুলি আশা করি গ্রন্থের শ্রী এবং সাহিত্যিক মূল্য বৃদ্ধি করবে এবং বিদগ্ধ পাঠক সাধারণের মনোরঞ্জন করতে সক্ষম হবে।

১৬, কালিদাস লাইভ্রী লেন,
কলিকাতা-৩৬
৮ই আষাঢ়

বিনত—
দীপঙ্কর নন্দী

সূচী পত্র

ভূমিকা—শ্রী বহুনাথ সরকার

xiv

সূচনা

১—৬

প্রথম পরিচ্ছেদ

ওমর খৈয়ামের জন্মভূমি

৭-১১

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিজ্ঞানগ্রে ওমর ও তিন বছর গল্প

১২-১৭

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ওমর-শুরু আবু আলি সিনা

১৮-২৬

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

: পৃষ্ঠপোষক বঙ্কুলাত

২৭-৩১

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গদিতবিদ ওমর খৈয়াম

৩২-৪১

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞান

৪২-৪৮

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জ্যোতির্বিদ ওমর খৈয়াম

৪৯-৬৬

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জানভপখী ওমর খৈয়াম

৬৭-৮২

নবম পরিচ্ছেদ

মুসলিম দর্শনে গ্রীক প্রভাব

৮৩-৯৭

(xiii)

দশম পরিচ্ছেদ

দার্শনিক ওমর খৈয়াম

২৮-১১৫

একাদশ পরিচ্ছেদ

কবি ওমর^{*} খৈয়াম

১১৬-১৫২

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পরিসমাপ্তি

১৬০-১৬৪

পরিশিষ্ট

রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম

১৬৫-১৭১

গ্রন্থকারের পরিচিতি

১৭২-১৮০

নিবন্ধ

১৮১

ভূমিকা

স্যর যত্নাথ সরকার, কে-টী, সি-আই-ই লিখিত

প্রাচীনকালে ভূমধ্যসাগরের পাশের দেশগুলিতে যে সভ্যতার বিকাশ হয়, তাহা ক্রমে পূর্ণতা লাভ করিয়া, রোম-সাম্রাজ্যের সাহায্যে সভ্যজগৎ ছাইয়া ফেলে ; কিন্তু পরে ঐ সাম্রাজ্যের পতনের সঙ্গে সঙ্গে সে সভ্যতা লোপ পায়। আবার, কয়েক শতাব্দী অতীত হইলে, মধ্য-যুগের শেষে বর্তমান ইউরোপীয় সভ্যতার আবির্ভাব এবং ক্রমবিকাশ হইয়াছিল। সময়ের হিসাবে এই দুই সভ্যতার মধ্যবর্তী হইয়া আরব-সভ্যতা, সেতুর মত এই পুরাতন ও নূতনকে যোগ করিয়া দিয়াছিল, এক হইতে অপরে পৌঁছান মানবজাতির পক্ষে সম্ভব করিয়াছিল। কারণ, জগতে হঠাৎ-সৃষ্টি বলিয়া কিছুই নাই ; প্রত্যেক সভ্যতাই পূর্ববর্তী সমস্ত সভ্যতার নিকট কমবেশী ঋণী ; তাহাদের অঙ্গগুলি পার্শ্ববর্তিত পরিবর্তিত করিয়া নিজের কাজে লাগাইয়াছে এবং কালক্রমে নিজে রূপান্তরিত হইয়া পরবর্তী যুগের সভ্যতার বিকাশে সাহায্য করিয়াছে। কোম যুগেই মানব একা দাঁড়াই না, সে পিতার পুত্র এবং পুত্রের পিতা।

সুতরাং, যেমন নৃত্যবিদেরা দেখাইয়াছেন যে অবিমিশ্র-রক্তের কোন জাতি নাই, তেমনি ইতিহাস প্রমাণ করিতেছে যে, সব সভ্যতাই একটি মিশ্র-দ্রব্য, নানা স্থান নানা যুগ হইতে ধার করা অংশ দ্বারা গঠিত। এই জগৎ আরব-সভ্যতা শুধু মুসলমানদের নিজস্ব সম্পত্তি অথবা একটি জাতিবিশেষের গোঁরবের সামগ্রী নহে ; ইহাতে জগতের সকলেরই স্বার্থ আছে। আমরা ইহার নিকট ঋণী এবং ইহা আরব নহে এমন জাতি—যেমন, গ্রীক, হিন্দু, আর্ঘ্য-ইরানীর পূর্বপুরুষদের নিকট ঋণী। এই আরবেরা না থাকিলে সেই প্রাচীন সভ্যতা লোপ পাইত, বর্তমান জগতকে আবার সব জিনিষ নূতন করিয়া গড়িতে হইত, ইহাই আরবজাতির জগতে প্রতিষ্ঠার কারণ।

এই আরবজাতির ইতিহাস ও সভ্যতা শত শত বৎসর ধরিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা অতি গভীর বিদ্বত ও সূক্ষ্মরূপে চর্চা করিয়াছেন। তাহার পূর্বে এই বিষয়ে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত কম ও কাঁচা ছিল ; অল্প প্রশংসা, গোড়ামীর বিদ্বেষ, অথবা নবলের নবল ইহার তিস্তি ছিল। কিন্তু এখন আদিতম ঐতিহাসিক উপাদানগুলির বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে পরীক্ষা ও প্রকাশের ফলে আমাদের জ্ঞান এখন সত্যের দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত, সূক্ষ্ম অথচ পূর্ণাঙ্গ এবং সর্ব বিভাগে ব্যাপক। প্রাচীন কাঁচা লেখার দৃষ্টান্ত Draper's History of the Intellectual Development of Europe, আর তাহার ইংরাজী অনুবাদ আমীর আলীর History of the Saracens-এ।

এই নবীন ঐতিহাসিক-তত্ত্ব এতদিন পর্য্যন্ত ফরাসী ও জার্মান ভাষায় আবদ্ধ ছিল। অল্প কয়েক বৎসর হইল Encyclopaedia of Islam ইংরাজীতে বাহির হওয়ায়, : অধ্যাপক ব্রাউন প্রমুখ সাহেবের মৌলিক লেখায়, এবং জার্মান ইসলাম-তত্ত্ববিদগণের গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ আরম্ভ হওয়ায়, ইংরাজী ভাষাবিদেৱা ইহার অনেকটা আদ্বাদ পাইতেছেন।

এই নব্য সংশোধিত জ্ঞানের বাঙ্গলায় প্রচার আবশ্যক। অগতের অগ্র ই ইসলাম কি করিয়াছে তাহা জানিতে হইলে আমীর আলীর গ্রন্থের বাঙ্গলা অনুবাদের উপর নির্ভর করিবার দিন চলিয়া গিয়াছে। শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র নন্দীর “ওমর খৈয়াম” এই হিসাবে বিশেষ মূল্যবান। ইহাতে ওমরের কাব্যের লালিত্য ও দর্শনের দৃষ্টিতা প্রভৃতি বিষয়ের বিচার আছে বটে, তাহা অল্পও বাঙ্গলায় আলোচনা হইয়াছে। কিন্তু এই গ্রন্থে আরব-সভ্যতার বিকাশ, জ্ঞানের বিভাগগুলি, এবং প্রত্যেক বিভাগে পূর্ব-পরের কি সহজ তাহার বর্ণনা ও তুলনামূলক সমালোচনা করিয়া এবং নবীনতম ও প্রামাণিক গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থগুলির তথ্য ও মত

উদ্ধৃত করিয়া, লেখক বঙ্গভাষার ইতিহাস-বিভাগের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছেন।
মধ্যযুগে পশ্চিম এসিয়ার সভ্যতার ইতিহাস হিসাবে এই বইখানি
বঙ্গভাষার নবীনতম, সম্পূর্ণ এবং শ্রেষ্ঠ।

ওমরের সময়ে খোরাসানে যে সর্বতোমুখী সভ্যতা দেখা দিয়াছিল,
তাহার সুখ-পাঠ্য ও বিস্তৃত বর্ণনা এবং সমালোচনা বিস্তৃতভাবে এই গ্রন্থে
দেওয়া হইয়াছে। যাহারা ‘ওমর’ বলিতে শুধু বুলবুল ও গোলাপ,
মদ্রিয়া ও সাকী-র কথা ভাবেন, তাঁহারা দেখিবেন যে লোকটা কবি ও
ভোগী মাত্র ছিল না,—কঠোর গণিতবিদ এবং গভীর দার্শনিকও। ওমরের
প্রতিভার প্রতি ত্রায়বিচার করিবার অণু আমরা লেখকের নিকট ঋণী।

ওমরের কবিতার শিক্ষা যে ভোগতত্ত্ব নহে,—লোকটা যে “পিত্তা
পিত্তা পুনঃ পিত্তা পপাত ধরলীতলে”র দৃষ্টান্ত নহে, তাহা এই গ্রন্থে প্রমাণ
করা হইয়াছে। নন্দী মহাশয় লিখিতেছেন,—

“তাঁহার চতুষ্পদীগুলি জীবন ও জগতের বিরাট দায়িত্ব-কথা অতি
উজ্জলভাবে চক্ষের সম্মুখে তুলিয়া ধরে * * * সংসারের মোহজালে আবদ্ধ
হইয়া ধরলীকেই আবাসস্থল মনে করায় তিনি আপন আত্মাকে তীব্র
তিরস্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে আত্মা এক অপার্থিব শক্তি,
যাহা পার্থিব আধারের বিলোপে যুক্ত হইয়া উচ্চতর পরিণতি লাভ
করিবে। * * * বৈয়াকরণের আত্ম-অনুভূতি কোন নির্দিষ্ট ধর্মের বা সমাজের
গভীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না।” (২ পৃষ্ঠা)

আশা করি, এই গ্রন্থের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে ওমর এবং মুসলমান-জগৎ
সম্বন্ধে অনেক ভ্রান্ত বিশ্বাস বঙ্গদেশ হইতে দূর হইবে।

ওষর থেয়ায

সূচনা

এই দুঃখ-দৈন্ত-ক্লিষ্ট বাঙা-বিস্কট সংসার-বক্ষে, জগৎ-জোড়া বিবর্তের মাঝখানে, জীবন-সূত্রে ক্ষত ক্লান্ত মানুষের প্রাণে একটা নিকরবেগ আমোদ বা একটু অনাবিল সুখ-সন্তোষের স্পৃহা স্বভাবতঃই জাগিয়া উঠে। সকলেই আপন আপন কচি অনুসারে নিত্য-নৈমিত্তিক জীবনের বৈচিত্র্য-হীনতা, অবসাদ ও ক্লান্তিকে যতদূর সম্ভব লম্বু করিয়া আনিবার প্রয়াস পাইয়া থাকে।

এ সংসারে যাহা কিছু আছে, সমস্তই অনিত্য ও এক অলপ্য নিয়ম-শৃঙ্খলে আবদ্ধ। আজ যাহা নূতন, কাল তাহা পুরাতন, পরে তাহা ধ্বংস-প্রাপ্ত। আজ যাহা দেখিয়া প্রাণ আনন্দ-চঞ্চল, দুদিন পরে তাহাই বিষেবল্লহীন, পরে তাহা বিপুষ্ট। এই জগতই, যখন চঞ্চল যৌবনের উদ্দাম গতিবেগে ভাটা পড়ে, প্রভাতের সোনালী স্বপ্ন গোখুলির অন্ধকারে ধূসর হইয়া আসে—চিন্তাপ্রবণ ভাবুক হৃদয় মাত্রেই সে সময় কতকগুলি চিরন্তন প্রশ্ন স্বতঃই উদ্ভূত হয়। পৃথিবী কি, আমরা কি, আমাদের জীবন কি, তাহার উদ্দেশ্যই বা কি? কোথা হইতে কেমন করিয়া আসিয়াছি—আবার কোন্‌খানেই বা যাইতে হইবে? জীবন-পথের আরম্ভ কোথায়—পরিসমাপ্তিই বা কোথায়? এই চিরন্তন প্রশ্নগুলি

সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতেই বারংবার মানব-চিন্তে উঠিতেছে অথচ এই দুজ্জ্বল প্রহেলিকার, এই জটিল সমস্তার সমাধান করিতে গিয়া মানব-মন বিভ্রান্ত, অবসন্ন, এমন কি পঞ্চভ্রষ্টও হইয়া পড়িতেছে। পারশ্যের বৈজ্ঞানিক-কবি ওমর খৈয়ামও তাঁহার অন্তঃসাধারণ মনীষা ও বিচ্যাবস্তার ভিতর দিয়া এই সকল প্রশ্ন তুলিয়াছেন এবং উহাদের সহজ সমাধানে সাধারণের সহায়তা করিয়াছেন।

তাঁহার প্রতিমধুর ও যুক্তি-নিপুণ চতুঃপদীগুলি কখনও বা কবণ সুরে, কখনও বা হাত্তকৌতূকের ভিতর দিয়া জীবন ও জগতের বিরাট দায়িত্বের কথা অতি উজ্জলভাবে চক্ষের সম্মুখে তুলিয়া ধরে। এখানে আমরা দেখি যে মানুষ একদিকে যেমন দীন, নিঃসন্দল ও অসহায়, অত্ৰদিকে দইরূপ আবার বিগ্নবিজয়ী, নির্ভীক ও বিশ্ব-শাসক। কেন না “আত্মা” লিয়া একটি অমূল্য সম্পদ তাহার নিজস্ব, আর সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই আত্মার অনুশাসনে পরিচালিত। প্রাণিজগৎ, উদ্ভিদজগৎ, পর্বত, নদী, নদী, এককথায় দৃষ্টমান তাবৎ বস্তুতেই আত্মার সত্তা ও তাহার অপ্রতিহত প্রভাব দেদীপ্যমান। আত্মার অনুভূতিই একমাত্র সত্য—অন্য সমস্তই অনিত্য অলীক।

খৈয়ামের দার্শনিক দৃষ্টি এই আত্মার সত্তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া-ছিল; তাই সংসারের মোহজালে আবদ্ধ হইয়া ধরণীকেই আবাসস্থল মনে করায় তিনি আপন আত্মাকে তীব্র তিরস্কার করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে আত্মা এক অপার্থিব শক্তি, যাহা পার্থিব আখারের বিলোপে মুক্ত হইয়া উচ্চতর পরিণতি লাভ করিবে। কিন্তু এই আত্মাকে জানিতে হইলে, প্রথমেই সর্বতোভাবে আত্মত্যাগ আবশ্যক; ত্যাগের সাধনা ব্যতীত ইষ্ট-লাভ অসম্ভব, আর আত্মত্যাগে অপারগ হইলে আত্মার উচ্চ পরিণতিও অসম্ভব।

খৈয়ামের আত্ম-অনুভূতি কোন নির্দিষ্ট ধর্মের বা সমাজের গভীর মধ্যে আবদ্ধ ছিল না—উহা সেই মূল সত্যকে আশ্রয় করিয়া অভিব্যক্ত, যাহা প্রচলিত ধর্মের যে কোন আকারে সমানভাবে প্রযোজ্য। কি নৈতিক, কি আধ্যাত্মিক, কি জড়বিজ্ঞান-বিষয়ক, সকল ব্যাপার ও অবস্থাতেই উহা খাপ খায়। আত্মার বিজুতি হয় সত্যে, অথবা মিথ্যায়, অথবা অবস্থাবিশেষে ঐ দুয়েরই সংমিশ্রণে সম্প্রকাশ। প্রত্যেক বৃহৎ ব্যক্তিত্ব, প্রত্যেক শক্তিদৃশ্য অস্তিত্ব, হয় সত্য না হয় মিথ্যার প্রতিমূর্ত্তি এবং পরিণামে ঐ আত্মারই একান্ত ছোতক। এই আত্মা নহর দেহের পরিসমাপ্তিতে আপন প্রবণতানুরূপ হয় ধর্মরাজ, না হয় পাপহারীর হস্তে আত্মসমর্পণ করে। আর খৈয়ামের মতে ঐ দুই-ই সেই এক সর্বশক্তিমান পরমেশ্বর; তিনিই ইষ্ট, তিনিই অনিষ্ট, তিনিই মঙ্গল, তিনিই অমঙ্গল,—এককথায় তিনিই সকল বস্তুর আধার। এই ব্যাপারে কবি অতি স্পষ্ট করিয়া বলিতে চান যে, ভগবৎ-ইচ্ছা ভিন্ন কোন বিছুই হইতে পারে না—দুষ্কের শুদ্ধ পত্রটি পর্য্যন্ত পড়িতে পারে না এবং মানব-প্রাণের সমুদায় আকাঙ্ক্ষা ও চরম পরিণতি সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছারই অধীন; অতএব দুঃখ-সুখ, আনন্দ-বেদনা, মঙ্গল-অমঙ্গল, যাহাই দেখা দিক না কেন, সমস্তই ভগবানের দান মনে করিয়া অবনত ও নিরঙ্গে চিন্তে ওহণ করাই শ্রেয়।

ঈশ্বরের উপর খৈয়ামের একান্ত নির্ভর তাঁহার কোমলকান্তপদাবলীকে অমর সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করিয়া দিয়াছে। অন্ততপ্ত হৃদয়ের গভীরতম তলদেশ হইতে আপন বিন্দুক হৃদয়-মনের জ্ঞা তিনি ভগবানের করুণা ভিক্ষা করিয়াছেন এবং নিষিদ্ধ-সুখাদ্বেষণে-ধাবমান চরণ ও পানপাত্রবিধৃত বরটিকে বর্টার বিচারদৃষ্টিতে না দেখিবার জুই আবেদন জানাইয়াছেন।

মানুষের সহায়তা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতাই ওমর খৈয়ামের সর্বোচ্চ

বিশেষত্ব। দেশবাসী ও ধর্ম্মীয় যোদ্ধা সম্প্রদায় কতৃক পদে পদে প্রপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়াও, কখনও তিনি মানুষকে ধর্ম্ম-গুরুরূপে অঙ্গীকার করেন নাই। সত্যকে তিনি অতি নিবিড়ভাবে অন্তরের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং একমাত্র ভগবানের অধিকারেই উহাকে দেখিয়াছিলেন। মানুষের জীবন পল্পপত্রস্থ জলবিন্দুর মত ক্ষণস্থায়ী,—তাহার শৌর্য, বীয়া, ক্রোধ প্রভৃতি নিতান্তই নশ্বর—তাই কবির বিদ্রোহী কণ্ঠ বারংবার প্রবল বিক্রমে ঘোষণা করিয়াছে যে—কখনই তিনি মানুষের দ্বারে সাহায্যলাভের আশায় হাত পতিবেন না; পরন্তু, শুধু তাহারই আশায় থাকিবেন, যিনি চিরন্তন, অবিনশ্বর, সর্ববিদ সাহায্যদানে চির-প্রসারিত-কর ও অনাদি আনন্দের সত্যতম ও নিত্যতম উৎস।

সাধারণ নিত্য-প্রত্যক্ষ বস্তুগুলিকে উপলক্ষ্য করিয়া বহির্বে চমৎকার দার্শনিক-তথ্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাহার প্রতিভা ও বৈশিষ্ট্য পরম উপভোগের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। মৃৎপাত্রের প্রতি বালুকায় লোকান্তরিতা রূপসীর মোহন হাস্য ও মধুর আশ্র, প্রতি ইষ্টকথণ্ডে কোনো-না-কোনো সম্রাটের মস্তক; রূপ-যৌবনের গরিমা, ক্ষমতা ও প্রতিপত্তির মহা পরিণাম, ঐ ধূলিকণা। এই নিত্য পরিবর্তনশীল সীমাহারা ব্রহ্মাণ্ডের চারিদিকেই ভাঙ্গা-গড়ার এক তাণ্ডবলীলা চলিয়াছে—‘আমার’ বলিয়া আঁকড়িয়া ধরিবার কিছুই কোনদিকে নাই—যেদিকে চাওয়া যায়, সেইদিকে ধ্বংস ও বিরাট শূণ্যতার মূর্ত্তিমান অট্টহাস্য! এখানে বাঁচিয়া থাকে, শুধু সত্য।

মানুষ যখন পরিণতবয়সে আপনার যুক্তি ও অভিজ্ঞতার আলোকে এই বিশ্ব-ব্যাপার আলোচনা করিয়া এবং সংস্কারাচ্ছন্ন সমসাময়িক জনমণ্ডলীর অন্ধ মতামত ও আপন পবিবেষ্টনীর বৈচিত্র্য শূণ্যতা সহজে সচেতন

হইয়া আগতিক বস্তুনিচয়ের অনিত্যতার বিষয় চিন্তা করিতে বসে—
তখন তাহার প্রাণের বেদনাকে নিমজ্জিত করিয়া রাখিবার উপযোগী যে
কোন প্রকারের একটা তরল উৎসব আয়োজনের দিকে বুদ্ধি
স্বভাবতঃই ঝুঁকিয়া পড়ে। শেষে পার্থিব আমোদ-প্রমোদেও যখন সাধন
পায় না, তখন সে সর্বশোকতাপহারী ভগবৎ-চিন্তায় আপনার প্রাণ-মন
সমর্পণ করে। তাই বলিয়া প্রত্যেক মানুষের হৃদয় স্বভাবতঃই যে
ভাগবত-সন্ন্যাসে ভরিয়া উঠে, তাহা নহে। জীবনের এই সঙ্কট মুহূর্তে
স্বরা-বিলাসে আত্ম-সমর্পণের দৃষ্টান্তও বিরল নহে। অস্তিত্বঃ ওমর খৈয়ামে
আমরা এই উভয় দৃষ্টান্তই পাশাপাশি দেখিতে পাই। তাঁহার রবাই-
গুলিতে স্বরা ও সাকীর প্রতি ওমরের অত্যাশ্রয় আকর্ষণ ও আত্মরক্ষা
দেখিয়া বিভিন্ন সমালোচক তাহাকে বিভিন্ন অর্থে গ্রহণ করিয়াছেন।

বিজ্ঞান ও দর্শনে খৈয়ামের অসাধারণ পাণ্ডিত্য সে যুগে তাঁহাকে
জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য করিয়া তুলিলেও, এই জগৎসংসার ও তাঁহার স্রষ্টা সম্বন্ধে
অস্তুর্দৃষ্টিসম্পন্ন হইলেও, আপনার অজ্ঞতার বিষয়েই তিনি বারংবার
ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ মানুষের জ্ঞান যে কিরূপ সীমাবদ্ধ
এবং মানুষের অজ্ঞতা যে কত বেশী, তাহা তাপন জীবন-ব্যাপী সাধন
ও অতিজ্ঞতার সাহায্যে খৈয়াম মর্মে মর্মে উপলব্ধি করিয়া গিয়াছেন।
খৈয়ামের ঐকান্তিক ভগবৎ-নির্ভরতা অপর সমস্তকেই ছাপাইয়া গিয়াছে।
এই ভগবৎ-শক্তি সহজে ওমর খৈয়াম সম্পূর্ণ সচেতন এবং তাঁহার
এতদ্বিষয়ক উক্তিগুলি অপরের চিন্তাকর্যক। ভগবৎ-করণ-ভিক্ষায় অবিশ্রান্ত
মুখ ও পরম আনন্দ লাভের জন্য কর্মভারক্ৰিষ্ট এই দুঃখময় সংসারে
ওমর যথেষ্ট করিয়াছেন; তাঁহার সম্বন্ধে বিশ্ব-প্রকৃতির বদান্ধতা নিশ্চয়ই
অপব্যয়িত হয় নাই; তিনি আপনাকে স্বদেশের সুযোগ্য সন্তান ও
অগদাসীর আদরের বন্ধুরূপেই প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন।

খৈয়ামের দর্শন করণ ও বিষয়গুণে জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যে-
 তাবে অভিব্যক্ত করিয়াছে, তাহা নির্দোষ ও অনাবিল আমোদ,
 অগ্নের প্রতি সদয় ব্যবহার, ঐশ্বর্যী জাঁকজমকে ওঁদাসীয়া, গর্জিত ধনী-
 লশ্রদায়ের সহিত বাধ্য-বাধক সম্বন্ধ হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ও আত্ম-
 সন্তোষের আকারেই দেখা দিয়াছে। অনাড়ম্বর জীবন-বাণন, মার্জিত
 রুচি, উচ্চ চিন্তা, মহৎ-পরিণতির অগ্ন লক্ষ্য, উদরায়ের দুর্ভাবনার
 কাতর না হওয়া (কারণ, ভগবানই উহা যোগাইয়া থাকেন)
 এবং সত্যাত্মসন্ধিসায় অকাতর পরিশ্রম—এইগুলিই ওমর-দর্শনের
 প্রচারাণ্য। কপটতা বা মিথ্যাচার ওমরের চক্ষে একান্তই অঘণ্ড ও বিষম
 পরিত্যজ্য। নিষ্ঠা ও অহুসারই সত্যে পৌছিবীর একমাত্র সোপান—
 আর ঐ সত্য, ওমর খৈয়ামের প্রজ্ঞা-দৃষ্টিতে, একমাত্র ঈশ্বরেই বিদ্যমান—
 অগ্ন কোথাও নহে—অগ্ন কোথাও নহে। যাহা কিছু ঈশ্বর হইতে
 স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত, তাহাই ভ্রান্তি ও মিথ্যা। এককথায়, অধৈতবাদকে
 বিশ্বাসীর হিতে প্রয়োগ করাই ওমর-দর্শনের চরম লক্ষ্য। আর এই
 অগ্নই তাঁহার চরম বাণী—

গাঁথেনিকো মান্য ওমর পুণ্য কাজের মুক্তা দিয়া
 পাপ-আগাছাও হ্রদয় হ'তে কেলেনি সে উৎপাটিয়া ;
 ব্রহ্ম কুপায় তাহার দাবী কম তবু নয় কাকর চেয়ে
 এককে যখন তুলেও কভু পড়েনি সে দুই ভাবিয়া ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

ওমর খৈয়ামের জন্মভূমি

খোরাসান—নিশাপুর

পারশ্বের ইতিহাসে খোরাসান ও তাহার রাজধানী নিশাপুর, পারশ্বের মধ্যযুগে ও পরে, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, শিল্পকলা, বাণিজ্য ও রাষ্ট্রনৈতিক ভৌগোলিক বিবরণ ব্যাপারের জগৎ সর্বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। খোরাসান পারশ্বের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত। উত্তরে রুশীয় তুর্কিস্তান ও দক্ষিণে আফগানিস্তানের পার্শ্বত্ব প্রদেশ। দক্ষিণ এবং পশ্চিম দিকে পারশ্বের অগাধ প্রদেশ কীরমান, সেমনান এবং দামঘান।

খোরাসানের উত্তর দিকে রাজধানী নিশাপুর। নিশাপুর পারশ্বের মধ্যে অতি প্রাচীন শহর। পিসাদদিয়েন্ বংশীয় শাহ তামুরস প্রথমে এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন (১)। তখন এই নগর 'নিশাপুর' নামে পরিচিত ছিল। শাহ তামুরস কর্তৃক এই নগর নির্মিত হইবার পর ভূমিকম্পে ধ্বংস হইয়া যায়। কিছুকাল পরে পুনরায় ইহা পারশ্বের শাহ আর দাশির বাগাকান কর্তৃক পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি ইহার 'নি' (২) নামকরণ করেন। তাঁহার পুত্র প্রথম সাপুর খোরাসানের শাসনকর্তা ছিলেন; তিনি পিতার অনুমতিক্রমে

১। আজা-ইব-উল-বিলাদান।

২। নি শব্দের অর্থ শহর।

‘নি’ শব্দের সহিত নিজ নাম “সাপুর” যোগ করিয়া ইহার “নিশাপুর” (সাপুর নগর) নামকরণ করেন ।(১)

নিশাপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিশ্ববিখ্যাত। ভগবান নিশাপুরকে :
বিশ্বের রম্য উদ্যান—প্রকৃতিরানীর লীলাকুঞ্জরূপে রচনা করিয়াছেন।
ইহার চতুর্দিক ফল-পুষ্পোদ্যান ও ছায়া-শীতল বৃক্ষবাটিকায় পূর্ণ। নগরের
উত্তরদিকস্থ পর্বতগাত্রবাহী অসংখ্য নিঝর অবিরাম ঝর ঝর ধারায়
নির্মলসলিল। শাকার ফ্রোড় আলিঙ্গন করিতেছে। গুলিস্তা বিবিধ
বর্ণরাগসমুজ্জল নানা জাতীয় পুষ্প ও বৃন্তানের ফলভারাবনত বৃক্ষের প্রত্যেক

প্রাকৃতিক দৃশ্য সরস ফলের যেন মেলা বসিয়াছে। চারিধারেই

সবুজের ক্ষেত্রে। জলবায়ুও চমৎকার, স্বাস্থ্যের
অনুকূল; দেশবাসী স্বাস্থ্যোজ্জল দেহে আনন্দোজ্জল প্রাণে জীবনযাপন
করিতেছে। প্রচুর শস্য, প্রচুর ফল, প্রচুর আহাৰ্য্য দান করিয়া ভগবান
এ দেশবাসীর কাহারও কোন অভাব রাখেন নাই। সকলেরই হৃদয়—
সৌন্দর্য্য-সুখমায় মগ্নিত। এ স্বপ্নপুরীতে স্বপ্ন-সুন্দরীর মায়াদগুস্পর্শে
কাহারও কোন প্রকার অভাব নাই!—সকলেরই ভাণ্ডার পূর্ণ।

মিরগান (শবৎকাল) সময়ে, আপেল, পীচ প্রভৃতি ফল নিশাপুর-
কুমারীর গওদেশের রক্তিম-রাগ চূষি করিয়া রক্তাভ হইয়া শরৎ-
সুন্দরীর জয় ঘোষণা করে। আপেল, গোলাপ, পীচ, ত্রাসপাতি,
মেহেদি ও পুদিনা পুষ্প এখানে বন-লক্ষ্মীর সুখমা বিস্তার করে।
লোলচর্মা জরাগ্রস্তা গীতের পর বসন্ত-সুন্দরী আপন কনক লাবণ্যে
ধোয়াসান—নিশাপুরের সমতলভূমি পুষ্প-ভূষিত করিয়া আবির্ভূত হন।

ডাফা, পীচ, বাদাম, গুাসপাতি, আপেল ও খর্জুর-বৃক্ষের ঘন-পল্লব মধ্যে আত্মগোপন করিয়া বুলবুল আপন মনে শিষ দিয়া দিকে দিকে বসন্তোৎসব বারতা ঘোষণা করে ;—সমগ্র দেশটি যেমন হাস্তমুখর, নানা-বর্ণরাগসমুজ্জল প্রস্ফুটিত পুষ্পের এবং সুপক ফলের সৌরভে, বরনার অবিরাম জলতরঙ্গ সুরে ও বুলবুলের অশ্রান্ত বাঙ্কারেও তেমনি বাঙ্কত। কবি-বুলবুলগণও এই মাদকতাপূর্ণ সুর-তরঙ্গের সহিত আপন আপন বীণার বাঙ্কার মিশাইয়া নিশাপুরের প্রাকৃতিক শোভা-সম্পদের বর্ণনায় আপন আপন কাব্য পূর্ণ করিয়া গিয়াছেন।

খোরাসান—নিশাপুর যে কেবলমাত্র প্রাকৃতিক শোভা-সম্পদের জগ্ৰাই বিখ্যাত ছিল, তাহা নহে। অসংখ্য কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, জ্যোতির্বিদ, চিকিৎসক ও বৈজ্ঞানিকের প্রতিভালোকে খোরাসান ও তাহার রাজধানী নিশাপুর আলোকিত হইয়াছিল। ইহারা সকলেই নিশাপুরকে সৌন্দর্যের আকর, প্রতিভার স্মৃতিকাগার রূপে বর্ণনা করিয়া ইহার গৌরব প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

খোরাসান—নিশাপুর কবিত্বের লীলাভূমি ছিল। খোরাসানী ও নিশাপুরী কবিগণের কাব্য-লীলা-চাতুর্য্যেই পারশ্বের প্রথম যুগের

সাহিত্য অপূর্ব শোভা সম্পদে অলঙ্কৃত হইয়াছিল।

খোরাসানী ও নিশা- আক্বাস বংশীয় খলিফা এবং গজনীর রাজবংশের

পুরী কবিবৃন্দের কাব্য- রাজত্বকালীন সকল কবিই—মহাকবি

লীলা-চাতুর্য্য

পর্য্যন্ত—সকলেই খোরাসান—নিশাপুরের রম্য-

কুঞ্জকাননের বুলবুল ছিলেন। অন্ধকবি রুদকী, কীশাই, দকীকী এবং

অন্যান্য স্বল্পখ্যাত কবিগণও খোরাসান—নিশাপুরের অধিবাসী ছিলেন।

ইহাদিগের কবিত্ব-লীলা-শ্রোতে খোরাসান—নিশাপুর ভাসমান হইয়াছিল।

বসন্তঃ, নিশাপুর কবি-দার্শনিক-জ্যোতির্বিদ-চিকিৎসক-বৈজ্ঞানিকের

প্রতিভা বিকাশের সম্পূর্ণ অমুকুল ছিল বলিয়াই পারস্যের প্রথম ও দ্বিতীয় কবি পরগন্থর (১) বধাক্রমে ফিরদৌসী ও আনুগরী ফিরদৌসী-সাহিত্য গুরু কবি আসাদী, মুকী-কবি করিদুদ্দিন আস্তর, প্রতিভার কবি নিজাম-ই-আসিরী, কবি-সাহিত্যিক নিজামী স্মৃতিকাগার অরুসি, কবি রাফি-ই-নিশাপুরী, জ্যোতির্বিদ হকিম-ই-মওসিলি, কবি-জ্যোতির্বিদ ওমর খৈয়াম, দুরীবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারক বৈজ্ঞানিক হাবান, সাহিত্যিক ও রাজনীতিবিদ হাসান ইবনে ইশাক, দার্শনিক আবু ইমাম গজ্জালি, ঐতিহাসিক ও সাহিত্য-সমালোচক অল-বৈহাকী, দার্শনিক ও দার্শনিকগণের বিবরণী লেখক অল-শহরস্তানি প্রমুখ অসংখ্য মনীষী জন্মগ্রহণ করিয়া খোরাসান ও তাহার রাজধানী নিশাপুরকে চিরগৌরবান্বিত করিয়া “প্রতিভার স্মৃতিকাগার” বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন।

নিশাপুরের শিক্ষাবিস্তৃতি এতই মূলভ ছিল যে, দেশে অশিক্ষিত ছিল না বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। নিশাপুরের আটটি মাদ্রাসায় শিক্ষাদান করা হইত। এই সমস্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে তৎকালীন যুগশ্রেষ্ঠ বিচক্ষণ বিদ্বানগণ মুসলিম ধর্মতত্ত্ব, বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্য অধ্যাপনা কার্যে নিযুক্ত হইতেন। এই কারণেই সমগ্র পারস্যের জনসাধারণ ও ধনী আমীর-ওমরাহগণ তাঁহাদিগের পুত্রগণকে জ্ঞানসঞ্চয়ের জন্ত এই সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করিতেন। জ্ঞান-বিজ্ঞান-আলোচনা ও সভ্যতার কেন্দ্র-রূপেই নিশাপুর পারস্যের মধ্যযুগে প্রথম নগররূপে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

১। পরগন্থর মহম্মদ বলিয়াছিলেন, “যদিও আমার পর আর কোন পরগন্থর জন্মগ্রহণ করিবে না; তথাপি কবিদের মধ্যে তিনজন কবি ভগবৎ প্রেরণার সিদ্ধিলাভ করিয়া পরগন্থররূপে জনসাধারণের ভক্তি ও শ্রদ্ধা লাভ করিবে। ফিরদৌসী বীররস কাব্যে, আনুগরী কবিতা ও শেখ সাদী রজল রচনার চির অমরত্ব লাভ করিবে।”

জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা দ্বারা খোরাসান যে নিজেই সভ্যতা ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থল হইয়াছিল, তাহা নহে ; এই দেশের সভ্যতা ও জ্ঞান-আরব জাতির উপর বিজ্ঞান, আরব জাতির উপরও প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। যে আরবজাতি গ্রীস, মিশর, পারসিক প্রভৃতি জাতির মত সভ্যতা ও জ্ঞানে উন্নত হইবার আকাঙ্ক্ষা হৃদয়ে পোষণ করিত না,—যে জাতির মর্ম্মকোষে রাজ্যাশাসনোপযোগী সামান্য জ্ঞান, যুদ্ধ, লুণ্ঠন ও হত্যা দ্বারা বিপুল অর্থ-সংগ্রহ-চিন্তা ভিন্ন অণু কোনপ্রকার চিন্তা স্থান পাইত না—সেই রণোন্নাদ স্বচাব-কঠোর আরব জাতির নরপতিও খোরাসান অধিকার করিয়া খোরাসানী সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া, একেবারেই রূপান্তরিত হইয়া গিয়াছিলেন—ইহার ফলে, আরবী সাহিত্যের সমৃদ্ধির দিকেও তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়।

বাস্তবিকই এ দেশটি মায়া-সৌন্দর্যের পুরী। সৌন্দর্য-দেবতা নিজ শিল্প-চাতুর্যের পরিচয় দিবার জগুই যেন এ দেশটি রচনা করিয়াছিলেন। চারিধারে সৌন্দর্যের ছবি ! চারিধারে সত্য-শিব-সুন্দরের জয়গান। এমন সত্য-শিব-সুন্দরের রঞ্জে জন্মগ্রহণ না করিলে কি মনীষার অবতার, জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য, বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক-কবি ওমর খৈয়ামের নবনবোন্মেষ-শালিনী প্রতিভার বিকাশ হয়।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বিদ্যালয়ে ওমর ও তিন বন্ধুর গল্প

৪২০ হিজরাকে (১০১০ খ্রীঃ) বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক-কবি ওমর খৈয়াম ইতিহাস-প্রসিদ্ধ খোরাসানের রাজধানী নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ঐতিহাসিক ও ভূগোল-বিজ্ঞান-বিশারদ জন্ম ও পিতৃ-মাতৃ হামদুল্লা মুত্তওফি (১) বলেন, কবির সম্পূর্ণ নাম গিয়াসউদ্দিন আবুল কতেহ ওমর-বিন-ইব্রাহিম অল্-খৈয়ামী। (২) ওমর তাঁহার নাম, গিয়াসউদ্দীন (বিশ্বাস অশ্রিত) উপাধি, আবুল কতেহ (সাক্ষ্যের চূড়ান্ত) পারিবারিক নাম, বিন-ইব্রাহিম (ইব্রাহিমের পুত্র), খৈয়াম তাঁহার তখল্লুস (ভণিতা)। কবির স্বদেশবাসিগণ কবিকে “গিয়াসউদ্দীন” উপাধি দান কবিতা সম্মানিত করেন। “গিয়াসউদ্দীন,” “মহীউদ্দীন” প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ উপাধি সকল সাধারণতঃ তৎকালীন বিশিষ্ট বিদ্বানগণকেই প্রদত্ত হইত। ইহা হইতে অনুমিত হয় যে, ওমর খৈয়াম তাঁহার যুগে একজন সর্বজনবরণ্য ও স্বীকৃত হকিম (বিদ্বান) ও ইনাম (আচার্য্য) ছিলেন। ওমর খৈয়াম চিরকুমার ছিলেন বলিয়া তাঁহার কুন্নিয়াৎ (পারিবারিক নাম) আবুল কতেহ বাক্যের কোন প্রকার

১। পায়খোর অন্তর্গত কুরাজিম প্রদেশের অধিবাসী বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও ভূগোল-বিজ্ঞানবিশারদ; ইনি তারিখ-ই-গজিলা ও মুজহৎ উল-কুলার নামক দুই খণ্ড বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। ৭৫০ হিজরাকে (১৩৪৯ খ্রীঃ) দেহত্যাগ করেন।

২। তারিখ-ই-গজিলা।

অর্থ করিতে পারা যায় না। তবে তাঁহার সর্ব বিষয়ে সাক্ষ্যই যে তাঁহাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্বানে পরিণত করিয়াছিল, তাহা বলাই বাহুল্য। যে রত্নগর্ভা ভাগ্যবতী রমণী কবিকে গর্ভে ধারণ করিয়া মেহ-ক্রোড়ে লালন-পালন করিয়াছিলেন, বড়ই দুঃখের বিষয়, তাঁহার পরিচয় কিছুই জানা যায় না।

ওমর খৈয়ামের পূর্বপুরুষগণ কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবনযাপন করিতেন, তাহা জানা যায় না। প্রবাদ আছে, কবির পিতা বস্ত্রবয়ন কার্যদ্বারা জীবনযাপন করিতেন। পরে তিনি এই কর্ম ত্যাগ করিয়া বস্ত্রাশয় নির্মাতার কর্ম করেন। এই কারণেই তাঁহাকে “খৈয়ামী”—তাঁবু-নির্মাতা নামে অভিহিত করা হইত। আমাদের দেশে যেমন মৌলিক উপাধি হইতে জাতিগত বৃত্তি নির্ণয় করা হয়, পারশ্ব দেশেও এইরূপ ভাবে জাতি বা সম্প্রদায় নির্ণয় করা হইত। এ প্রথা পৃথিবীর সকল সভ্য সমাজেই প্রচলিত আছে।

কবির তথল্লুস “খৈয়াম” শব্দ হইতে কোন কোন লেখক অনুমান করেন যে, তিনি পিতৃ-পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। কবির প্রাচীন চরিতাভিধানে ওমরের এই ব্যবসায় অবলম্বন সম্বন্ধে কোন প্রকার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না; আমাদের মনে হয়, তিনি রূপক হিসাবেই এই ভণিতা ব্যবহার করিতেন; তিনি নিজেও একটি রুবাইয়ে লিখিয়াছেন—

সুদীর্ঘকাল জ্ঞানের তাঁবু সৃজন করি ওমর খৈয়াম,

দঞ্চ হ'ল ধ্বংস হ'ল,—লুপ্ত হ'ল তাহার স্মনাম;

জীবন-সূত্র ছিন্ন হল, অদৃষ্টের অস্ত্রাঘাতে,

বৃথাই সে যে বিক্রী হল যত্নরূপী দালাল হাতে।

এই শ্লোক হইতে অনুমতি হয় যে, তিনি কখনও পিতৃ পদাঙ্ক

অনুসরণ করেন নাই। পরন্তু, যুহুর পূর্বযুদ্ধ পর্যন্ত জ্ঞানের তাঁবুই স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন। অর্থাৎ সারাজীবন একাগ্র সাধকের মত জ্ঞানের তপস্বী দ্বারা জীবন অতিবাহিত করিয়া গিয়াছেন।

একাদশ খৃষ্টাব্দে খোরাসান—নিশাপুর জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রস্থানে পরিণত হইয়াছিল। তৎকালীন সভ্যতারূপে সকল ব্যক্তিকে বিদ্যাশিক্ষা করিত। দেশে অশিক্ষিতের সংখ্যা ছিল না বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না। দেশমধ্যে ধর্ম ও শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান উভয়েরই সুবন্দোবস্ত ছিল। মসজিদে মোল্লারা ধর্মোপদেশ দান করিতেন; বিদ্যালয়ে ইমামগণ অধ্যাপনা করিতেন; বিদ্যালয়ে বালকগণ বিদ্যা অধ্যয়ন, সঙ্গীত ও ব্যায়াম অনুশীলন করিত; তর্কদ্বারা ছাত্রগণের মানসিক বৃত্তি ও মৌলিক চিন্তাশক্তির উৎকর্ষ সাধন করা হইত; মনোবৃত্তির উৎকর্ষ ও চিন্তাশক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ছাত্রগণ সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, গণিত, জ্যোতিষ, চিকিৎসা, রসায়ন প্রভৃতি অধ্যয়ন করিত।

জ্ঞান-বিজ্ঞানালোচনার পীঠস্থান নিশাপুরের বিদ্যালয়েই ওমর বিদ্যা-
 বাল্যজীবন ও শিক্ষা করেন। ওমর বাল্যকাল হইতেই চিন্তাশীল,
 বিদ্যাশিক্ষা তীক্ষ্ণমেধা ও স্মরণশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। উত্তর

জীবনে তাঁহার তীক্ষ্ণ স্মরণশক্তির কথা পারশ্বদেশে প্রবাদ বাক্যের মত প্রচারিত হইয়াছিল। যথাস্থানে আমরা সে কথাই আলোচনা করিব। তাঁহার মুখমণ্ডল ও চক্ষু প্রতিভা-দীপ্ত এবং দৃঢ়তাব্যঞ্জক ছিল। বাল্যকাল হইতে তাঁহার অনুসন্ধিৎসা-প্রবৃত্তি অতিশয় প্রবল ছিল।

ওমরের বাল্যজীবন সম্বন্ধে সঠিক কোন সংবাদ জানা যায় না। ওমরের পিতা মধ্যবিত্ত গৃহস্থ ছিলেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা খুব সচ্ছল না হইলেও পুত্রের উচ্চশিক্ষার দিকে তাঁহার সুবিশেষ দৃষ্টি ছিল। আর্থিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও তিনি ওমরকে নিশাপুরের শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়ে প্রবেষ্ট করাইয়া

ছিলেন। পুত্র যাহাতে সুশিক্ষিত হয়, তজ্জন্ত তিনি যথেষ্ট প্রয়াস পাইয়াছিলেন।

ওমর যে শিক্ষাগুরুর শ্রীচরণতলে বসিয়া বিত্তা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম ইমাম মওয়াক্কি উদ্দিন। আচার্য্য মওয়াক্কি উদ্দিন থোরা-

শিক্ষাগুরু মওয়াক্কি
উদ্দিন সানের অত্যন্ত শ্রেষ্ঠ জ্ঞানী ছিলেন। আপামর সাধারণ তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত।

তিনি আজীবন অধ্যাপনা করিয়া সুদীর্ঘ আশী বৎসর বয়সে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি সুদী সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। তাঁহার অধ্যাপনার খ্যাতি তৎকালে সমগ্র পারশ্ব দেশময় বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। আচার্য্য মওয়াক্কি উদ্দিনের অধ্যাপনাগুণে দেশ-দেশান্তর হইতে দলে দলে ছাত্রগণ আসিয়া তাঁহার বিদ্যালয়ে সমবেত হইত। তৎকালে পারশ্বদেশে এরূপ জনশ্রুতি প্রচলিত ছিল যে, ছাত্র আচার্য্য মওয়াক্কি উদ্দিনের নিকট কোরান, হদিশ, তপসির প্রভৃতি মোসলেম ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে, সেই-ই উত্তরজীবনে সুবিখ্যাত ও সর্বজনবরণ্য হইবে। ওমরের জীবন আলোচনা করিলে এ বথার যাবার্থ্য উপলব্ধি হয়। যেমন গুরু, তেমনি তাঁহার উপধুক্ত ছাত্র। ওমর আচার্য্য মওয়াক্কি উদ্দিনের বিদ্যালয়ে মুসলিম ধর্মতত্ত্ব, হদিশ, কোরান ও মুসলিম ব্যবস্থাস্থাস্ত্র (Jurisprudence) অধ্যয়ন করেন। তিনি যখন এই বিদ্যালয়ে প্রবিষ্ট হন, তখন তাঁহার বয়স তেইশ বৎসর। এই বিদ্যালয়ে প্রবেশের পূর্বে তিনি কোন্ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, এ সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। আচার্য্যদেব ছাত্রগণের প্রতি যেমন স্নেহশীল ছিলেন, ছাত্রসম্প্রদায়ও তেমনি তাঁহার প্রতি ভক্তি ও শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিল।

ওমর খৈয়াম ছয় বৎসরকাল আচার্য্য মওয়াক্কি উদ্দিনের বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করেন। তৎকালীন ছাত্রগণের পাঠ্য-তালিকা নিম্নে লিখিত হইল,—

পারশ্ব ও আরব্য ভাষা, সাহিত্য, ব্যাকরণ, কোরান, মোসলেম ধর্মতত্ত্ব, আরব এবং পারশ্বদেশীয় জ্ঞানিগণের বাণী, কুবাস নামা, হামিদি, লকানী

ওমরের সময়ে ছাত্র-
গণের পাঠ্যপুস্তক
অল-হরিরী, অল-হামদানীর গ্রন্থাবলী, অল-বালামী,
আহমদ ই-হাসানি এবং আবু নসর কুন্দুরীর অলু-
শাসন (Rescripts) আরব কবিগণের কাব্য-

গ্রন্থাবলী, মৃত্যনক, আবীউর্রাদি, এবং স্বাজীর দীওয়ান ; পারশ্ব কবিগণের
মধ্যে কির্দোঁসীর শাহ-নামা, রুদকী এবং আনুসারীর কাব্য-গ্রন্থাবলী । (১)

নিশাপুরের বিতালয়ে ওমর খৈয়াম, হাসান-বিন-সব্বা ও হাসান-
আলী ইবন ইশাক (যিনি নিজাম-উল-মুল্ক নামে সুবিখ্যাত ছিলেন)—

তিন বয়স্ক গল্প
ঐতিহাসিক ভ্রান্তি
এই তিন কিশোর সহপাঠী বালকের মধ্যে বালমুল্লভ
বন্ধুত্বের যে গল্প ঐতিহাসিক রশিদ উদ্দিন লিখিত

জ্যামিরুং তওয়ারিখ গ্রন্থে স্থান পাইয়া এতাবৎকাল
পর্যন্ত সত্য ঘটনা হিসাবে চলিয়া আসিতেছিল, উহা ঐতিহাসিক ভিত্তি-
শূন্য এবং সম্পূর্ণ কাল্পনিক । বাস্তবিকই তাঁহারা কোনকালেই সহপাঠী
ছিলেন না ; একমাত্র ঘটনাসমূহের তারিখ এবং পৌরোপাখ্য নির্দেশের
অভাবেই (On chronological difficulties) উহা ভ্রান্তি বলিয়া
পরিত্যক্ত হইয়াছে । (২)

ওমর সুদীর্ঘ ছয় বৎসরকাল আচার্য্য মওয়াযিক উদ্দিনের বিতালয়ে
মোসলেম ধর্মতত্ত্ব, হদিশ, মোসলেম-স্মৃতি, সাহিত্য, দর্শন, গণিত ও
জ্যোতিষ প্রভৃতি বিজ্ঞানশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া সর্বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইলেন ।

১। চহার মকাল।

২। Literary History of Persia vol. ii ; স্বর্গীর অধ্যাপক E. G. Browne লিখিত Yet more light on Umar Khayyam. প্রবন্ধ টাইব্য ; J. R. A. S. 1899.

গণিত ও জ্যোতিষশাস্ত্রে তাঁহার সবিশেষ অগ্রগতি তাঁহাকে তৎকালে সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতবিদ ও জ্যোতিষবিদরূপে পরিণত করিয়াছিল। ওমর আবাল্য অসুস্থ হইয়া ছিলেন। এই অসুস্থতা-প্রবৃত্তিই তাঁহাকে অগতিশীল সত্যাসুস্থ ও সত্য-সাধকে পরিণত করিয়া হুজ্ব-উল-হক (সত্য প্রমাণকারী) অভিধায় সম্মানিত করিয়াছিল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

ওমর-গুরু আবু আলি সিনা

পারশ্বদেশে মৌলিক চিন্তা, মতবাদ প্রচার, পাণ্ডিত্য ও গবেষণা দ্বারা যে-সমস্ত মনসী ব্যক্তি প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, তন্মধ্যে জ্ঞান-বিজ্ঞান-পাণ্ডিতে অপ্রতিদ্বন্দী, আবু আলি সিনার নাম সসম্মানে ইতিহাসে উল্লিখিত হইয়াছে। পারশ্বদেশে আবু আলি সিনার মত চিন্তাশীল লেখক, সাহিত্য-সৃষ্টিকার, বৈজ্ঞানিক, চিকিৎসক, দার্শনিক ও শূকবি অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। একাধারে সর্বতোমুখী প্রতিভার এরূপ একত্র সম্মেলন জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য বৈজ্ঞানিক-কবি ওমর খৈয়াম ভিন্ন অন্যের মধ্যে অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। তাঁহার দর্শন

চিন্তানায়ক আবু-সিনা ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি পারশ্বদেশে একসময়ে প্রবাদ বাক্যের মত প্রচারিত হইয়াছিল। দর্শন ও বিজ্ঞানে সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক দার্শনিক আরিস্তোতল (Aristotle) ও গ্রীক চিকিৎসক হিপোক্রেতস (Hepocratos) ও গ্যালেনের (Gallen) মতামতস্বরূপকারী হইলেও, তিনিই মধ্যযুগের ইয়োরোপের জ্ঞান-গুরু হইয়া অজ্ঞান-অন্ধকার দূর করিয়াছিলেন। তাঁহার স্বাধীন চিন্তা ও মতবাদ পারশ্বের জ্যোতির্বিদ-কবি ওমর খৈয়ামের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আবু আলি সিনার মৃত্যুর পর ওমর যখন বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা নূতন জ্ঞান আবিষ্কার করিয়া পারশ্বের পণ্ডিত-সমাজকে চমৎকৃত করিতেছিলেন,

ওমর যখন নিজ মৌলিক চিন্তা ও মতবাদ প্রচার দ্বারা সমগ্র দেশে বিপ্লব উপস্থিত করেন, তৎকালীন পারশ্বের জনসাধারণ ওমর খৈয়ামকে “আবু ওমর খৈয়ামের উপর আবু সিনার প্রভাব আলি সিনার অবতারণ” আখ্যায় সম্মানিত করিয়াছিল। ওমর আবু আলি সিনাকে গুরুপদে বরণ করিয়া, তাঁহারই অসমাপ্ত বাণী প্রচার দ্বারা পারশ্বদেশে বিদ্রোহের পতাকা উড়াইয়া ছিলেন। আবু আলি সিনার সহিত ওমর খৈয়ামের সর্ববিষয়ে সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। আবু আলি সিনা যেসকল অসাধারণ জ্ঞানী, অলৌকিক প্রতিভাসম্পন্ন ছিলেন, তাহাতে তাঁহার অনন্তসাধারণ জ্ঞান-পাণ্ডিত্য-প্রতিভার প্রভাব উপযুক্ত ক্ষেত্রেই পতিত হইয়াছিল। যে মনস্কীর অপূর্ণ প্রতিভা প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়া ওমর খৈয়ামের বৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল, সেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার আবু আলি সিনার পরিচয় নিয়ে প্রদত্ত হইল।

আবু-সিনা পারশ্বের বোখারা শহরে ৩৭৩ হিজরীতে (৯৮০ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন। (১) আবু-সিনার পূর্বপুরুষগণ বলখ নগরের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার পিতা বোখারার নিকটবর্তী খারমাইসেন প্রদেশের আমিল (রাজস্ব সংগ্রাহক) ছিলেন। রাজকর্ম উপলক্ষে তিনি বলখ ত্যাগ করিয়া বোখারায় থাকিতে বাধ্য হন। (২) ইবন খল্লিকান (৩) বলেন, দশ বৎসর বয়সের সময় আবু-সিনা সমগ্র কোরান,

১। তারিখ-উল-হুকা। Bankipore Catalogue. Arabic medical works vol. iv.

২। ইবন খল্লি খানের চরিত্রাভিধান।

৩। ইনি দামাশ্কার অধিবাসী বিদ্বান। ৬০৮ হিঃ অব্দে (১২১১ খৃঃ) জন্মগ্রহণ করেন; তিনি লুকাবি, জীবনচরিতকার, সম্পাদক ও ঐতিহাসিক, এককথার সর্বশাস্ত্রবিদ ছিলেন; তাঁহার ওরাক্ব অল-আরমান বিখ্যাত চরিত্রাভিধান। এই বিখ্যাত চরিত্রাভিধানখানির একটি ইংরাজী সংস্করণ আছে।

সাহিত্য, মুসলিম ধর্মতত্ত্ব, পাটীগণিত ও বীজগণিতে একরূপ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন যে, এই শুবুখার বয়সেই সর্বোচ্চ শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপাধি-

আবু-সিনার জ্ঞান, সকল লাভ করেন। (১) তিনি আত্ম-জীবনীতেও
বিজ্ঞা শিক্কা ও চিকিৎসা- লিখিয়াছেন যে ধর্মতত্ত্ব, আরব-সাহিত্য ও গণিত
সকল প্ৰতিষ্ঠা বিজ্ঞানেও অসামান্য জ্ঞানের পরিচয় দিয়া প্ৰতি-
লাভ বাসিগণের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়াছিলেন।

ইহার পর তিনি মিশর দেশীয় এক সুবিখ্যাত চিকিৎসকের নিকট চিকিৎসা-
শাস্ত্র, ছাত্রশাস্ত্র, জ্যামিতি ও সুপ্রসিদ্ধ টলেমীর
গ্রন্থসমূহ পাঠ করেন। সুবিখ্যাত শুবুখী ইসমাইলের নিকট শুবুখী-ধর্মতত্ত্ব
ও ব্যবস্থা বিজ্ঞানে জ্ঞানলাভ করেন। ইহার পর তিনি পদার্থ-বিজ্ঞান,
চিকিৎসা-বিজ্ঞান ও অপরাপর বিজ্ঞান শাস্ত্র একজন খৃষ্টান চিকিৎসকের নিকট
অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়ন শেষ করিয়া আবু-সিনা চিকিৎসা-বিজ্ঞানের
গবেষণায় মনোনিবেশ করেন। তিনি যখন গভীর গবেষণায় নিযুক্ত
 থাকিতেন, তখন বাহ্য-জগতের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক থাকিত না।
দিনের পর দিন, রাত্রির পর রাত্রি—কোন দিক দিয়া চলিয়া যাইত, তাহা
তিনি জানিতে পারিতেন না। যখন অক্লান্ত পরিশ্রমে কোন জটিল সমস্যা-
সমাধানে অপারগ হইতেন, তখন তিনি সমস্ত দিন উপবাসী থাকিয়া
মসজিদে গিয়া সমস্যা-সমাধান-শক্তির প্রার্থনা করিতেন। (২)

চিকিৎসা-বিজ্ঞানে তিনি অসামান্য পারদর্শিতা লাভ করিয়া এতই
প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন যে সত্তের বৎসর বয়সে “দ্বিতীয় হিপোক্রেতাস”

১. ওয়াক্ত আল আয়নান। Oriental Biographical Dictionary
Beal.

২। ইবন খল্লি খান।

নামে সম্মানিত হন। শুধু ইহাই নহে, এই নরকুমার বয়সেই সমানী বংশীয় রাজকুমার মনসুরের চিকিৎসার জন্য রাজপ্রাসাদে তাঁহার আহ্বান হইয়াছিল। তৎকালীন প্রধান ও সমসাময়িক চিকিৎসকগণ জ্ঞান-বুদ্ধি তরুণ যুবক আবু-সিনার নিকট চিকিৎসা-বিজ্ঞানের অনেক জটিল সমস্যা সমাধান ও উপদেশ লাভ করিতে আসিতেন। আবু-সিনাই পারশদেশে আরিস্তোত্তলের মত পদচারণা করিতে করিতে চিকিৎসা-বিজ্ঞান-শিক্ষার এক অভিনব প্রণালীর প্রবর্তক।(১)

রাজকুমার আবু-সিনার চিকিৎসাধীন থাকিয়া অতি অল্পদিনের মধ্যে রোগমুক্ত হন এবং তাঁহার প্রতি রূপাদৃষ্টি করেন। রাজকুমার মনসুর বিদ্যাহুরাগী ও সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার রাজকুমারের অল্পগ্রহ ও রাজ-পাঠাগার ব্যবহার অধিকার লাভ পাঠাগার দুপ্রাপ্য ও মূল্যবান গ্রন্থরাজিতে পূর্ণ ছিল। রাজকুমার আবু আলি সিনার চিকিৎসা-নৈপুণ্যে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, তিনি তাঁহাকে রাজ-পাঠাগার ব্যবহার করিবার অধিকার প্রদান করেন। পাঠাগারে সংরক্ষিত প্রাচীন গ্রীকদার্শনিকগণের গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী হওয়া তাঁহার দার্শনিক হিসাবে প্রসিদ্ধির অন্ততম কারণ। এই সুরহৎ পাঠাগার অমূল্য ও দুপ্রাপ্য গ্রন্থাবলীতে পূর্ণ। এই সকল অমূল্য গ্রন্থাবলীর নাম পূর্বে অতি অল্প লোকেই শুনিয়াছে। এরূপ মূল্যবান ও দুপ্রাপ্য পুস্তকাবলীপূর্ণ দ্বিতীয় পুস্তকাগার সে যুগে ছিল না।(২)

কিছুকাল পরে দুর্ভাগ্যক্রমে এই অমূল্য পাঠাগারটি হঠাৎ অগ্নিদগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হইয়া যায়। আবু-সিনার প্রতি রাজকুমারের অল্পগ্রহ-

১। Encyclo Britanica 9th edition.

২। চাহর যকালী ; Literary History of Persia voll ii.

দৃষ্টি অনেক আমির-ওমরাহগণের ঈর্ষ্যানলে স্তুতাহতি প্রদান করে।
 যে অন্তত মুহুর্তে রাজ-পাঠাগার অগ্নিদগ্ধ হয়, সেই সময় আবু-সিনার
 আবু-সিনার বিরুদ্ধে শত্রুগণ চক্রান্ত করিয়া প্রচার করে যে, আবু-সিনা
 চক্রান্ত নিজে ইচ্ছাপূর্বক পাঠাগারে অগ্নিসংযোগ করিয়া
 দিয়াছে। সে পাঠাগারের সমস্ত পুস্তক অধ্যয়ন
 করিয়া প্রচুর জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছে, যাহাতে অপর কোনো ব্যক্তি
 এই পাঠাগার ব্যবহার করিয়া জ্ঞান সঞ্চয়পূর্বক তাহার সমকক্ষতা লাভ
 করিতে না পারে, এই আকাঙ্ক্ষায় বশবর্তী হইয়া সে ইচ্ছাপূর্বক পাঠাগারে
 অগ্নিসংযোগ করিয়াছে।

আবু-সিনার দ্বারা এই অপকর্ম সাধিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া
 রাজকুমার মর্যাদাস্তিক দ্বেষিত ও অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। তিনি তৎক্ষণাৎ
 রাজকুমারের বিবদুষ্টিতে তাহাকে বোখারার সীমানা ত্যাগ করিতে আদেশ
 পতিল; বোখারা দেন। খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীর শেষ ভাগে তিনি
 ত্যাগ; যাবাবর বোখারা ত্যাগ করেন। ঠিক এই সময়ে তাঁহার
 জীবনযাপন। পিতৃ বিরোগ হয়। তখন তাঁহার বয়স তেইশ
 বৎসর। বোখারা ত্যাগের পর হইতে আবু সিনা ভ্রাম্যমাণের জীবন
 যাপন করেন। যখন যে রাজ্যের রাজ্যে তিনি গমন করিতেন, তৎক্ষণাৎ
 তিনি বিদ্বানের যোগ্য প্রচুর সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করিতেন। কখনও
 কখনও তিনি রাজা ও শাসনকর্তাগণের অনুরোধে তাঁহাদিগের রাজ্যে
 বিদ্বান-পারিষদ অথবা মন্ত্রিরূপেও অবস্থান করিতেন। বিধাতা যাহার
 অদৃষ্টে যাবাবর-জীবন-যাপন লিখিয়াছেন, তিনি মন্ত্রিরূপেই হউক, অথবা
 পারিষদরূপেই হউক, কোথাও স্থিরভাবে জীবন যাপন করিতে
 পারেন না। খোয়ারেশমশাহ মামুনের রাজ্যে তিনি যখন বিদ্বান
 পারিষদরূপে অবস্থিত, সেই সময় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ তুলতান মামুদ, অধীনস্থ

রাজা মামুদকে তাঁহার বিদ্বান-পারিষদ আবু-সিনাকে মামুদের দরবারে প্রেরণ করিবার জ্ঞাপত্রাদেশ করেন। সুলতান মামুদ আবু আলি সিনার পাণ্ডিত্য-প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া অন্তরে অন্তরে তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। খোয়ারেশমশাহ আবু-সিনাকে সুলতান মামুদের পত্রাদেশের বিষয় জ্ঞাপন করিলে, তিনি গোপনে এই রাজ্য ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। সুলতান আশায় নিরাশ হইয়া আবু-সিনাকে বন্দী করিয়া গজনীতে প্রেরণ করিবার জ্ঞাপত্র, তাঁহার চল্লিশখানি চিত্র অঙ্কিত করিয়া দেশে দেশে প্রেরণ করেন ও প্রচুর পুরস্কার ঘোষণা করেন। (১)

আবু-সিনা খাওয়ারজাম শহর হইতে পলায়ন করিয়া কিছুকাল আত্ম-গোপন করিয়া বাস করিতে থাকেন। এই সময় তিনি কুবাসের রাজার এক আত্মীয়কে কঠিন পীড়া হইতে মুক্ত করেন; রাজ-আত্মীয় তদীয় চিকিৎসক আবু আলি সিনাকে রাজদরবারে উপস্থিত করেন। রাজা প্রথম দর্শনেই সুলতান মামুদ প্রেরিত চিত্র হইতে আবু-সিনাকে চিনিতে পারেন। তিনি সবিশেষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের সহিত আবু সিনাকে নিজ দরবারে আশ্রয় দেন। তিনি এই সময়ে কুবাস রাজের মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হইলেন। মন্ত্রিপদে অধিষ্ঠিত হইয়া রাজকর্মের অবসরে তিনি প্রত্যহ দুই পৃষ্ঠা করিয়া তাঁহার প্রসিদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থ “সীকা” রচনা করেন। (২) কুবাস শহরে তিনি অধিক দিন বাস করিতে পারেন নাই। সুলতান মামুদের অত্যাচারের ভয়ে অল্পদিন পরেই আবু সিনা রাজ-আশ্রয় ত্যাগ করিয়া রায়নগরে পলায়ন করেন। এইরূপ স্বনঃ পুনঃ ভ্রাম্যমান জীবন

১। চ্ছার মকাল।

২। চ্ছার মকাল ; Carra de Vaux.

তাঁহার পক্ষে বড়ই অসহ্য হইয়া উঠে।(১) অবশেষে একদিন মরুভূমি অভিক্রম করিবার সময় হঠাৎ উদয়ের গীড়ায় আক্রান্ত হন এবং মৃত্যুর পূর্বের তিনদিন প্রার্থনা ও কোরান পাঠ করিতে করিতে ৪৭২ হিজরায় (১০৩৭ খ্রীঃ) হামদান নগরে ৫৪ বৎসর বয়সে দেহ-ত্যাগ করেন।(২)

আবু আলি সিনার গ্রন্থসংখ্যা আজিও স্থিরনিশ্চয় করিয়া কেহ নির্দেশ করিতে পারে নাই। তাঁহার যতগুলি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে চিকিৎসা-বিজ্ঞান বিষয়ক একশত চল্লিশ, গণিত-বিজ্ঞান সম্বন্ধে দশ, দর্শনশাস্ত্র সম্বন্ধে পনের, আবু-সিনার গ্রন্থাবলী উদ্ভিদ-বিজ্ঞান সম্বন্ধে পাচ, জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে আট এবং কুড়ি খণ্ডে সম্পূর্ণ বিংকোষ উল্লেখযোগ্য; ইহা ব্যতীত তিনি আরিস্তোতলের গ্রন্থাবলী গ্রীক হইতে আরবী ভাষায় অনুবাদ করেন।(৩) আবু-সিনা তাঁহার চিকিৎসা-বিজ্ঞান-গ্রন্থ “কিতাব-উল-কাহুন” এবং দার্শনিক গ্রন্থ “সীফা”র জুহুই লুখিয়াত। শেষোক্ত সুবৃহৎ গ্রন্থখানি আঠার খণ্ডে সম্পূর্ণ। ইহাতে পদার্থ বিজ্ঞান, ধর্ম্মতত্ত্ব এবং গণিতবিজ্ঞান আলোচিত হইয়াছে। তাঁহার “কিতাব-উল-কাহুন” পূর্ববর্তী প্রসিদ্ধ চিকিৎসক রাসী, হালি আকাস রচিত গ্রন্থের তুল্য ও সমশ্রেণীস্থ হইলেও প্রচুর গবেষণা, অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং গ্রীকচিকিৎসা-প্রণালী অনুসারে শৃঙ্খলাবদ্ধ প্রণালীতে লিখিত বলিয়া চিকিৎসা-বিজ্ঞান-জগতে প্রামাণ্য ও প্রথম শ্রেণীর চিকিৎসা-বিজ্ঞান-গ্রন্থরূপে প্রসিদ্ধিলাভ করে। কিন্তু শল্য-

১। চহার মকলা।

২। ইরন খলিফান।

৩। Literary History of the Arabs. Nicholson.

চিকিৎসা-বিজ্ঞান-হিসাবে আবু-সিনার এই গ্রন্থ তাঁহার পূর্ববর্তী চিকিৎসকগণের গ্রন্থের তুলনায় নিম্নশ্রেণীর বলিয়া বিবেচিত হয়।(১)

আবু সিনা রাজনীতি-বিজ্ঞানেও অল্প পারদর্শী ছিলেন না, তাঁহার জফর-নামা (Book of victory) রাজনীতি বিজ্ঞান সাহিত্যের অমূল্য-সম্পদ। এই গ্রন্থ তাঁহার রাষ্ট্র-বিজ্ঞানে অসামান্য পাণ্ডিত্যের ও রাজনীতি-কুশলতার পরিচায়ক। এই গ্রন্থখানি আবু সিনা সমানী রাজবংশীয় রাজকুমারের আদেশে রচনা করেন। এই গ্রন্থ মধ্যে প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য সহস্র নৈতিক উপদেশ; রাষ্ট্রনৈতিক-বাণী এবং পারশ্বের সুপ্রসিদ্ধ শাসনাবলি নরপতি নওশেরওয়ান ও তাঁহার বিজ্ঞ মন্ত্রী বুজর্জমিহরের রাজ্যশাসন সংক্রান্ত কথোপকথন দৃষ্ট হয়।(২) চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যেসকল তিনি হিপোক্রেতাস ও গ্যালেনের মতানুসারী, দর্শনের ক্ষেত্রেও সেইরূপ আরিস্তোতল, (Aristotle), প্লেটো (Plato) ও প্লাটিনাসের (Plotinus) মতানুসারী ছিলেন।

উপরোক্ত গ্রন্থাবলী ভিন্ন আবু-সিনা পারশ্ব ও আরবী ভাষায় বহুসংখ্যক কবিতা রচনা করেন। প্রাচ্যভাষাবিদ জার্মান পণ্ডিত আবু-সিনার কবিতার Dr. Hermann Ethe অসামান্য পরিশ্রম ও নারী ও হুসার স্তুতি , গবেষণায় পারশ্ব ও আরব্য কবিতাগুলি সংগ্রহ

১। Catalogue of Persian and Arabic manuscripts kept in the Oriental Public Library Bankipore vol. IV. Arabic medical works 1910,

২। Catalogue of Persian manuscripts kept in the India office Library.

করিয়া জর্জন ভাবায় অল্পবাদ ও সম্পাদন করিয়াছেন।(১) এই সকল কবিতা মুক্তিমান “বিদ্রোহ”। এই বিদ্রোহ-অভিযান দেশাচার, সুকীর্ষ, ভগ্নমি ও গৌড়ামীর বিরুদ্ধে। আবু-সিনা অত্যন্ত পিরানা-বিলাসী ছিলেন। তাঁহার অনেক কবিতা সুরা, সুরাপাত্র ও নারীর প্রশংসা-বাক্যে পূর্ণ। স্ত্রীকে কারণে ওমরের কবিতা তাঁহার স্বদেশবাসীর চিত্তাকর্ষণ করিতে যে কারণে ওমরের কবিতা তাঁহার স্বদেশবাসীর চিত্তাকর্ষণ করিতে পারে নাই, ঠিক সেই কারণেই আবু-সিনার কবিতাও পারশ্বদেশে প্রসার লাভ করে নাই।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পৃষ্ঠপোষক বন্ধুলাভ

ইসাম মওয়াজ্জিক উদ্দিনের বিদ্যালয়ে সর্বোচ্চ শিক্ষার পাঠ সমাপনান্তে ওমর গৃহে ফিরিয়া জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণা দ্বারা বিশেষজ্ঞের জীবন যাপন করিতে মনস্থ করেন। এই সময় তাঁহার পিতৃ-বিয়োগ হয়। তিনি মধ্যবিত্ত গৃহস্থের সন্তান ছিলেন; তাঁহার গৃহসংস্থান এমন সচ্ছল ছিল না, যদ্বারা তিনি বিনা উপার্জনে জ্ঞানালোচনায় জীবনযাপন করিতে পারেন। পিতার মৃত্যুর পর গৃহে আসিয়া ওমর দারুণ অর্থকষ্ট ভোগ করেন। অর্থাভাবের কঠোর তাড়না যখন তাঁহাকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের গবেষণার পথ ত্যাগ করিতে প্রবুদ্ধ করিতেছিল; গবেষণাকার্য্য ত্যাগ করিয়া অর্থোপার্জনে বহির্গত হইবেন কি না, এই মহা সমস্যার সন্ধিক্ষেত্রে যখন তাঁহার চিত্ত দোহল্যমান; ঠিক সেই সময় ওমর শ্রীভগবানের আশীর্বাদ লাভের মত একজন সঙ্কল্প গুণগ্রাহী আমীরের স্বতঃপ্রবৃত্ত অর্থ-সাহায্য-প্রতিশ্রুতি লাভ করিয়া ধৃত হইলেন। ওমরের গুণগ্রাহী উদার-হৃদয় পৃষ্ঠপোষকের নাম আবু তাহির।

পৃষ্ঠপোষক বন্ধুলাভ
নিজাম-উল-মুল্ক হাসান ইবন ইশাকের বন্ধু ভিন্ন
আবু তাহিরের আর কোন পরিচয় জানা যায় না।

রোমক-কবি ভার্জিল যেমন ম্যাসিনাসকে পৃষ্ঠপোষক বন্ধুরূপে লাভ করিয়া ধৃত হইয়াছিলেন, ওমরও আবু তাহিরকে পৃষ্ঠপোষক বন্ধুরূপে

পাইয়া তজ্জপ ধরা হয়েন। দরিদ্র কবি তাজ্জিল ম্যাসিনাসকে
 পৃষ্ঠপোষক বন্ধুরূপে না পাইলে, তাঁহার যেমন তাজ্জিল প্রকাশ পাইত
 না; ওমর খৈয়ামও আবু তাহিরকে পৃষ্ঠপোষক
 ম্যাসিনাস ও আবু তাহির
 বন্ধুরূপে না পাইলে ওমরের ওমরুজ্জ প্রকাশ পাইত
 কিনা সম্বন্ধে বিষয়। আবু তাহিরের বন্ধুত্ব
 লাভ করিবার পর, হইতে তাঁহার সৌভাগ্য-স্বর্ঘ্যের উদয় হয়।
 তাঁহার অর্থ সাহায্যই ওমরের বৈজ্ঞানিক-গবেষণার পথ উন্মুক্ত করিয়া
 দেয়। ওমর অর্থচিন্তা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া নিশ্চিন্ত মনে
 গবেষণায় মনোনিবেশ
 বৈজ্ঞানিক-গবেষণায় মনোনিবেশ করেন।
 মনোনিবেশ বাল্যকাল হইতেই গণিত-জ্যোতিষ বিজ্ঞানে
 তাঁহার সাতিশয় অল্পবয়সের পরিচয় পাওয়া
 গিয়াছিল। বয়োবৃদ্ধির সহিত এই অল্পবয়স অল্পসন্ধিস্থায় পরিণত
 হয়। গণিত-জ্যোতিষের অল্পশীলন দ্বারা সত্যাস্থেষণ ও সত্যনির্দ্ধারণই
 তাঁহার সমধিক প্রিয়কাৰ্য ছিল। তাঁহার জীবন অল্পসন্ধিস্থায় পূর্ণ।
 সত্যাস্থেষী ওমর ওপস্থীর মত একাগ্র স'ধনায় গণিত-জ্যোতিষ-বিজ্ঞানের
 গবেষণার দ্বারা সত্যাস্থেষণে প্রবৃত্ত হন।

আরব-ধর্ম-গুরু মহম্মদের উদ্দীপনাপূর্ণ ধর্ম প্রচারণার ফলে, ইশ্ততঃ
 বিক্ষিপ্ত আরব জাতি যে তাঁহার প্রচারিত বাণীমন্ত্রে দীক্ষালাভ করিয়া
 কেবল একত্রিত হইয়াছিল, তাহা নহে; তাহার জ্ঞান বিজ্ঞান মন্ত্রেও
 দীক্ষিত হইয়া সজীব হইয়াছিল। নব দীক্ষার ফলে সমগ্র আরব-
 জাতি দ্রুতগতিতে জ্ঞান সঞ্চয় করে। দেশমধ্যে
 আরবজাতির জ্ঞানচর্চা
 তাহার যেমন জ্ঞান বিস্তার করিতেছিল, তেমন
 জগতের অগাধ উন্নতিশীল জাতির চিন্তা জ্ঞান বিজ্ঞান আহরণ করিয়া
 দেশের জ্ঞান-ভাণ্ডারও পূর্ণ করিতেছিল।

সিদ্ধদেশ খলিকা মনুরের (৭৫৩-৭৭৪ খৃঃ) শাসনাধীন হওয়ার

ভারতবর্ষের সহিত বোগদাদের মানসিক চিন্তা-
বোগদাদের সহিত

ভারতের সম্বন্ধ

জ্ঞানের আদান-প্রদানের যোগস্বত্র সংস্থাপিত হয়।

ভারতীয় জ্ঞান-চিন্তা-ধারা ভিন্ন ভিন্ন যুগে দুইটি
বিভিন্ন পথ দিয়া বোগদাদে উপস্থিত হয়। একটি ভারতবর্ষ হইতে
সোজামুজি ভাবে, অপরটি ইরান দেশ হইয়া বোগদাদে উপস্থিত
হয়। প্রথম সংস্কৃত হইতে আরবী এবং অপরটি প্রাকৃত ও পালি
হইতে পহলবী এবং শেবোক্ত হইতে আরবী।

খলিকা হারুণ-অর-রসিদের (৭৩৮-৮০৮ খৃঃ) রাজত্ব সময়ে ভারতীয়
জ্ঞান-প্রবাহ (Influx of Hindu Learning) মুসলিম জাতির উপর

অশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এই সময় বলখ্
মুসলিম-জগতের উপর
ভারতীয় জ্ঞান-প্রবাহের
প্রভাব
নগরের বারমাক (১) রাজবংশ উন্নতির চরম শিখরে
উঠিয়াছিল। ইহারা ভারতীয় চিকিৎসা-বিজ্ঞান
শিক্ষার জগৎ ভারতবর্ষে বিধান পাঠাইতেন; ইহা

ব্যতীত তাঁহারা হিন্দু বিদ্যানগণকে বোগদাদে সাদর-আহ্বান করিয়া,
সংস্কৃত হইতে আরবী ভাষায় চিকিৎসা-বিজ্ঞান-গ্রন্থ অনুবাদ করিয়াছিলেন।
শুধু ইহাই নহে, হিন্দু চিকিৎসকগণকে তাঁহাদিগের রুগ্নাবাসের প্রধান
চিকিৎসকরূপেও তাঁহারা নিযুক্ত করিতেন।

খলিকা মামুনের (৮১৩-৮৩৩ খৃঃ) রাজত্ব-সময়েও ভারতীয় জ্ঞান-
রশ্মিধারা পুনরায় মুসলিম-জ্ঞান-ভাণ্ডারে পতিত হইয়া তাহাকে ঐজ্জল্য
প্রদান করে। ইহার পর মুসলিম-জগৎ গ্রীক প্রভাবান্বিত হয়।

১। বারমাক রাজবংশের পূর্বপুরুষগণ বৌদ্ধবিহার-নববিহারের অব্যাক ছিলেন।
বারমাক শব্দ পালি পরামক শব্দের রূপান্তর। ইহার অর্থ সর্বশ্রেষ্ঠ অর্শাৎ বিহারের
অধ্যক্ষ।

আরবেয়া ভারতীয় এবং গ্রীক সাহিত্য, বিজ্ঞান ও দর্শনচর্চা করিয়া অশেষ জ্ঞানলাভ করিয়াছিল। ভারত-গ্রীক-চিন্তা-ধারা আরব-চিন্তা-ধারা'র সহিত মিলিত হইয়া ভারত-গ্রীক-আরব-জ্ঞানের সমন্বয় ঘটাইয়া ছিল। এই অপূর্ব সমন্বয়ের ফলে আরব নরপতিগণের রাজত্বসময়ে বাগদাদ যেমন জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র হইয়াছিল, তেমন তাঁহাদিগের দরবার-গৃহও পৃথিবীর নানা জাতীয় বিদ্বানগণের ভারত-গ্রীক-আরব মিলন-মন্দিরে পরিণত হয়। এই জ্ঞান-বিজ্ঞানের চিন্তাধারার সমন্বয় নবজাগরণের যুগই বোগদাদের সুবর্ণ-যুগ।

খলিফা মামুন সত্যই বুঝিয়াছিলেন যে, মানব-জীবন নর শ্রুত ও জ্ঞান শিক্ষার উপর নির্ভর করে; সেইজন্ম তিনি ভারতীয় পণ্ডিতগণকে ওদীয় রাজসভা অলঙ্কৃত করিবার জন্ম আহ্বান করেন। আটজন ভারতীয় পণ্ডিত গণিত-জ্যোতিষ-চিকিৎসা-বিজ্ঞান সমেত বোগদাদে উপস্থিত হইলেন।(১) এই সকল হিন্দু পণ্ডিতগণের রচিত গ্রন্থাবলী তৎকালীন মুসলিম সভ্যতার উপর অশেষ প্রভাব বিস্তার করে।(২) অসাধারণ জ্ঞানী খলিফা মামুন ভারতীয় এবং গ্রীকগ্রন্থসমূহ স্বয়ং অনুবাদ আরম্ভ করেন। এই বিরাট কর্ম তাঁহার দ্বারা সম্পন্ন হয় নাই; তাঁহার উপযুক্ত পুত্র কর্তৃক যোগ্যতার সহিত সুসম্পন্ন হয়। এইরূপে আরবজাতি, ভারতীয় এবং গ্রীক-বিদ্যা-জ্ঞানের ভাণ্ডার হইয়া উঠে। আরবীয় প্রতিভার নবজাগরণের ফলে আরবে অনেকগুলি

১। Civilization of Ancient India. R. C. Dutt; Encyclo Britanica 11th edition; History of Sanskrit Literature. Macdonell.

২। Literary History of the Arabs.—Nicholson.

পৃষ্ঠপোষক ও বন্ধুলাভ

সুপণ্ডিত জগদ্রথ করেন। তাঁহার সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞান (গণিত-জ্যোতিষ-চিকিৎসা-রসায়ন) শাস্ত্রের আলোচনা দ্বারা সুপ্রসিদ্ধ হইলেন।

পারশুর ধোরাসান খলিকাগণের রাজত্ব সময়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানে সমৃদ্ধ হইয়া বোগদাদের মতই জ্ঞানাস্থলীনের পাদপীঠ ও বিদ্যানগণের মিলন-মন্দিরে পরিণত হইয়াছিল। বোগদাদ রাজসভা, যেমন খলিকার রাজত্ব-সময়ে গ্রীক এবং ভারতীয় বিদ্যানগণ কর্তৃক সমলঙ্কৃত হইয়াছিল, ধোরা-সানও তদ্রূপ আরব-পারশুর দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক-কবি-প্রতিভাচ্ছটার উজ্জল হইয়াছিল। আরব-পারশুর সুবর্ণ-যুগের মধ্যবস্থায় মনীষী ওমর খৈয়ামের বৈজ্ঞানিক-প্রতিভার বিকাশ হয়।

DIPSIKHA LIBRARY

Acc. No. 4469 Dt. 4.6.

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গণিতবিদ ওমর খৈয়াম

দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বৎসার পর বৎসর, ঋতুর পর ঋতু চলিয়া যাইতেছে; গুলাবকুঞ্জে বুলবুল নিত্য বাক্য দিতেছে; গুলাব-হেনাকুঞ্জে তীব্র মধুর সুবাস ছড়াইয়া খোয়াসানের পীচ-স্রাবাতি-বর্জ্জুর-দ্রাক্ষা-কুঞ্জ-শোভিত চতুর্পার্শ্ব পল্লীতে স্বপ্ন-রাজ্য রচনা করিতেছে। কত কুন্দখবল জ্যোৎস্না নিভৃত দ্রাক্ষাকুঞ্জান্তরালবর্তী ওমরের পূর্ণ-কুটীরে আসিয়া কিরিয়া যাইতেছে। জ্ঞান-যোগী ওমরের সেদিকে দৃষ্টি নাই—জ্ঞাপন নাই। সত্যসাধক ধ্যান-জগতে বিচরণ করিতেছেন—সত্যের সন্ধানে ব্যস্ত। কখনো সংখ্যা-বিজ্ঞানের সাহায্যে, কখনো বা বর্ণমালার অক্ষরগুলিকে সংখ্যা-স্বরূপ ধরিয়া, সাক্ষাতিক চিহ্নবারা রাশি-বিষয়ক সিদ্ধান্ত সকল যুক্তি-সহকারে সংস্থাপনপূর্বক, অল-জবর ওয়াল মোকাবলা দ্বারা সত্য-নির্ণয়ে ব্যস্ত। কখনো বা গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি পর্যালোচনা করিতেছেন। কখনো বা জ্যোতিষের কূটতর্ক লইয়া ব্যস্ত। কখনো বা—শারদীয় নভোমণ্ডল যখন মেঘশূন্য হইয়াছে এবং শরতের নীল নির্মল আকাশে তারকাপুঞ্জ পূর্ণ জ্যোতিতে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, তখন জ্ঞান-তপস্বী ওমর ত্রিলোকদর্শী ঋষির মত একাগ্র মনে, অধ্বেষণের নয়নে, দূরবীণ হস্তে আকাশের দিকে তাকাইয়া, নব-নক্ষত্রের সন্ধানে, প্রহরের পর প্রহর অতিবাহিত করিতেছেন।

এইরূপ সুদীর্ঘকালব্যাপী ধ্যান-ধারণা, গভীর গবেষণা, যোগ-সাধনার

কলবরূপ ওবর একখণ্ড অল-জবর ওয়াল মোকাবলা প্রণয়ন করেন। আরবীয় প্রাচীন গণিত-বিজ্ঞান-গ্রন্থে এই নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। গণিতের কোন শাখার সাধারণ মূলমন্ত্র বা নিয়মসমূহের প্রণালীবদ্ধ বিবৃতি অথবা বর্ণনায় সমীকরণ সমাধান প্রণালীই তৎকালে অল-জবর ওয়াল মোকাবলা নামে পরিচিত ছিল। অল-জবর অর্থে পুনঃসংস্থাপন (restoration) এবং মোকাবলা অর্থে বর্ণনায় সমীকরণ (equation) বুঝায়। আরব-গণিতবিদগণ কিন্তু এই সিদ্ধান্ত (theory) স্বীকার করিতেন না।^(১) আরব-গণিতবিদ বহা-অল-বিন অল-অমিলি তাঁহার গণিতগ্রন্থই খুলাস-অল হিসাব (গণিতসার) গ্রন্থে অল-জবর ওয়াল মোকাবলার সংজ্ঞা এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন,—কোন সমীকরণের যে পার্শ্বে বিয়োগ সংখ্যা থাকে, তাহার অপর পার্শ্বে ঠিক সমান সংখ্যা যোগকরতঃ পূর্ব পার্শ্বের বিয়োগ সংখ্যা তুলিয়া উহার পুনঃসংস্থাপনকে অল-জবর এবং উত্তর পার্শ্ব হইতে একই বা সমান সংখ্যক রাশি বিয়োগ করার নামই অল-মোকাবলা। আরবীয় প্রাচীন গণিত-গ্রন্থ ইলম্ অল-জবর ওয়াল মোকাবলার কোন প্রকার সংজ্ঞা দৃষ্ট হয় না।^(২)

কালক্রমে মোকাবলা শব্দের প্রচলন হ্রাস হয়। আবু অকারিয়া অল হস্ৰ তাঁহার গণিত-গ্রন্থে কেবলমাত্র “অল-জবর” শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন; এই নামই প্রতীচ্য গণিতবিদগণ প্রাচ্য হইতে গ্রহণ করিয়াছেন এবং অত্যাধি ইহাই ইংরাজীতে Algebra নামেই পরিচিত। যোগ বা বিয়োগ চিহ্নবয়ের মধ্যবর্তী কোন রাশির অংশ আরবীয় গণিতবিদগণ

১। Encyclo of Islam.

২। Encyclo of Islam.

কতৃক আবিষ্কৃত অথবা গ্রীক বা হিন্দু গণিতবিদগণের গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত, ইহা আশিও প্রমাণিত হয় নাই। (১) ওমরের অল-জবর ওয়াল

মোকাবেলা প্রকাশিত হইবার পূর্বে আরব দেশে ওমরের অল জবর ওয়াল তিনখণ্ড অল-জবরা প্রকাশিত হয়। ইহার মোকাবেলার পূর্বে যথাক্রমে নবম, দশম ও একাদশ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত আরবীর বীজগণিত হইয়াছিল। প্রথম খণ্ডের রচয়িতা মহম্মদ ইবন

মুসা অল-খোয়ারেশমী; হিন্দুগণিতবিদ আর্যভট্ট ও গ্রীক গণিতবিদ দাওন্টোসের (Diophantus) মত ইনি আরবীর অল-জবরার জুটকর্ষা; এই অল-জবরার পূর্বে আরব-গণিত বিজ্ঞানে এই জাতীয় কোন গ্রন্থ ছিল না। (২) সুপ্রসিদ্ধ গণিতবিদ গাউস (Gauss) বলিয়াছেন, গণিত-বিজ্ঞান বিজ্ঞানের মহারানী। ৩) মহারানী অঙ্কগণিতের জন্ম ভারতবর্ষে। অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে ভারতীয় গণিতবিদগণ বীজগণিত (Algebra) এবং অঙ্কগণিতে (Arithmetic) প্রাচীন মুসলিম গণিতবিদগণের গুরু ছিলেন। (৪)

অল-কিন্দীয় গণিত-গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার পর হইতে প্রাচীন মুসলিম গণিতবিদগণ ভারতীয় গণিত-বিজ্ঞান শাস্ত্রের সহিত সম্যক পরিচয় লাভ করেন। এই সময় হইতেই ভারতীয় গণিত-বিজ্ঞান-শাস্ত্র তাঁহাদিগের নিকট প্রিয় বস্তুরূপে পরিগণিত হইয়াছিল। (৫) ইহার কালে মুসা-পুত্র মহম্মদ ৮২০ খৃষ্টাব্দে হিন্দু আদর্শেই তাঁহার অল-জবর

১। Encyclo of Islam.

২। Encyclo B itaniea 11th edition, 1910.

৩। History of Mathematic.

৪। History of Sanskrit Literature—Macdonell.

৫। Alberuni's India, Preface, Sachau.

ওয়াল মোকাবলা রচনা করেন। তিনি আরবীয় গণিতবিজ্ঞানসাহিত্যের পুষ্টির জন্য খলিকা অল্-মামুনের আদেশে বিভিন্ন ভাষা হইতে ইহা সংকলন করিয়া এই গ্রন্থের “অল্-জবর ওয়াল মোকাবলা” নামকরণ করেন।

এই গ্রন্থ হইতে গ্রন্থকারের হিন্দু জ্যোতিষ ও আয়ব বীজগণিত-বেত্তাগণ গণনা-জ্ঞানের সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। ইনি ভারতীয় সংখ্যাবিজ্ঞানের সাহায্যে পাট-গণিতও রচনা করেন! (১)

দ্বিতীয় খণ্ডের রচয়িতা আবুল ওয়াকা। ইনি গণিতবিদ মহম্মদ-রচিত অল্-জবর অবলম্বনে একখণ্ড টীকাগ্রন্থ রচনা করেন। গ্রীক গণিতবৈজ্ঞানিক দাণ্ডফেনটসের গ্রন্থাবলী আবুল ওয়াকা কতক অনূদিত হয়। (২)

গ্রীক এবং ভারতীয় গণিত-বিজ্ঞানে জ্ঞানলাভ করিয়া আরবীদ্বারা একনিষ্ঠা ও ব্যগ্রতা সহকারে গণিত-বিজ্ঞান-সাহিত্য সমৃদ্ধ করিতে সচেষ্ট হইলেও নবম ও দশম খৃষ্টাব্দের মধ্যে আরবীয় অল্-জবরার বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। প্রকৃতপক্ষে আরবীয় অল্-জবরার উন্নতির পুঙ্খপাত হয় একাদশ খৃষ্টাব্দে। উপযুক্ত সময়েই যোগ্য ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়া থাকে। মুসা-পুল মহম্মদ এবং আবুল ওয়াকার পরই গণিতবিজ্ঞান-ক্ষেত্রে যে অসাধারণ প্রতিভাশালী গণিতবিদের আবির্ভাব হয়,—তিনি ওমর খৈয়াম। এই যুগেই গণিত-বিজ্ঞান-প্রতিভার অপ্রতিদ্বন্দ্বী সাধক ওমর খৈয়াম অল্-জবরার প্রকৃত পুষ্টিসাধন করেন।

তৃতীয় খণ্ডের রচয়িতা কার্হি দেশ অল্-কার্হি। ইনি গ্রীক

১। Encyclo Britanica, 9th editton, 1875.

২। Colebro k's Dissertation.

আদর্শে অল্-জবর প্রণয়ন করেন। এবং জ্যামিতি ও অল্-জবর সাহায্যে
কর্গীয় সমীকরণ (Quadratic equation) সমাধান করেন। কেবল-

মাত্র জ্যামিতির সাহায্যেই যে ষন সমীকরণ
ওমরের গণিত-প্রতিভা।

সমাধান (Cubic equation) করিতে পারা
বার, ওমর খৈয়াম প্রচুর গবেষণার দ্বারা তাহা সপ্রমাণ করিয়া বৈজ্ঞানিক
জগৎকে চমৎকৃত করেন। (১) তিনিই নূতন প্রণালীর উদ্ভাবক
এবং এই প্রণালীই তাঁহার সময় হইতে, পারস্য ও আরব দেশে বিস্তৃতি লাভ
করিয়াছিল। (২)

ওমর-রচিত নূতন অল্-জবর একদিকে যেমন তাঁহাকে তৎকালীন
গণিতবিদ পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছিল, ৩)
তেমনি অত্রদিকে গণিত-বিজ্ঞান-সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়া পৃথিবীর ইতিহাসে
তাঁহার কীর্তি চিরস্মরণীয় করিয়াছে। ঐতিহাসিক হামদুল্লা মুস্তাফি
বলিয়াছেন, বিজ্ঞান-শাস্ত্রের নানা বিভাগে ওমরের কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া
গেলেও, প্রকৃতপক্ষে তিনি গণিত-জ্যোতিষ-বিজ্ঞানেই চরমোৎকর্ষ লাভ
করিয়াছিলেন। (৪)

অন্তরীক্ষে কোন নূতন গ্রহ বা নক্ষত্র উদয় হইলে জ্যোতির্বিদমণ্ডলী
যেমন আনন্দ-কোলাহল করিয়া বিশ্বব্যবিস্ফারিতলোচনে তাহার দিকে
দৃষ্টিপাত করে, ওমরের অল্-জবর প্রকাশিত
গণিত-বিজ্ঞানে অপ্রতি-
দ্বন্দ্বী সাধক ওমর খৈয়াম
হটবার পর গণিতবিদ পণ্ডিতমণ্ডলী গ্রন্থকারের
জ্ঞান, পাণ্ডিত্য ও অদ্ভুত গবেষণা তেমনি

১। Encyclo of Education vol ii ; Encyclo Britanica
11th- edition 1910.

২। History of Mathematics,

৩। Encyclo-Britanica, 9th edition. 1875.

৪। তারিখ-ই-ওজ্জিদা।

সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিয়াছিল। এই গ্রন্থ প্রচারের পর ওমরের প্রতিভা পাণ্ডিত্য ও বশ পারশ্ব ও আরবের চতুর্দিকে বিস্তৃতি লাভের সঙ্গে-সঙ্গে শুধুই যে তৎকালীন শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতমণ্ডলীর বশঃপ্রভা নিশ্চয় করিয়াছিল তাহা নহে; উপরন্তু আরব ও পারশ্ব দেশকে অগতের চিন্তা-রাজ্যের শীর্ষদেশে উপনীত করিয়াছিল (১) সমগ্র পণ্ডিতসমাজ শ্রদ্ধার সহিত একবাক্যে ওমরকে গণিত-বিজ্ঞানে বিশেষজ্ঞ বলিয়া স্বীকার করিয়াছিল। চরিত্রাভিধানকার অল কুন্সাজুনিরের উক্তি হইতে আমরা এ কথা যথার্থ উপলব্ধি করিতে পারি। তিনি লিখিয়াছেন, ওমর দর্শন ও বিজ্ঞানবিশারদ ছিলেন বটে, কিন্তু গণিত-বিজ্ঞানে এরূপ বিশেষজ্ঞ ও সুপণ্ডিত ছিলেন যে, তৎকালে তাঁহার সমবক্ষ কেহই ছিল না। (২) ওমরের অল জবরা বহু শতাব্দী ধরিয়া পাঠ্যপুস্তকরূপে ব্যবহৃত হইয়া তাঁহার অতুলনীয় প্রতিভার সাক্ষ্য দিয়াছে।

ইহার পর ওমর, হেন্দেসা (জ্যামিতি) মসাহাবা (পরিমিতি) এবং ত্রিকোণমিতির কঠিন উপসিদ্ধান্তগুলির (corrolarie) টীকা রচনা করেন। অল-জবরা রচনার সময় আরবীয় গণিতবিদগণ ভারতীয় এবং

গ্রীক আদর্শ গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু জ্যামিতি ওমরের জ্যামিতি ও

পরিমিতি রচনা

রচনার সময় সম্পূর্ণ গ্রীক আদর্শে অনুপ্রাণিত

হইয়া জ্যামিতি রচনা করেন। আরবীয় গণিত-

বৈজ্ঞানিকগণ গ্রীক গণিত-বিজ্ঞানচর্চা ও গ্রন্থ অনুবাদের বলে গ্রীক প্রভাবাধিত হইয়া পড়েন। এই কারণে তাঁহারা গ্রীক আদর্শে জ্যামিতি রচনা করেন। গণিত-বিজ্ঞানের এই বিভাগে সৃষ্টিছেদ গণিত সাহায্যে

১। Cyclo of Education, Munroe. vol iv.

২। আগর-উল-বিলাদ।

অল-জবরার সমীকরণ সমাধান দ্বারা (by solution of Algebraic equations by intersecting conics) তাঁহারা কিছু জ্ঞানের পরিচয় ওমর কর্তৃক জ্যামিতির দিখাইলেন বটে কিন্তু ইহার কোন নির্দিষ্ট প্রণালী ছিল না। একাদশ শতাব্দীতে ওমর খৈয়াম আরবীয় জ্যামিতিকে নির্দিষ্ট প্রণালীতে আবদ্ধ এবং ইহার সংস্কার দ্বারা ইহাকে নূতন রূপ দান করেন। ওমর অল-জবরার জায় জ্যামিতিকে উপপত্তিপরস্পরা (Theo-y) দ্বারা সংস্কার করিয়া সম্বদ্ধ করেন। (১)

ইহার অবাবহিত পরেই ওমর পাটিগণিতের বর্গমূল ও ঘনমূল (square and cube root) বিষয়ক আর একখানি গ্রন্থ প্রচার করেন। গণিত-বিজ্ঞান বিষয়ক উপবোধিত গ্রন্থগুলি প্রচারিত হইলে খোরাসানের পণ্ডিতমণ্ডলী অসাধারণ প্রতিভাশালী মনসী আবু আলি সিনার অসামান্য প্রতিভার সহিত ওমরের নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভার তুলনা করিয়া তাঁহাকে “আবু আলি সিনার অবতার” আখ্যায় অভিহিত করিয়াছিল। (২) ষাঁহার নবনবোন্মেষশালিনী প্রতিভা গণিত-বিজ্ঞানের দুর্লভ সমস্তার সমাধান বিষয়ে তাঁহার বহু পূর্ববর্তী মনীষী ইউক্লিডের অপূর্ণ প্রতিভাকেও অতিক্রম করিয়াছিল; (৩) তিনি যে আবু আলি সিনার সহিত তুলিত হইয়া ‘অবতার’ আখ্যায় অভিনন্দিত হইয়া দেশবাসীর প্রশংসাত করিবেন, ইহাতে আর বিচিন্তা কি?

আমীর আবু তাহির দরির ওমরের জ্ঞান ও প্রতিভার চমৎকৃত

১। Encyclo Br tanica 11th edition, History of Mathematics.

২। গ্যাজে দানিশ।

৩। বাজনারাই।

হইয়া যে কেবলমাত্র তাঁহাকে অর্থ-সাহায্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে, তিনি ওমরের প্রকৃত বন্ধু ও শুভাকাজী ছিলেন। আমীর যেমন স্বতঃপ্রসূত হইয়া ওমরকে অর্থ সাহায্য করিয়া তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথ উন্মুক্ত করিয়া গিয়াছিলেন, তেমনি শুভকামনা করিয়া তাঁহার পাণ্ডিত্য-প্রতিভার কথা সুলতান মলিক শাহের মন্ত্রী, বন্ধু নিজাম-উল-মুন্সের কর্ণগোচরও করেন; এবং পরে ওমরকে

সুপণ্ডিত নিজাম-উল-মুন্সের সহিত পরিচিত করিয়া দেন। নিজাম-উল-মুন্স নিজেকে যেকল্প বিদ্যোৎসাহী ও গুণগ্রাহী ছিলেন, তেমনি

সাহিত্য-রসিক ও সুপণ্ডিত ছিলেন। আমীর আবু তাহিরের মত, তিনিও ওমরের প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া বৈজ্ঞানিক গবেষণা-কার্যে তাঁহাকে উৎসাহিত করেন। এই সময় হইতে দরিদ্র ওমর সুপণ্ডিত নিজাম-মুন্সের অনুরূপদৃষ্টিতে পতিত হইয়া তাঁহার বন্ধু-শ্রেণীভুক্ত হন।(১)

ইহার কিছুদিন পরেই ওমরের অল-জবরা প্রকাশিত হয়। ওমর কোনকালেই অকৃতজ্ঞ ছিলেন না। যাঁহার উদার ও স্বতঃপ্রসূত অর্থ-সাহায্য তাঁহাকে দারিদ্র্য-মুক্ত করিয়া তাঁহার বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছিল, যাঁহার মেহ-শীতল উদার হৃদয়ে বেহসিক্ত বন্ধুর স্থান পাইয়া ধন্য হইয়া ছিলেন, ওমর যৈয়াম তাঁহার প্রথম গ্রন্থ অল-জবরা বন্ধুত্ব ও প্রদ্বার নিদর্শন-স্বরূপ সেই

উদার হৃদয় বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক আবু তাহিরের অল-জবরা উৎসর্গ নামে উৎসর্গ করেন। মন্ত্রী নিজাম-উল-মুন্সকেও

ওমর তাঁহাব গণিত গ্রন্থ উপহার প্রদান করিয়া ধন্য হইলেন। আমীর আবু তাহিরের মত, মন্ত্রীও ওমরের প্রকৃত বন্ধু ও শুভাকাজী ছিলেন। তিনি

এই নবপ্রচারিত অল-জবরা প্রাপ্তে ওমরের অসাধারণ অধ্যবসায়, অতুলনীয় পাণ্ডিত্য ও অভূতপূর্ব গবেষণার পরিচয় পাইয়া মুগ্ধ হইলেন। বহু ওমরের বিজ্ঞান-প্রতিভা যাহাতে রাজ-সম্মানে ভূষিত ও পুরস্কৃত হয়, তাহার জ্ঞাত্ত তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া তাঁহার পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার কথা সুলতান মলিক শাহের কর্ণগোচর করেন। সুলতান মন্ত্রী মুখে ওমরের পাণ্ডিত্য-প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া ওমরকে দরবারে উপস্থিত করিবার জ্ঞাত্ত আজ্ঞা প্রদান করেন। সুলতানের আজ্ঞা তৎক্ষণাত্

প্রতিপালিত হয়; রাজদূত প্রধান মন্ত্রীর আজ্ঞায় ওমর-প্রতিভার সম্মান নিশাপুরে ওমরের পর্ণকূটারে উপস্থিত হইয়া রাজ-দরবারে উপস্থিত হইবার জ্ঞাত্ত মন্ত্রী প্রেরিত আহ্বানপত্র প্রদান করে। ওমর সুলতানের আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া নিজাম-উল মুক্কেরও গৃহে উপস্থিত হন। মন্ত্রী সমস্ত ঘটনা ওমরকে জ্ঞাত করেন। কৃতজ্ঞতায় ওমরের দুই চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠে। ওমর যথাসময়ে দরবারে উপস্থিত হইলে নিজাম-উল-মুক্কেও সুলতানের সহিত ওমরের পরিচয় করিয়া দেন। এই সময় হইতে ওমর খৈয়াম সুলতানের দরবারের

অগ্রতম বিধান-পারিষদরূপে সম্মানিত হন।
বিধান পরিষদ ইহার পর ওমর নিশাপুরের পর্ণকূটার ত্যাগ করিয়া রাজধানী মারভ নগরে অবস্থান করিতে থাকেন।

সত্যসাক্ষক ওমরের গণিত-বিজ্ঞান পুস্তকাবলী আজকাল আর পাওয়া যায় না; তবে তন্মধ্যে দুই-একখণ্ড পুস্তক ইয়োরোপের কোন কোন প্রসিদ্ধ পাঠাগারে আজিও প্রকাশ্য সহিত ওমরের গণিত-বিজ্ঞান পুস্তকাবলী রক্ষিত হইয়া পাঠাগারের সংগ্রহের মূল্য বৃদ্ধি করিতেছে। ওমরের অল-জবরার প্রতিলিপি

হল্যাণ্ডের লীডেন পাঠাগারে অত্যাধিক সঙ্খ্যে রক্ষিত আছে। ১৭৪২ খৃষ্টাব্দে

ডাচ্ (Dutch) গণিতবিদ জেরল্ড মুরম্যান (Gerald Murmann) তাঁহার “Specimen Calculi Fluxionalis” নামক পুস্তকের উপক্রমণিকায় ওমরের অল-জবরার বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে গণিতবিদ শেডিলো (Shedilot) Nouv Jour. Asiatique পত্রিকায় বিস্তৃত আলোচনা করিয়াছেন। (১) প্যারিস ও লীডেন পাঠাগারে ওমরের অল-জবরার যে পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে, ইতালীয় গণিতবিদ লিব্রী (Libri) প্রথমে উহা আবিষ্কার করেন। (২) উহাই ফরাসী গণিত-বৈজ্ঞানিক মুঁশো উপেক (M. F. Woepeck) ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে ফরাসী ভাষায় অনুবাদ ও সম্পাদন করেন। অনূদিত পুস্তকের বামদিকে মূল আরবী ও দক্ষিণদিকে ফরাসী অনুবাদ দৃষ্ট হয়। সুপণ্ডিত মুঁশো উপেক এই অল-জবরার অন্তর্গত অনুশীলনীর শ্রেণীবিভাগ, সূত্র এবং সঠিক শৃঙ্খলাপূর্ণ অনুশীলন প্রণালীর বিষয় উচ্ছ্বসিত ভাষায় তাঁহার অনূদিত পুস্তকের উপক্রমণিকায় শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন।

ওমর-রচিত ইউক্লিডের জ্যামিতির স্বীকার্য বিষয়ক আর একখানি টীকা-গ্রন্থ লীডেন পাঠাগারে অত্যাধি সময়ে রক্ষিত আছে। ওমরের গণিত-বিজ্ঞান-বিষয়ক আরবী ভাষায় লিখিত মূল পুস্তকগুলি লীডেন, প্যারিস ও ইণ্ডিয়া পাঠাগারে রক্ষিত আছে। লীডেন পাঠাগারে পাটীগণিতের ছুর্কোধ্য সমস্ত নিরাকরণ বিষয়ক আর একখানি গ্রন্থ রক্ষিত আছে। এই গ্রন্থখানির নাম “মুসকিলাত-ই-হিসাব।” (৩)

১। Historic of Mathematics ; Encyclo of Britanica. 1910.

২। Historic des sciences mathematiques en Itali.'

৩। Cyclo of Education. Monroe.

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞান

প্রাচীন মুসলিম সম্প্রদায় জ্যোতির্বিজ্ঞানকে ‘ইল্ম-উন্-তানজিম’ নামে অভিহিত করিতেন। ইহাতে কলিত জ্যোতিষ ইল্ম-আহকাম-উন্-নুজুম (Science of art of the decrees of the stars) এবং গণিত জ্যোতিষ ইল্ম-উন্-নুজুম (Science or art of stars) আরব জ্যোতির্বিজ্ঞান উভয়কেই বুঝাইত। ইব্নে রোশদ (১) গণিত-জ্যোতিষকে (Astronomy) প্রত্যক্ষকবাদ নক্ষত্র-বিজ্ঞান (Experimental art of stars) এবং কলিত জ্যোতিষকে (Astrology) গণিত-বিজ্ঞান-মূলক নক্ষত্র-বিজ্ঞান (Mathematical art of stars) নামে অভিহিত করিয়াছেন। (২)

প্রাচীনকালে পারস্য দেশে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সবিশেষ সমৃদ্ধি হইয়াছিল। পারসিক রাজকমণ্ডলী, জ্যোতির্বিজ্ঞানে সবিশেষ পারদর্শী

১। ইহার সম্পূর্ণ নাম আবুল ওয়ালিদ মহম্মদ বিন আহমদ। স্পেনের অন্তর্গত কডোভা শহরে ১১৪২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন; ইনি দর্শন, বিজ্ঞান, ব্যবহাশাস্ত্র, মেমতত্ত্ব, গণিত-বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। আরিস্তোতলের গ্রন্থাবলী আববী ভাষায় অনুবাদ, ব্যাখ্যা ও টীকা প্রচার করেন।

২। Encyclo of Religion and Ethics.

ছিলেন। তৎকালে পারশিকগণের প্রত্যেক জাতীয় উৎসব, ধর্ম্মাছুঠানে
 চন্দ্র, সূর্য্য ও নক্ষত্রের পূজা হইত।(১) পারশিক ধর্ম্মের প্রবর্তক জোরাস্তার
 জ্যোতির্জৈবানিক শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ ছিলেন(২)। তিনি জ্ঞানী ও
 জোরাস্তার পয়গম্বর বা ঈশ্বরের বর্ত্তাবহরূপে যেমন গ্রীক
 পণ্ডিতগণের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন, তেমন
 জ্যোতির্বিদরূপেও শ্রদ্ধাষিত ছিলেন।(৩)

পঞ্চম খৃষ্টাব্দে পারশপতি নওশেরওয়ানী পারশের পশ্চিম-প্রান্ত-দেশ—
 জামদিশপুর্বে দর্শন ও বিজ্ঞান অনুশীলনের জন্ম এক মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেন।
 এই মাদ্রাসায় গ্রীক জ্ঞানানুশীলনের যে সূচনা হয়, পরে উহা জ্ঞান বিজ্ঞান
 অনুশীলনের কেন্দ্রস্থানে পরিণত হইয়া আব্বাসবংশীয় খলিফাগণের রাজত্ব
 ওয়ময় পর্যন্ত জ্ঞানালোক বিতরণ করিয়াছিল।(৪)

দ্বিতীয় হিজর'ব্দে (খৃঃ সপ্তম খৃষ্টাব্দে) পারাশুর মুসলিম রাজত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত
 হইবার পর হইতে আব্বাসবংশীয় খলিফাগণের উৎসাহ ও যত্নে
 জ্যোতির্বিজ্ঞানের সমূহ উন্নতি হয়।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, মুসলিম পণ্ডিতগণ প্রথমে
 জ্যোতির্বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান হিসেবে গণ্য করেন
 নাই।(৫) অধিকাংশ মুসলিম দার্শনিক ধর্ম্মতত্ত্ব ও
 বিরুদ্ধবাদী দল ব্যবস্থাশাস্ত্রবিদ জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিরোধী ছিলেন।
 কেবলমাত্র অল-কিন্দী এবং ফখরুউদ্দীন রাজী বিরুদ্ধবাদী ছিলেন

১। Essays on the Religion of the Parsis, Haug.

২। Zoraster Jackson

৩। Encyclo of Religion and Ethics.

৪। Encyclo Britanica 9th edition 1875.

৫। Encyclo of Islam.

না। জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিরুদ্ধবাদী দল সৃষ্টি হইবার একমাত্র কারণ—গ্রীক প্রভাব। কারণ দেখা যায় যে, দ্বিতীয় হিজরাদের

শেষ ভাগে মুসলিম দার্শনিকগণ গ্রীক দার্শনিক
কারণ আরিস্তোতলের (Aristotle) গ্রন্থাবলী পাঠ

করিয়া অসাধারণ জ্ঞানের অধিকারী হন। ইহার ফলে তাঁহারা
দেশ মধ্যে প্রচার করেন যে, জ্যোতির্বিজ্ঞান কুসংস্কার ও কাল্পনিক

ভিত্তির উপর স্থাপিত এবং অনুশীলনের অযোগ্য।

আবু-সিনা ও
জ্যোতির্বিজ্ঞান সুতরাং জ্ঞান-রাজ্যে ইহার কোন স্থান নাই। অল-

ফ্যারাবী, আবু সিনা ও ইবনে রোশদ্ প্রমুখ যুগ-
প্রসিদ্ধ দার্শনিকগণ এই মত প্রচার করেন। গ্রীক-জ্ঞান-প্রতীক আবু-
সিনা প্রমাণ করেন যে, জ্যোতির্বিজ্ঞানের কোন প্রকার ভিত্তি বা কোন
প্রকার সিদ্ধান্তাত্মক সত্য (Theoretical truth) নাই; পরন্তু অন্ধ
কুসংস্কারে পূর্ণ। সুতরাং এরূপ বিজ্ঞান অনুশীলনের অযোগ্য। আবু-
সিনার মত অল-ফ্যারাবী ও ইবনে রোশদ্ গ্রীক দর্শনে অসাধারণ পণ্ডিত
ছিলেন। ইহারাও আপন আপন যুক্তি দ্বারা জ্যোতির্বিজ্ঞানের বিরুদ্ধে
মত প্রচার করেন। কেবলমাত্র দার্শনিক অল-কিন্দীই ইহার অনুকূলে
মত প্রচার করিয়াছিলেন। একমাত্র তিনিই জ্যোতির্বিজ্ঞানকে দর্শন-
শাস্ত্রের সম্পূরক অংশ (integral part of philosophy) বলিয়া
প্রচার করেন। নিজ মত প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য তিনি এই বিজ্ঞানের ভিত্তি
বা উৎস পর্য্যন্ত অনুসন্ধান করিয়াছিলেন। গণিত-বিজ্ঞান ব্যতীত তিনি
প্রাকৃত ও অধ্যাত্ম দর্শনের মতবাদের মধ্যেও ইহার ভিত্তি অনুসন্ধান
করিয়াছিলেন।(১)

দার্শনিকগণের পর, ধর্মতত্ত্ব ও ব্যবস্থাসাংখ্যিকবিভাগও স্থির ছিলেন না।

মাহুয়ের কার্যের বা শক্তির উপর গ্রহ-নক্ষত্রের প্রভাব কিরূপ, তাহাই তাঁহারা লক্ষ্য করিতেছিলেন; জ্যোতির্বিদগণ যখন গণনার দ্বারা স্থির করিয়া অকুতোভয়ে প্রচার করিল যে, দার্শনিক, ধর্মতত্ত্ব ও ব্যবস্থাপনাবিদগণ ও নবোদ্ভূত ইসলামের স্থায়িত্ব বা স্থিতিকাল অধিক দিন নহে, তখন তাঁহারা অধৈর্য্য হইয়া ইহাদিগের প্রগল্ভ যুক্তি বা গণনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ

বোষণা করেন। (১)

অনুকূল-প্রতিকূল-অবস্থার মধ্য দিয়া জ্যোতির্বিজ্ঞান ধীরে ধীরে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছিল। প্রথমে যাহারা এই বিজ্ঞানের বিরুদ্ধবাদী ছিলেন, তাঁহাদিগের মধ্যে অনেকেই আপনাদিগের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া পুনরায় ইহার অনুকূলে মত প্রচার করেন। উদাহরণস্বরূপ বিরুদ্ধবাদী দলের অগ্রণী আবু-সিনার নাম উল্লেখযোগ্য।

তিনি অবশেষে স্বীকার করেন যে, জ্যোতির্বিজ্ঞান বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত এবং ইহা সিদ্ধান্তাত্মক সত্যে পূর্ণ। ইম্পাহানে অবস্থান-কালে তিনি জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে অনেকগুলি সুবৃহৎ পুস্তকও রচনা করেন। (২) এই সময় হইতে মুসলিম সম্প্রদায়ের বহু বিদ্বান এই বিজ্ঞানকে (Science) বিজ্ঞান-হিসাবে অনুশীলন করিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

ইসলামের প্রারম্ভিককালে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে আরব জাতির মোটামুটি সাধারণ জ্ঞান ছিল। যাবাবর-জীবনযাপনকারী বেদুঈনগণ প্রথর স্বর্য়্যালোক অপেক্ষা রাত্রিকালই, দ্বিধাচক্রকিরণজাত মরুভূমি

১। Encyclo of Religion and Ethics.

২। Encyclo of Religion and Ethics.

অতিক্রমণের প্রাথমিকাল স্থির করিয়াছিল। নিশাভ্রমণে, চন্দ্রদেব ও নক্ষত্ররাশিই তাহাদিগের পৃথি-প্রদর্শকের কাজ করিত। চন্দ্র এবং নক্ষত্ররাশির গতিবিধি, উদয় এবং অস্তকাল হইতেই তাহারা মোটামুটি সাত্ত্বিক কাল নির্ধারণ করিত। চন্দ্র এবং নক্ষত্রগুণের গতিবিধি এবং অবস্থিতি পরিদর্শন করিয়া বেতুর্জেনগণ সমস্ত ঋতুচাল ও মীমাংসা করিত। (১)

মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানের উৎপত্তি হিন্দু, গ্রীক, পারসিক এবং মিশরীয় জ্ঞান-উৎস হইতে। (২) প্রথম মুসলিম জ্যোতিষ গ্রীক-প্রভাবান্বিত ছিল। গ্রীক পণ্ডিতগণের গণনা ও সিদ্ধান্তানুসারে মুসলিম সম্প্রদায় জ্যোতির্বিজ্ঞান আলোচনা করিতেন। দ্বিতীয় হিজরাদ (সপ্তম খৃষ্টাব্দ) হইতে তাহারা হিন্দু প্রভাবান্বিত হইয়া হিন্দু জ্যোতির্বিদ ব্রহ্মগুপ্ত (৫৯৮ খৃঃ) প্রণীত ব্রহ্মসুটসিদ্ধান্ত অবলম্বনে জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুশীলন করেন। ৩. ব্রহ্মগুপ্তের স্ফুটসিদ্ধান্ত - ৬২৮ খৃষ্টাব্দে রচিত ও ৭৭১ খৃষ্টাব্দে বোঙ্গদাদে অনীত হয়। জ্যোতির্বিদ ইব্রাহিম বিন-ইবিব-অল-খাজারি এবং ইয়াকুব-বিন-তারিখ তৎকালীন প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদগণ স্ফুটসিদ্ধান্ত অবলম্বন করিয়া মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞান গৃহ রচনা করেন। (৪) ইহার পর আয্যুভট্ট (৮৭৬ খৃঃ) রচিত আয্যুসিদ্ধান্ত অবলম্বনে আবুল-হাসান-অল-আহোম্মাজী গ্রহগণের গতির তালিকা। (Tables of Planetary movements) প্রস্তুত করেন। আয্যুভট্টের সিদ্ধান্ত পুস্তক পাচশত খৃষ্টাব্দে রচিত। ব্রহ্মসুট-

মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানের

উপর ভারতীয় সিদ্ধান্ত

গ্রহাবলীর প্রভাব

করেন। (৪) ইহার পর আয্যুভট্ট (৮৭৬ খৃঃ)

রচিত আয্যুসিদ্ধান্ত অবলম্বনে আবুল-হাসান-অল-

আহোম্মাজী গ্রহগণের গতির তালিকা। (Tables

of Planetary movements) প্রস্তুত

করেন। আয্যুভট্টের সিদ্ধান্ত পুস্তক পাচশত খৃষ্টাব্দে রচিত। ব্রহ্মসুট-

১। Encyclo of Islam.

২। Encyclo of Religion and Ethics.

৩। Encyclo of Islam.

৪। Encyclo Britania 11th edition; Alberuni's, India, preface Sachau.

সিদ্ধান্ত ও আর্ধ্য-সিদ্ধান্ত একই সময়ে বোগদাদে আনীত হয়। উপরোক্ত ভারতীয় গ্রন্থাবলী তৎকালে মুসলিম জ্যোতির্বিদমণ্ডলীর উপর অশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।(১)

ফুটসিদ্ধান্ত ও আর্ধ্যসিদ্ধান্ত গ্রন্থদ্বয় জ্যোতির্বিদমণ্ডলীর গতিবিধির অসংখ্য তালিকা এবং সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যায় পূর্ণ। এই তালিকাগুলি কৃত্রিম সহস্র চক্রানুসারে গ্রথিত। তৎকালপ্রচলিত বিশ্বাস ছিল যে, সৃষ্টির প্রাকালে চন্দ্র এবং গ্রহ সকল যেমন ভ্রামিমাস্তরে সমান ভাবে মিলিত হইয়াছিল, সহস্র সহস্র বৎসর পরেও পুনরায় ঠিক সেইরূপ সমান ভাবে মিলিত হইবে। পঞ্চম হিজরাদ পর্যন্ত এই সিদ্ধান্ত অনুসারে মুসলিম জ্যোতির্বিদগণ জ্যোতির্বিজ্ঞান রচনা করিয়া ইহার “অল্-সিদ্ধ-হিন্দ” (হিন্দু-সিদ্ধান্ত নামকরণ করেন।(২) হিন্দু পণ্ডিতগণের রচিত পুস্তকাবলী হইতে মুসলিম সম্প্রদায় ত্রিকোণমিতির জ্যা ব্যবহার প্রণালী শিক্ষা করেন।(৩)

ইহার পর মুসলিম জ্যোতির্বিদগণ পহলবী ভাষায় রচিত জ্যোতির্বিদ-তালিকার (জীক-অল্-শাহী) সাহায্যে নিজ নিজ জ্যোতির্বিদ-তালিকা রচনা করেন এবং ইহার আরবী অনুবাদও প্রচার করেন। জীক-অল-শাহী শাসানিয়া রাজবংশের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল।

ইহার অব্যবহিত পর তাঁহার মিশরীয় পণ্ডিত টলেমীর বিশ্ববিশ্রুত জ্যোতিষগ্রন্থ “অল-মাজেস্তু” অবলম্বনে জ্যোতির্বিজ্ঞান অনুশীলন করেন।

১। Encyclo of Britanica 11th edition.

২। Encyclo of Britanica 11th edition.

৩। Encyclo of Islam,

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দী হইতে দেখা যায় যে, অন্তরীক জগৎ
মান-মন্দির প্রতিষ্ঠা পর্য্যবেক্ষণ কার্যের সুবিধার জন্য মূলনিম
জ্যোতির্বিদগণ মান-মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

পারস্তের বুয়াইদ সুলতানগণের উৎসাহে ও যত্নে মুসলিম জ্যোতি-
বিজ্ঞানের সমূহ উন্নতি হয়। বুয়াইদ সুলতানগণ বিজোৎসাহী ও
বিদ্যানগণের উৎসাহদাতা ছিলেন।

অসাধারণ জ্ঞানী, বিদ্বান, বিশ্ববিখ্যাত ঐতিহাসিক, ভারত-পর্য্যটক
আবু-রাইহান-অল-বেরুণী মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞানের
ওমরের
আবির্ভাব
অভূতপূর্ব সংস্কার ও উন্নতি সাধন করেন।
তঁহার জ্যোতির্বিজ্ঞান গ্রন্থাবলী বিজ্ঞান-

সাহিত্যকে যেরূপ সমৃদ্ধ করিয়াছিল, বৈজ্ঞানিক-জগতেও তদ্রূপ নবযুগের
সৃষ্টি করিয়াছিল।

ইহার পরই সেলজুক নরপতিগণের উৎসাহে জ্যোতির্বিজ্ঞানের
অভাবনীয় উন্নতি হয়। সুলতান মলিক শাহ, ৪৬৭ হিজরাদে
(১০৭৪ খৃঃ) মান মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই যুগেই পারস্তের শ্রেষ্ঠ
জ্যোতির্বিদগণের প্রতিভা স্নান করিয়া জ্ঞান-প্রতিভার উজ্জ্বল বর্ত্তিকা
হস্তে বিশ্ববিশ্রুত বৈজ্ঞানিক-কবি ওমর খৈয়াম বিজ্ঞান-জগতে আবির্ভূত
হন। সুলতান মলিক শাহের আদেশে প্রতিভার অবতার জ্যোতি-
বিজ্ঞানগ্রন্থ বিশ্ববিখ্যাত ওমর খৈয়াম ১০৭২ খৃষ্টাব্দে চাশ্মাসের
পরিবর্ত্তে সৌরমাস গণনার প্রথা প্রচলিত করিয়া পারস্তের প্রচলিত
পঞ্জিকার সংস্কার করিয়া পৃথিবীর ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হয়েন।

ওমরের নবনবোন্মেষশালিনী বৈজ্ঞানিক-প্রতিভা কেবলমাত্র বৈজ্ঞানিক
ওমরকে বিশ্ব-ইতিহাস-পৃষ্ঠায় চিরস্মরণীয় করিয়াছে তাহা নহে,—তঁাহার
সম্বিত সেলজুক সম্রাট মলিক শাহের নামও চিরস্মরণীয় করিয়াছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

জ্যোতির্বিদ ওমর খৈয়াম

ওমর খৈয়াম প্রথম জীবন হইতেই দার্শনিক ছিলেন। তিনি গৃহে বসিয়া দর্শনের অধ্যাপনা করিতেন। তৎকালে জনসাধারণের দর্শন শাস্ত্রে অমুরাগ না থাকায়, অল্প লোকেই উহা অধ্যয়ন করিত। সেই কারণে তিনি দর্শন শাস্ত্র অধ্যাপনা দ্বারা উদ্বারের সংস্থান করিতে পারেন নাই। তিনি যখন সুলতান মলিক শাহের রাজত্ব সময়ে (৪৬৫—৪৮৫ হিঃ) মরুভূমিতে আগমন করেন, তখন তিনি দার্শনিকরূপে যশের উচ্চশিখরে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জ্যোতির্বিদরূপেই তিনি অর্থোপাঙ্কন করেন। একথা তিনি দুঃখের সহিত তাহার “অল-জরব ওয়াল মোকাবলা” নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের উৎসর্গপত্রে বিবৃত করিয়াছেন।

ইতিহাস-প্রসিক, ভারত-পর্যটক, জ্যোতির্বিদ আবু রাইহান অল-বেরুনী জ্যোতিঃশাস্ত্রের সংজ্ঞা এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন :—

যে শাস্ত্র পাঠ করিলে জ্যোতিষস্থিতি জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর (Heavenly bodies) স্বরূপ, সঞ্চার, পরিভ্রমণকাল, গ্রহণ, পরস্পরের অন্তর

জ্যোতির্বিজ্ঞানের

সংজ্ঞা

ও তৎসম্বন্ধীয় ঘটনাবলী এবং তাহাদিগের গতি, স্থিতি ও সঞ্চারানুসারে মানব জীবনের শুভাশুভ বিষয় নিরূপণ করিতে পারা যায়, তাহাকে

জ্যোতির্বিজ্ঞান কহে।

অল-বেরুনী জ্যোতির্বিদের সংজ্ঞা এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন—
যিনি (১) গণিত বিজ্ঞান (Mathematics), (২) সৃষ্টি-বিজ্ঞান

(Cosmography) এবং (৩) কলিত জ্যোতিষ (Judicial astrology)—এই তিন বিজ্ঞায় (Science) সবিশেষ পারদর্শিতা লাভ না করিবে, তিনি “জ্যোতির্বিদ” নামে অভিহিত হইবার যোগ্য নহেন ।

মনীষার মূর্ত্ত অবতার ইমাম ওমর খৈয়াম, শুলতান মলিক শাহের
 মুনাজ্জিম-ই-শাহী দরবারে বিদ্বান-পারিষদ শ্রেণীভুক্ত হইবার পর,
 নিজ প্রতিভাগুণে “মুনাজ্জিম-ই-শাহীর” রাজ-
 জ্যোতিষী) উচ্চপদে উন্নীত হন । (১) শুলতান মলিক শাহের আদেশে তিনি
 ইরান দেশের প্রচলিত পঞ্জিকার সংস্কার দ্বারা জ্যোতির্বিজ্ঞানে চরম জ্ঞান
 ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়া গণিত-বিজ্ঞানের মত জ্যোতির্বিজ্ঞানেরও
 অভূতপূর্ব সংস্কার ও ঐ সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেন ।

শুলতান মলিক শাহ বহুকাল হইতে পারশ্বের প্রচলিত পঞ্জিকার
 সবিশেষ সংস্কার আকাঙ্ক্ষা মনে মনে পোষণ
 শুলতানের পঞ্জিকা করিতেছিলেন, কিন্তু উপযুক্ত ব্যক্তির অভাব ও
 সংস্কারের ইচ্ছা পঞ্জিকা-সংস্কার-কার্য মুসলিম ধর্মশাস্ত্রানুমোদিত
 হইবে কি না চিন্তা করিয়া এই কার্যে প্রথমতঃ অগ্রসর হইতে পারেন
 নাই । তিনি যে কারণে ইরানের প্রচলিত পঞ্জিকার আমূল সংস্কার-
 প্রয়াসী হইয়াছিলেন, তাহা নিম্নে বিবৃত হইল ।
 সংস্কারের কারণ

পারশ্ব দেশ যখন মুসলমান নরপতিগণের অধিকারে
 আইসে, সেই সময় তাঁহারা বিজিত জাতীর আচার-ব্যবহারের
 উপর হস্তক্ষেপ করিতেন না ; হিজরাদ প্রচলিত থাকি সত্ত্বেও তাঁহারা
 পারশ্বের পুরাতন অর্দ্ধই বজায় রাখিয়াছিলেন । ৪৬৫ হিজরাদে
 (১০৭৩ খৃঃ) পারশ্ব রাজতন্ত্র শ্বেলজুক শুলতান জলাল উদ্দিনের

অধীনস্থ হয়। সু লতান ওলপ্ অরসলনের মৃত্যুর পর মলিক শাহ রাজ্যভার গ্রহণ (৫৬০ হিঃ) করিয়া সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। তাঁহার রাজ্য-রক্ষা গ্রহণ করিবার পরও দেশপ্রচলিত পঞ্জিকাভুসারেই রাজ্যাশাসন এবং রাজস্ব গ্রহণ কার্য চলিতেছিল ; কিন্তু ইহা পারশুর প্রাচীন পঞ্জিকাভুসারী ছিল না বলিয়া তাঁহার মনঃপূত হয় নাই। কারণ তৎকালে সৌরমাস (১) হিসাবে রাজস্ব গ্রহণ এবং চান্দ্রমাস (২) হিসাবে ব্যয় নির্বাহ করা হইত। ইহাতে হিসাব রক্ষা কার্যের নানারূপ অন্তর্বিধা হইত। এইভাবে রাজস্ব গ্রহণ ও ব্যয়ের হিসাবে দেখা যায় যে, এক বৎসরে (৪৬৭ হিঃ ১০৭৫ খৃঃ) রাজকোষ-বপর্দকশূন্য হইয়াছে! এই কারণে সুলতান প্রচলিত পঞ্জিকার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া রাজস্ব গ্রহণ, রাজ্যাশাসনকার্য এবং ব্যয় নির্বাহের সুবিধার জন্য চান্দ্রমাসের পরিবর্তে সৌরমাস গণনা করাইয়া ইহার আমূল সংস্কারের জন্য দৃঢ় প্রয়াসী হন।

এই কারণ তিনি প্রথমেই ধর্মতত্ত্ববিদ বিচক্ষণ উলেমাগণের সহিত এই বিষয়ে পরামর্শ করিয়া কবিসা (পরিবর্ধ Leap year) প্রবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

সুলতান প্রথমে উলেমাগণের নিকট জানিতে চাহেন যে, উক্ত সংস্কার মুসলিম ধর্মশাস্ত্র বিরোধী কিনা। ইহার উত্তরে উলেমাগণ একবাক্যে বলেন, নূতন পঞ্জিকার প্রবর্তন ইসলাম-বিরোধী কর্ম নহে। তাঁহার।

১। সূর্যের এক রাশি অতিক্রম করিতে যতদিন অতিবাহিত হয়, ততদিন এক মাস হয় এবং ঐ মাসকে সৌরমাস কহে।

২। এক তিথিতে এক চান্দ্র দিবস ; ৩০ তিথিতে অর্থাৎ এক প্রতিপদ হইতে অমাবস্তা পর্যন্ত অথবা অন্ত বেকোন এক তিথি হইতে তাহার পূর্ববর্তী তিথি পর্যন্ত ৩০ তিথিতে এক চান্দ্রমাস হয়।

মুলতানকে আরও জানান যে রাষ্ট্রীয় এবং রাজ্যশাসন কার্যের পরিচালনার সুবিধার জন্ত চান্দ্রমাসের পরিবর্তে সৌরমাস প্রচলন মুসলিম বিধি-ব্যবহার বিরোধী হইবে না। কোরান কেবলমাত্র হুসি (১) ব্যবহার করিতেই নিষেধ করিয়াছেন। এই কারণেই কোরান বলিতেছেন, মাস পিছাইয়া দেওয়া ঈশ্বরনিন্দাসূচক অপকর্মের তুল্য দুষণীয়। এরূপ কর্ম দ্বারা ধার্মিকগণকে প্রকৃত ধর্মপথ হইতে বিচ্যুত করা হইবে; তাহার কারণে বৎসরের এক মাসকে কখনও শাস্ত্রীয় এবং পরবৎসরে উহাকেই অশাস্ত্রীয় মাস হিসাবে গণ্য করিবে। তাহাদিগের এই দেবনিন্দাসূচক অপকর্ম আল্লাহ ক্ষমা করিবেন না—তাহাদিগকে মুক্তিও দান করিবেন না। (২)

ঘোড়ের উপর আগতিক ক্রিয়াকর্মের জন্ত চান্দ্রমাসের পরিবর্তে সৌরমাস প্রচলন দুষণীয় নহে। এই কারণেই বিচক্ষণ উলমগণ মুলতান মলিক শাহকে চান্দ্রমাসের পরিবর্তে সৌরমাস প্রচলনে আদেশ দিয়া তাঁহার শুভ সঙ্কল্প—সংস্কার কার্য একবাক্যে অনুমোদন করেন।

মুলতান, মন্ত্রী নিজাম-উল-মুল্কের সহিত পরামর্শ করিয়া মুনাজ্জিম-ই-
 শাহী সুপণ্ডিত ওমর খৈয়ামকে পঞ্জিক-সংস্কার
 কার্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ব্যক্তি স্থির করিয়া তাহাকেই
 এই কার্যের গুরুত্ব আর্পণ করেন। মুলতানের
 আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়া জ্যোতির্বিদগণাগ্রগণ্য
 ওমর খৈয়াম সানন্দে পঞ্জিক-সংস্কার কার্যের গুরুদায়িত্বভার গ্রহণ।

১। আরবজাতির মধ্যে শাস্ত্রীয় মাস বলিয়া পরিচিত। এই মাসে তাহার বৃহৎ
 হুত্যা, লুণ্ঠন ও অভিযানে বহির্গত হন না।

২। হুরাৎ-উৎ-তোবা।

করেন। ওমরের পঞ্জিকা-সংস্কার কার্যের সুবিধার জ্ঞাত মুলতান মলিক শাহ ৪০৬ হিজরায় (১০৭৩ খৃঃ) মানমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

৪৭১ হিজরায় (১০৭৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই মার্চ) ওমর পঞ্জিকা-সংস্কার কার্য আরম্ভ করেন। সাতজন মন্ত্রণা-পরিষদ সুবিখ্যাত জ্যোতির্বিদ লইয়া মন্ত্রণা-পরিষদ গঠিত হয়। এই সাতজন জ্যোতির্বিদ ইমাম ওমর কর্তৃক নির্বাচিত হন। ওমর পরিষদের সভাপতিরূপে কার্য করেন। যে সাতজন লক্ষ্যপ্রতিষ্ঠ জ্যোতির্বিদ লইয়া মন্ত্রণা-পরিষদ গঠিত হয়, তাঁহাদিগের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল :—

১। খোয়াজা আবু হাতিম উল-মুজাফর ইসকারাজি। ইনি ওমরের সমসাময়িক, বন্ধু ও গণিত-জ্যোতিষ-খগোলশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। এই তিন বিষয়ে তিনি অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। এই গ্রন্থগুলি তাঁহার পাণ্ডিত্য-প্রতিভার পরিচায়ক। তিনি বহু পরিশ্রম ও মস্তিষ্ক চালনা করিয়া বৈজ্ঞানিক-স্মৃতিতে একটি তুল্যদণ্ড প্রস্তুত করেন। এই তুল্যদণ্ড সম্বন্ধে একখণ্ড নাতিবৃহৎ গ্রন্থ (Treatise) প্রস্তুত করেন। এই গ্রন্থে তিনি তুল্যদণ্ড সম্বন্ধে লিখিয়াছেন যে, এই তুল্যদণ্ড দ্বারা সূক্ষ্ম ভৌল এবং বিস্তৃত অথবা খাদ-মিশ্রিত স্বর্ণ অথবা রৌপ্য বৃত্তিতে পারা যাইবে। রাজকীয় ধনাগারের কঞ্চুকীর নিকট পরীক্ষার জ্ঞাত তিনি এই তুল্যদণ্ডটি প্রেরণ করেন। কঞ্চুকীর নিজ চৌধ্যবিজ্ঞা প্রকাশ হইবার ভয়ে এই মূল্যবান সূক্ষ্ম তুল্যদণ্ডটির এক অংশ ভগ্ন করিয়া কার্যের বহির্ভূত করিয়া দেয়। বহুদিবসের পরিশ্রম এবং মস্তিষ্ক চালনাপ্রস্তুত মূল্যবান তুল্যদণ্ডটি কঞ্চুকী কর্তৃক বিনষ্ট হইয়াছে, সংবাদ পাইয়া তিনি শোকে কাতর হইয়া যু তুমুখে পতিত হন।

২। আবুল কতেহ আবদুর রহমান খাজানি। ইনি মারভ প্রদেশে এক ধনীর ক্রীতদাস, গণিত-বিজ্ঞানে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। সুলতান সঞ্জর খেলজুকীর রাজত্বকালে পঞ্জিকা সংস্কার করেন। এই পঞ্জিকা “সঞ্জরী পঞ্জিকা” নামে ইতিহাসে অভিহিত।

৩। মহম্মদ কাজীন। ইঁহার পরিচয় কিছুই জানা যায় না। গণিত এবং জ্যোতির্বিজ্ঞানে তিনি নিশ্চিতই সুপণ্ডিত ছিলেন, তাহা না হইলে তিনি কখনই ওমর কর্তৃক নির্বাচিত হইতেন না।

৪। হমিক আবুল আক্বাস লোকরী। ইনি মারভের প্রধান শহর পানজুদে প্রদেশের অন্তর্গত লোকর নগরের অধিবাসী আমীর। ইতিহাসে ব্রুহকিম (বিদ্বান) লোকরী নামেই পরিচিত। খোরাসানের সুপ্রসিদ্ধ বিদ্বান ও গণিতজ্ঞ বামান ইয়াবের ছাত্র। খোরাসানে গণিত-বিজ্ঞান অগ্রগণ্যতার প্রচুর হকিম লোকরীর দ্বারাই হয়। তিনি গণিত-বিজ্ঞানে একরূপ সুপণ্ডিত ছিলেন যে, তাঁহার সমসাময়িক সুপণ্ডিত ইবনু কোশাক এবং ওস্তি পর্যন্ত পাণ্ডিত্যে ইঁহার সমকক্ষ ছিলেন না।

৫। মায়মুন ইবনু নজিব ওস্তি। ইনি প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ও গণিতজ্ঞ। উজীর নিজাম-উল-মুল্ক তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। তাঁহার গণিত-বিজ্ঞান গ্রন্থাবলী তৎকালে সাতিশয় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

৬। মহম্মদ বিন আহমদ মায়ুরি বাহকি। ইনি গণিত-বিজ্ঞানে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। পরিমিতি বিষয়ক গ্রন্থ তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক এবং মূল্যবান বলিয়া তৎকালে সাতিশয় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল। সুলতান মলিক শাহ তাঁহাকে ইস্পাহানের মান-মন্দিরে গণিত এবং জ্যোতিষ অগ্রগণ্যতার নিমিত্ত আস্থান করেন। ওমর খৈয়াম তাঁহাকে শ্রেষ্ঠ গণিতজ্ঞ হিসাবে সাতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন।

৭। আবুল কতেহ ইবন্ কুশাক। মুলতান সঞ্জরের রাজত্ব-কালীন সুপ্রসিদ্ধ গণিতবিদ। তৎকালে গণিতজ্ঞ হিসাবে তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। গণিত-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। মুলতান সঞ্জয় তাঁহার গ্রন্থাবলী শ্রদ্ধার সহিত রাজ-পাঠাগারে স্থান দান করিয়াছিলেন।

সুদীর্ঘ তিন বৎসরকাল অনন্তসাধারণ অধ্যবসায়, প্রাণপাত পরিশ্রম ও মস্তিষ্ক চালনা করিয়া ওমর খৈয়াম সৌরমাস ওমরের পঞ্জিকা সংস্কার হিসাবে গণনা করিয়া ইরানের প্রচলিত পঞ্জিকার উৎসর্গা করণ আমূল সংস্কার করেন। এই সংস্কৃত পঞ্জিকা মুলতান জলালউদ্দিন মলিক শাহের নামে উৎসর্গ করেন। ইহাই ‘তারিখ-ই জলালী’ নামে ইতিহাসে বিদ্যোষিত।

জলালি অব ৪৭১ হিজরাদ ১০ই রমজান সাব-ই-জুম্মার দিন (শুকবার ১৫ই মার্চ, ১০৭০ খৃঃ) হইতে আরম্ভ হয়। জলালি অব প্রচলনের পূর্বে সূর্য মীনলয়ের অর্দ্ধ মধ্যাবস্থায় অবস্থান করিত বলিয়া ওমর খৈয়াম কারওয়ানদিন (১) মাসের প্রথম হইতে যে সময় দিবা এবং রাত্র সম অবস্থায় (Equinox) বিরাজ করিত, ঠিক সেই সময় হইতে বৎসর গণনা আরম্ভ করেন। যদিও এই সময় বৎসরের ২৮ দিন অতীত হইয়াছিল, তব্বাচ তিনি কারওয়ানদিন মাস হইতেই ওমরের বৈজ্ঞানিক বৎসর গণনা আরম্ভ করেন। খৈয়াম-পঞ্জিকার প্রতিষ্ঠার পুরস্কার নববৎসরের নাম “নওরোজ-ই-মুলতানী” নামে অভিহিত হয়। পঞ্জিকা সংস্কাররূপ দুরূহ এবং দায়িত্বপূর্ণ কার্য সমাধা করিয়া ওমর প্রচুর পুরস্কার, রাজসন্মান ও জায়গীর লাভ করেন। (২)

১। চৈত্রের প্রথম হইতে বৈশাখের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত কারওয়ান দিন মাস।

২। Geographie d' Abulfeda, Reinaud.

১৫৮২ খৃষ্টাব্দে রোমীয় ধর্মসম্রাট ত্রয়োদশ গ্রেগরীর রাজত্ব সময়ে খৃষ্ট-পঞ্জিকার সংস্কার হয়। খৃষ্ট-পঞ্জিকার সহিত ওমরের পঞ্জিকার তুলনা করিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী একবাক্যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, গ্রেগরীর পঞ্জিকা অপেক্ষা জলালী পঞ্জিকা সুসংস্কৃত (Perfect) এবং সর্বোৎকৃষ্ট। (১) ওমর যে প্রণালী অবলম্বন করিয়া পঞ্জিকা সংস্কার করেন, তাহা সর্বাবস্থায় রাজ্যাশাসন কার্যের সুবিধাজনক হইয়াছে। (২) অপিচ ওমরের সংস্কার গ্রেগরীর সংস্কার হইতে সুন্দর ও জলালী পঞ্জিকা ও সমীচীন। (৩) সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড গিবন (Edward Gibbon) জুলিয়স সীজর পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য পঞ্জিকা প্রবর্তিত পঞ্জিকার সহিত ওমরের পঞ্জিকা তুলনা করিয়া বলিয়াছেন, জলালি পঞ্জিকা গণনার সুস্বত্বা ভ্রমশূন্য হিসাবে জুলিয়স সীজর প্রবর্তিত পঞ্জিকাকেও উৎকর্ষে অতিক্রম (Surpass) করিয়াছে। (৪) দুর্ভাগ্যের বিষয় জলালি অর্ধ অধিক দিন স্থায়ী হয় নাই। মোট চৌদ্দ বৎসর কাল—ষতদিন তুলতান মলিক শাহ জীবিত ছিলেন—ততদিন পর্যন্ত স্থায়িত্ব লাভ করিয়াছিল। তুলতানের সমাধিলাভের সহিত তাঁহার সাধের “জলালি অর্ধ”ও সমাধি লাভ করে। তুলতানের উত্তরাধিকারিগণ এই অর্ধ রহিত করিয়া দিলেও ওমরের নবনবোন্মেষালিনী প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ দান—“জলালি পঞ্জিকা”—ষতদিন পৃথিবীতে জ্ঞানচর্চার আদর থাকিবে, ততদিন অসামান্য

১। Muslim Theology. Macdonald.

২। Introduction. The quatrains of Omar Khayyam translated by Whinfield.

৩। ‘Geographical’ Abul Feda. Renaud.

৪। Decline and fall of the Roman Empire by E. Gibbon.

প্রতিভার অধিকারী, বৈজ্ঞানিক-শ্রেষ্ঠ ওমর খৈয়ামের নাম—কীর্ত্তি স্মৃতি চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। ওমর যদি অল্প কোন গ্রন্থ রচনা না করিয়া একমাত্র পঞ্জিকা-সংস্কার করিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও তাঁহার কীর্ত্তি-স্মৃতি পৃথিবীতে অক্ষয় হইয়া থাকিত।

মুলতান মলিক শাহের দরবারে মুনাজ্জিম-ই-শাহী (রাজ-জ্যোতিষী) রূপে ওমর যে কেবল পঞ্জিকা সংস্কার করিয়াছিলেন, তাহা নহে। পঞ্জিকা সংস্কার ব্যতীত গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদগণের গণনা কার্যের সুবিধার জন্য জীচ (জ্যোতিষিক তালিকা) প্রণয়ন করেন। হাজী খলিকা বলিয়াছেন, জলালি পঞ্জিকার মত ইহাকেও তিনি রাজভক্তির নিদর্শনস্বরূপ মুলতান মলিক শাহের নামে উৎসর্গ করেন। এই তালিকাই ইতিহাসে “জীচ-ই-মলিকশাহী” নামে পরিচিত।

গণিতবিদ ও নজুমী (কলিত জ্যোতিষী) রূপে ইমাম ওমর খৈয়ামের যশঃ সমগ্র ইরানের বাহিরেও বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল। ওমর খৈয়ামকে অনেক সময় অগাধ জ্যোতির্বিদগণের গণনা, ভবিষ্যদ্বাণীর বিচার ও গণনার সত্যাসত্য সংক্ষেপে অভিমত প্রদান বরিতে হইত। তৎকালীন যুগে জ্যোতির্বিদগণ মুলতানের উচ্চ রাজকর্মচারী, আমীর ওমরাহগণের আদেশে যুদ্ধে জয়-পরাজয়, অভিযানের শুভ মুহূর্ত্ত নির্দেশ, গণনা ও বিচার করিতেন। যদি তাঁহাদের বিচার হল ভবিষ্যদ্বাণীর সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে না পারিত, তাহা হইলে মুলতানের আদেশে তাহাদিগকে দণ্ডওহণ করিতে হইত। অথবা যদি কোন জ্যোতিষী গণনার কল অশুভ দেখিয়া উহা গোপন করিয়া শুভ বলিয়া নির্দেশ করিত, অথবা গণনার অশুভ কল মুলতানের গোচর না করিয়া পলায়ন করিত,

তাহারাও সুলতানের বিষদৃষ্টি এড়াইতে পারিত না। ওমর খৈয়াম শেখোক্ত অপরাবে অপরধী এক জ্যোতিষীকে কারাদণ্ড হইতে মুক্ত করেন। ঘটনাটি নিয়ে বিবৃত চইল;—সুলতান বিষাত-উদ্-দুনিয়া ওয়াহ-দিন মহম্মদ বিন মলিক শাহের রাজত্ব সময়ে আরব-নরপতি সদাকা বিদ্রোহের পতাকা উড়াইয়া পকাশ হাজার সৈন্যসহ হিল্লা হইতে বোগদাদ অভিমুখে যাত্রা করেন। সুলতান বিদ্রোহ-দমন-অভিযানের শুভ মুহূর্ত্ত স্থির করিবার জন্ত ইম্পাহানের এক জ্যোতিষীকে আদেশ করেন। জ্যোতিষী গণনা করিয়া দেখেন যে এক সপ্তাহের মধ্যে কোন শুভ মুহূর্ত্ত নাই। তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার বিচারকল সুলতানের গোচর করেন। সুলতান সত্বর শুভ মুহূর্ত্ত নির্দেশ করিবার জন্ত পুনরায় আদেশ করেন। জ্যোতিষী প্রাণভয়ে ইম্পাহান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যান। ইম্পাহানে এক বিদেশী জ্যোতিষী বাস করিত। এই জ্যোতিষী জ্যোতির্বিজ্ঞানে সবিশেষ পারদর্শী ছিল না। সে কোন লোকমুখে ইম্পাহানের জ্যোতিষীর পলায়ন সংবাদ শুনিয়াছিল। রাজ-অনুগৃহীত কোন ব্যক্তির সাহায্যে সে সুলতানের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া জানায়, সুলতান যদি অনুগ্রহ করিয়া আদেশ করেন, তাহা হইলে সে সুলতানের বিদ্রোহ দমন যাত্রার শুভ মুহূর্ত্ত নির্দেশ করিয়া দিবে। সুলতান তাহার কথায় সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে শুভলগ্ন স্থির করিবার আদেশ দেন। বিদেশী জ্যোতিষী সেইদিনই শুভলগ্ন বাহির করিয়া সুলতানের গোচর করিল। সুলতান আনন্দিত হইয়া জ্যোতিষীকে দুইশত খণ্ড নিশাপুরী দীনার পুরস্কার প্রদান করেন। পলাতক জ্যোতিষী পথিমধ্যে ধৃত হইয়া বন্দী হয়। সুলতান বিদেশী জ্যোতিষী কর্তৃক নির্দ্ধারিত শুভলগ্নে বিদ্রোহ-দমনে বহির্গত হইয়া আরব নরপতি সদাকাকে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন। উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া তিনি

ইম্পাহানে উপস্থিত হইয়া পুনরায় বিদেশী জ্যোতিষীকে পুরস্কৃত করেন। বন্দী জ্যোতিষীকে আনয়ন করিবার জন্ত সুলতান আদেশ দেন। শৃঙ্খলিত বন্দী সুলতান সম্মুখে নীত হইলে, সুলতান তাহাকে বলেন, তুমি শুভলগ্ন নির্দেশ করিতে পার নাই, অতএব এক জ্যোতিষী উহা নির্ধারণ করিয়া দিয়াছে। আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি, তুমি বিদ্রোহী সদাকার উৎকোচ গ্রহণ করিয়া এইরূপ করিয়াছ। শৃঙ্খলিত জ্যোতিষী তৎক্ষণাৎ নতজাহু হইয়া সাশ্রনয়নে বলে, গণনায় যে সব লগ্ন পাওয়া গিয়াছিল, সে সমস্তই অশুভ; জ্যোতিষীরা অশুভ লগ্নে কোন কাৰ্য্য করিবার পরামর্শ দিতে অত্যন্ত ভয় পায়। সেই কারণ আমি পলায়ন করিয়াছিলাম। আমার গণনার সত্যাসত্য বিচারের জন্ত নিশাপুরে খোয়াজা ইমাম ওমর খৈয়ামের নিকটে দূত প্রেরণ করুন, তাহা হইলে সত্য ঘটনা বুঝিতে পারিবেন। সুলতান তৎক্ষণাৎ নিশাপুরে ওমরের নিকট লগ্নকল বিচার করিবার জন্ত দূত প্রেরণ করেন। ওমর বিচার করিয়া সুলতানকে জানান যে ইম্পাহানের জ্যোতিষীর গণনা নিভুল এবং এক লগ্নাহের মধ্যে বিদ্রোহ-দমন অভিযানের কোন শুভলগ্ন ছিল না। সুলতান তখন বন্দী জ্যোতিষীকে শৃঙ্খলমুক্ত করিবার আদেশ দেন।(১)

এতক্ষণ আমরা ওমরের সৃষ্টি-বিজ্ঞান বিষয়িনী প্রতিভার পরিচয় দিলাম। এইবার আমরা কলিত-জ্যোতিষ শাস্ত্রে তাঁহার পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে

আলোচনা করিতেছি। অল-বেক্লী এককথায় কলিত জ্যোতিষে
ওমরের প্রতিভা ফলিত-জ্যোতিষ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, ফলিত-জ্যোতিষ প্রাকৃত বিজ্ঞানের শাখা মাত্র এবং

ভবিষ্য কথন (prognostication) সম্পর্কেও ব্যবহৃত হয়; জ্যোতিষ-গণনায় ওমরের ভবিষ্যদ্বাণী কিরূপ সকলতা লাভ করিয়াছিল, তাহা

তাঁহার প্রিয় ছাত্র সুপণ্ডিত নিজামী আরসী প্রদত্ত বিবরণ হইতে বুঝিতে পারা যায়।

নিজামী আরসী লিখিয়াছেন,—৫০৬ হিজরাদে (১১১২-১৩ খৃঃ) খোয়াজা ইমাম ওমর খৈয়াম এবং খোয়াজা ইমাম মুজাফর-ই-ইসফারাজী বলখ নগরে আমীর আবু সা'দের গৃহে উৎসব-আমন্ত্রণে গমন করেন। আমিও নিমন্ত্রিত হইয়া এই উৎসব-সভায় উপস্থিত ছিলাম। আমরা একত্র ভোজনে বসিয়াছি। সরস কথাবার্তার সহিত আমাদের ভোজন চলিতেছে। আমাদের কথাবার্তার মাঝখানে “হুজ্জত-উল-হক” (সত্যে প্রমাণ-স্বরূপ) ওমর খৈয়াম বলিলেন, “আমার সমাধি এমন স্থানে হইবে, যেখানকার পুষ্পবৃক্ষ আমার সমাধির উপর বৎসরে দুইবার পুষ্প বর্ষণ করিবে।” তাঁহার এই অদ্ভুত ভবিষ্যদ্বাণী তখন আমি মোটেই বিশ্বাস করিতে পারি নাই। উপরন্তু অসম্ভব বলিয়াই আমার মনে হইয়াছিল। খোয়াজা ইমাম ওমর খৈয়াম মিথ্যাকথা বলিবার লোক ছিলেন না, ইহাও জানিতাম। তত্রাচ তখন নিজামী আরসীর লিখিত বিবরণ আমি তাঁহার কথা বিশ্বাস করিতে পারি নাই।

পঁচিশ বৎসর পরে আমার এ ভ্রম ঘুচিয়াছিল। ৫৩০ হিজরাদে (১১৩৫-৩৬ খৃঃ) আমি যখন নিশাপুরে উপস্থিত হই, তিনি তখন ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। সেই সময়ে তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীর কথা স্মরণ হয়। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণী কিরূপ সফল হইয়াছে, দেখিবার জ্ঞাত একজন পথিপ্ৰদর্শক সঙ্গে লইয়া সাব-ই-জুম্মার দিন(১) সন্ধ্যার সময় তাঁহার সমাধি-মন্দির দর্শন করিতে যাই। পথিপ্ৰদর্শক আমাকে “হীরা” সমাধি-উচ্চানে উপস্থিত করে। এই

সমাধি-উত্থানের বাম কোণের দেওয়ালের নিকট তাঁহার সমাধি অবস্থিত। সমাধির চারিধার লাল পীচ এবং গ্রাসপাতি ফুলে এরূপ আচ্ছাদিত যে, উহার চিহ্নমাত্র খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বলখ নগরে উচ্চারিত তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীর প্রত্যেক বাক্যটি আমার স্মরণপথে উদ্ভিত হয়। তাঁহাকে স্মরণ করিয়া আমি তাঁহার সমাধির পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া কেবল ক্রন্দন করিরাছি। ভগবান্ তাঁহার পরলোকগত আত্মার কল্যাণ করুন এবং তাঁহাকে শান্তিতে রাখুন। তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীর প্রত্যেক বাক্যটি সফল হইয়াছে দেখিয়া আমি তাঁহার উদ্দেশ্যে বার বার প্রণাম করি।(১)

নিজামী অরসী ওমর খৈয়ামের আর একটি ভবিষ্যদ্বাণীর উল্লেখ করিয়াছেন। ৫০৮ হিজরাদে (১১১৪-১৫ খৃঃ) বোখারার সুলতান খাকান-শামস্-উল-মুস্ক মারভ নগরে তাঁহার মন্ত্রী সন্নরউদ্দিন মহম্মদ বিন-অল-মুজাফরকে আদেশ করেন,--জ্যোতিবিদ ওমর যেন তাঁহার শিকার যাত্রার শুভদিন স্থির করিয়া দেন। এই দিনটির আকাশ যেন পরিষ্কার ও মেঘশূন্য হয়। ইমাম ওমর খৈয়াম এই সময় মন্ত্রীর গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন। দুই দিন বিশেষ সাবধানতার সহিত গণনা করিয়া তিনি সুলতানের আদেশমত শিকার যাত্রার শুভদিন স্থির করেন। ওমর খৈয়ামও সুলতানের শিকার যাত্রার সঙ্গী হন। সুলতান ঘোটকে আরোহণ করিয়া কিয়দূর গমন করিলে, আকাশ আশ্চর্যরূপে মেঘাচ্ছন্ন হয়। রাজপারিষদবর্গ ওমরের উদ্দেশ্যে বিদ্রোপোক্তি করিতে থাকেন। সুলতান বিমর্ষচিত্তে গৃহে প্রত্যাগকনের আদেশ দেন। খোয়াজা ইমাম ওমর সুলতানকে প্রবোধ দিয়া বলেন, সুলতান! আপনার চিহ্নিত

হইবার কোনই কারণ নাই, এক ঘণ্টার মধ্যে শীঘ্রই আকাশ মেঘশূন্য হইবে; এমন কি পাঁচদিন পর্যন্ত আকাশের অবস্থা এইরূপ থাকিবে। সুতরাং গৃহে কিরিবার প্রয়োজন নাই। সুলতান ওমরকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন, তাঁহার কথার উপর নির্ভর করিয়া পুনর্থাত্রা করেন। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এই পাঁচদিনের একদিনও বৃষ্টিপাত হয় নাই।(১)

অল-বেরুণী জ্যোতির্বিদের যেমন সংজ্ঞা নির্ধারণ করিয়াছেন, তেমনি জ্যোতিষীর কি কি থাকা আবশ্যক, তৎসম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,—কুশাগ্রবৃদ্ধিসম্পন্ন, স্থিরচিত্ত, দৃঢ়-চরিত্র ও তীক্ষ্ণ স্বাভাবিক জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া জ্যোতিষীর সর্বতোভাবে আবশ্যক। ইহার একটির অভাব ঘটিলে এই ব্যবসাতে তিনি উন্নতিলাভ করিতে পারিবেন না।

ওমর খৈয়াম সূক্ষ্ম গণনা বা বিচার দ্বারা যে সমস্ত ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার স্থিরচিত্ততা, তীক্ষ্ণ স্বাভাবিক জ্ঞান ও কুশাগ্রবৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। এই সকল গুণগ্রামের অধিকারী না হইলে তিনি কখনই পঞ্জিকা সংস্কাররূপ দুর্কর কার্য সমাধা করিয়া সুপণ্ডিত অল-বেরুণীর বাক্যের যথার্থ্য সম্পাদন করিতে পারিতেন না। পক্ষান্তরে এই সকল গুণগ্রামের অধিকারী ছিলেন বলিয়াই জ্যোতির্বিজ্ঞানে অতুলনীর প্রতিভার পরিচয় প্রদান এবং মুসলিম জ্যোতির্বিজ্ঞান-সাহিত্যকে অভাবনীয়রূপে সমৃদ্ধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

সারগী বা জ্যোতিষিক-তালিকা রচনা শ্যতীত ইমাম ওমর খৈয়াম জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে অনেকগুলি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন; তাঁহার

অত্যাশ্চর্য গ্রন্থের মত এইগুলিও লোকলোচনের বহির্ভূত হইয়াছে। কেবলমাত্র “মনিরত্ন বিজ্ঞান” নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি লীডেন পাঠাগার রক্ষিত আছে।(১)

জ্যোতির্বিজ্ঞানে ইমাম ওমর খৈয়াম কিরূপ চরমোৎকর্ষ লাভ করিয়া অপ্রতিদ্বন্দী ছিলেন, পঞ্জিকা-সংস্কার, জ্যোতিষিক-তালিকা প্রণয়ন এবং তাঁহার ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতা হইতে বুঝিতে পারা যায়; বৈজ্ঞানিক-জগতে তাঁহার স্থান কোথায় এবং বিজ্ঞান সাহিত্য তাঁহার দ্বারা কিরূপ সমৃদ্ধ হইয়াছিল, চরিতাভিধানকারগণের উক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়।

ঐতিহাসিক ও ভূগোলবিদ্যাবিশারদ হামদুল্লা মুত্তওকি বলিয়াছেন, খোয়াজা ইমাম ওমর খৈয়াম বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই বিশেষতঃ

জ্যোতির্বিজ্ঞানে তৎকালীন জ্যোতির্বিদগণের মধ্যে
ঐতিহাসিকগণের সর্বশ্রেষ্ঠ ও বিশেষজ্ঞ ছিলেন।(২) চরিতাভিধানকার
লিখিত বিবরণ জমলউদ্দিন অল-কফ্‌তি লিখিয়াছেন, হকিম

(বিদ্বান) ওমর খৈয়াম তৎকালীন যুগে একজন সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী, দর্শন ও বিজ্ঞানশাস্ত্রে (বিশেষতঃ জ্যোতির্বিজ্ঞানে) অপ্রতিদ্বন্দী ছিলেন।(৩) চতুর্দশ শতাব্দীতে লিখিত আর একখানি চরিতাভিধানে ওমরের জ্যোতির্বিজ্ঞান-প্রতিভা ও জ্ঞান সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বিবরণ আছে :—ওমর-বিন ইব্রাহিম-অল খৈয়ামী তাঁহার যুগে একজন অসাধারণ জ্ঞানী এবং জ্যোতিষশাস্ত্রের জ্ঞানের জগৎ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়া-

১। Catalogue of Oriental manuscripts in the Leyden University Library, 1851.

২। তারিখ-ই-জিজিয়া।

৩। তারিখ-উল-হুকা।

ছিলেন। (১) ওমর খৈয়াম জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রত্যেক বিভাগে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন বলিয়াই জনসাধারণে আবু-সিনার সহিত তাঁহার তুলনা করিয়া তাঁহাকে “আবু-সিনার অবতার” আখ্যা অভিহিত করিয়া সম্মান দেখাইয়াছিল।

ওমর খৈয়ামের বিজ্ঞান-সাধনার ইতিহাস পর্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, তিনি যে কেবল গণিত ও জ্যোতির্বিজ্ঞানের গবেষণা করিয়া, তাঁহার সর্বতোমুখী প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, চিকিৎসা-রসায়ন-প্রাকৃত-বিজ্ঞানে ওমরের প্রতিভা তাহা নহে। বিজ্ঞান শাস্ত্রের সকল বিভাগেই তাঁহার অসামান্য কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। চিকিৎসা-প্রাকৃত-রসায়ন-বিজ্ঞানেও তিনি অতুলনীয় প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন।

মুসলিম রসায়ন বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগ হইতে মুসলিম রসায়ন বিজ্ঞানের উন্নতির আরম্ভ যুগ। প্রাচীন মুসলিম রাসায়নিকগণ রসায়নশাস্ত্রে মধ্যযুগের ইয়োরোপের অজ্ঞানান্ধকার দূরীভূত করিয়া জ্ঞান-শুভর স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

একাদশ শতাব্দীর রসায়ন-বিজ্ঞান-সাহিত্য ওমর খৈয়াম কর্তৃক সমৃদ্ধ হয়। জ্ঞান-বিজ্ঞানের অগ্রাগ্রত বিভাগের মত তিনি রসায়ন-বিজ্ঞান-বিভাগেও কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়া, বিশিষ্ট রাসায়নিকরূপে সুবিখ্যাত হন। রসায়ন সূত্র সম্বন্ধে প্রভূত গবেষণা করিয়া একখণ্ড গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থে খাতব পদার্থসমূহের রাসায়নিক বিশ্লেষণ এবং কি অনুপাতে জল ও রৌপ্য সংমিশ্রণ করিলে মিশ্র পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে,

তাহারই কথা আলোচিত হইয়াছে। এই মূল্যবান গ্রন্থখানির নাম “মিজান-উল-হিকাম্”। এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি গথা (Gotha) পাঠাগারে রক্ষিত আছে।

প্রাকৃত বিজ্ঞান সপক্ষেও ওমর বৈয়াম একখণ্ড গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থখানির নাম “লওয়াজিম-উল-আমকিনা।” এই গ্রন্থে তিনি চারি ঋতু ও বিভিন্ন কোণের বায়ু সপক্ষে আলোচনা করিয়াছেন। ইহার পাণ্ডুলিপি বার্লিন পাঠাগারে রক্ষিত হইয়া ওমরের বৈজ্ঞানিক গবেষণার কীৰ্ত্তি জগতে ঘোষণা করিতেছে।

রসায়ন ও প্রাকৃত বিজ্ঞান ব্যতীত চিকিৎসা-বিজ্ঞানেও ওমরের অসংখ্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। চিকিৎসা-বিজ্ঞান-জগতেও তিনি শ্রেষ্ঠ চিকিৎসকরূপে প্রদ্বারিত ছিলেন।

মুসলিম চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ইতিহাস আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ইহা প্রথমে অল্পরত অবস্থায় ছিল, পরে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের সংস্পর্শে আসিয়া উন্নত হয়। এই কারণ মুসলিম চিকিৎসা-বিজ্ঞান একদল নিগৃহীত খৃষ্টান সম্প্রদায়ের নিকট কিয়ৎপরিমাণে ঋণী। কনস্টান্টিনোপলের (Constantinople) ধর্মযাজকের পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মেরিকে ঈশ্বরের জননী না বলিয়া খৃষ্টমাতা নামে প্রচার করেন। ইহার ফলে তিনি সশিষ্ট মরুভূমিতে নির্বাসিত হন। তাহার শিষ্ঠ-সম্প্রদায় চিকিৎসা-বিজ্ঞান অহুশীলন আরম্ভ করেন এবং মেসোপটেমিয়ার এদেশ (Edessa) শহরে এক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত হন। ইহার সহিত তাহারা দুইটা

হাসপাতাল বা কল্যাবাস প্রতিষ্ঠা করিয়া চিকিৎসা-বিজ্ঞান শিক্ষার পথ উন্মুক্ত করেন। ধর্মযাজক সাইরস এই সম্প্রদায়কে এই স্থান হইতেও বিতাড়িত করেন। তাহারা বিতাড়িত হইয়া পারস্য দেশে

পলায়ন করিয়া পারশ্বের গনদেশপুরে (Gondespur) একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রকৃতপক্ষে এই বিদ্যালয় হইতে মুসলিম চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পূর্ণ আলোচনার সূত্রপাত হয়।(১)

নিদান-তত্ত্ব সম্বন্ধে ওমর খৈয়াম একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তৎকালীন চিকিৎসা-বিজ্ঞান-জগতে, তাঁহার অগ্রান্ত গ্রন্থের গ্রন্থ, এই গ্রন্থখানিরও স্বথেষ্ট আদর হইয়াছিল। চিকিৎসা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে ওমর খৈয়ামের চরম জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায় সুলতান সঞ্জরের চিকিৎসা-আহ্বানে; ঐতিহাসিক মহম্মদ শাহ জুরি বলিয়াছেন, সুলতান সঞ্জর বাল্যকালে বসন্তরোগে আক্রান্ত হইলে, শাহজাদার চিকিৎসার জ্ঞান সুলতান অন্তঃপুরে তাঁহার আহ্বান হয়। ওমরের চিকিৎসা-নৈপুণ্যে শাহজাদা সত্ত্বর রোগমুক্ত হইলেন।(২)

১। History of Medicine, Garrison 1923

২। মুজাহ্-উল-আরওয়া।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

জ্ঞানতপস্বী ওমর খৈয়াম

ভারতবর্ষের মত প্রাচীন মুসলমান সম্প্রদায় জ্ঞান-সাধনাকে উচ্চ শ্রেণীর সাধনা হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারাও জ্ঞানকে কেবল করিয়া মুক্তি-সময়ে অবতীর্ণ হইয়া জয়যুক্ত হইেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের জ্ঞান সাধনা ভারতের উপনিষদাদি ঋষিশাস্ত্র যেমন বজ্রনির্ঘোবে বলিয়াছে, জ্ঞানই ব্রহ্ম, যিনি জ্ঞানের সাধনায় জয়যুক্ত হইবেন, তিনিই ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিবেন, তেমনই আরবের কোরানও বলিয়াছে, যে জ্ঞানে ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারা যায়, হে আল্লা, আমাকে সেই জ্ঞান দান করন। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, মহম্মদের জন্মের পূর্বে আরব জাতি জ্ঞানহীন ছিল, পরে তাঁহার উদ্দীপনাপূর্ণ বাণী মস্তে দীক্ষিত হইয়া সজীব হয়। হজরত মহম্মদও বলিয়াছেন, বিশ্বাসীর (মুসলমানের) জ্ঞানসঞ্চয়ে জন্মগত অধিকার, যেখানে জ্ঞানের সন্ধান পাইবে, সেই স্থান হইতেই সে জ্ঞান-সঞ্চয় করিবে। মুসলমানগণ হজরতের বাণী শিরোধার্য্য করিয়া জ্ঞান-সঞ্চয়ে অগ্রসর হন। তাঁহার বিদ্যা বা জ্ঞান-সাধনাকেই উচ্চাঙ্গের সাধনার মধ্যে গণ্য করেন এবং জগতের বিভিন্ন উন্নতিশীল জাতির জ্ঞান উৎস হইতে জ্ঞানসঞ্চয় করিয়া বিজ্ঞাজ্ঞানের ভাণ্ডার হইয়া উঠেন।

ইতিবৃত্ত সাক্ষ্য দেয় যে, প্রাচীন মুসলমান সম্প্রদায় বিজ্ঞা জ্ঞানকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছিলেন, যথা—(১) বহুদেশীয় ও (২) বিদগীষ

বিষয়ভূতা জ্ঞান। যে বিজ্ঞা বা জ্ঞান কোরানের বিধি ব্যবস্থার
 সহিত সম্পর্কিত, তাহাই স্বদেশীয় এবং যাহা
 বিজ্ঞার শ্রেণীবিভাগ বিদেশীয়েৱ নিকট হইতে সংগৃহীত—অর্থাৎ
 স্বদেশীয় ও বিদেশীয় দার্শনিক তত্ত্বমূলক, উহাই বিদেশীয় বিজ্ঞা আখ্যায়
 অভিহিত হইত। স্বদেশীয় বিজ্ঞা মূলতঃ হাদীস বা ধর্মবিজ্ঞান (অল্-
 উলুম্-অল্-নকলিয়া ওয়াল খরিয়া) ও ভাষাতত্ত্ব (উলুম্-উল্-লিসান-
 উল্-আরবী)। স্বদেশীয় বিজ্ঞা আবার নয় শ্রেণীতে বিভক্ত। যথা—

- (১) ইলম্-উল্-তকসির (কোরানীয় ভাষ্য Koranic Exeglses),
 (২) ইলম্-উল্-কেয়াত (কোরান সমালোচনা Koranic Criticism),
 (৩) ইলম্-উল্-হদীস (হদীস-বিজ্ঞা Science of Apostolic Tradition), (৪) ফেকা (স্বত্তি
 বা ব্যবহারশাস্ত্র Jurisprudence), (৫) নহয়ো
 (ব্যাকরণ Grammer), (৬) ইলম্-উল্-কালাম (যুক্তিশাস্ত্র Scholastic
 Theology), (৭) লোবাহ (শব্দকোষ, অভিধান Lexicography),
 (৮) বয়ান (অলকার শাস্ত্র Rhetoric), (৯) আদব (সাহিত্য Literature)
)।

স্বদেশীয় বিজ্ঞার মত বিদেশীয় বিজ্ঞা—দর্শনশাস্ত্র আবার পাঁচ ভাগে
 বিভক্ত। যথা—(১) চ্যারশাস্ত্র (Logic), (২) মনোবিজ্ঞান (Phi-
 losophy of mind), (৩) গণিতশাস্ত্র (Mathe-
 matics), (৪) ভৈষজ্য-তত্ত্ব (Medicine) এবং
 (৫) পদার্থবিজ্ঞান (Physical Science)।

প্রাচীন মুসলমানগণ (১) অল্-আরবিয়া (সাহিত্য), (২) অল্-
 খরিয়া (ধর্মজ্ঞান বা ধর্মতত্ত্ববিদ্যা), (৩) অল্-হিকমিয়া (দর্শনশাস্ত্র)—
 এই তিন বিজ্ঞা বিজ্ঞানের সাধনা করিতেন।

ওমর খৈয়াম একাগ্র সাধনাবলে স্বদেশীয় ও বিদেশীয় উভয় বিজ্ঞানভেদে অসাধারণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়া অলৌকিক জ্ঞানের পরিচয় দ্বারা দেশবাসীকে চমৎকৃত করেন। প্রথমে তাঁহার ওমরের জ্ঞান সাধনা স্বদেশীয় বিজ্ঞান-জ্ঞানের আলোচনা করা ঘাউক। স্বদেশীয় বিজ্ঞান মধ্যে (১) ইলম্-উল্-কেরাত, (২) শেকা, (৩) নহয়ো এবং (৪) আদব—এই চারি বিজ্ঞান তিনি অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন। এই চারি বিজ্ঞান পাণ্ডিত্যলাভ করিয়া কিরূপ হযক্বী ও দেশবাসীর প্রশংসা লাভ করিয়াছিলেন, তাহার বিবরণ বয়েকখানি ইতিহাস ও চরিত্রাভিধানে পাওয়া যায়।

ইলম্-উল্-কেরাত—কোরান-সমালোচন-বিজ্ঞান ওমরের পণ্ডিত জ্ঞান ছিল। তৎকালীন যুগে এই বিদ্যায় খাহারা সুপণ্ডিত না হইতেন, জ্ঞান বা পণ্ডিতসমাজে তাঁহাদের স্থান ছিল না। কোরান-সমালোচক, কোরানের ভাষ্যকার, কোরানের পার্থক্য অনুসন্ধানের দৃষ্টিতে সর্বাপেক্ষা প্রশংসাভাজন ছিলেন।

ওমর খৈয়াম কোরানের যেমন শ্রেষ্ঠ সমালোচক ছিলেন, সেমনিই ‘কারী’ও (কোরান পার্থক্য) ছিলেন। বেশ বেকরূপ হুর করিয়া ভদ্রীসহকারে পার্থ করিতে হয়, কোরানও ঠিক সেই প্রকার কিরয় ও কারী হুরে ও ভদ্রীতে পার্থ করিবার নিয়ম আছে। মুসলিম-জগতে কোরান-পার্থ উচ্চশ্রেণীর বিদ্যারূপে সম্মানিত। এই বিদ্যাকে ‘কিরয়, এবং পার্থক্যে ‘কারী’ নামে অভিহিত করা হয়। কোরান সাত প্রকার হুরে পার্থ করিতে হয়। ওমর খৈয়াম কোরান সাত প্রকার হুরে পার্থ করিতে জানিতেন এবং এই বিদ্যায় সুপণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

ঐতিহাসিক মহম্মদ শর্হজুরি(১) লিখিয়াছেন, সুলতান সঞ্জয়ের মন্ত্রী আবদুর রজ্জাক রাজকাৰ্য্যের অবসরে কবি, সাহিত্যিক, কারী ও বিদ্বানগণ পরিবেষ্টিত হইয়া নানা জ্ঞানালোচনায় সময় অতিবাহিত করিতেন। এক-

দিন উজীর আবদুর রজ্জাক, কারিগণের নেতা ওমর ও কারিগণের নেতা অল-গজ্জালী আবুল হসন অল-গজ্জালির সহিত ‘কিরয়ৎ’ সম্বন্ধে

তর্কালোচনা করিতেছিলেন। যখন তাঁহাদিগের

তর্ক পূর্ণশ্রোতে চলিতেছিল, ঠিক সেই সময় জ্ঞান-বিজ্ঞানের আধার ওমর খৈয়াম মস্তিষ্কে প্রবেশ করেন। ওমরকে দেখিয়াই মন্ত্রী আনন্দোচ্ছ্বাসে বলিয়া উঠেন, “আর আমাদের তর্কের প্রয়োজন নাই, এই যে আমাদের সর্ববিদ্যাবিশারদ আসিয়াছেন। বিশেষজ্ঞের অভিমতের উপর আর তর্ক চলিবে না” বলিয়া উল্লিখিত তর্কসম্বন্ধে ওমরের মনোযোগ আকর্ষণ করেন। ওমরকে তাঁহার অভিমত প্রকাশ করিবার জগু মস্তিষ্কপ্রবর অহুরোধ করেন। ওমর খৈয়াম সাত প্রকার সুরে ও ভঙ্গীতে কোরান পাঠ করেন এবং বিভিন্ন বিশেষজ্ঞের অভিমত উদ্ধার করিয়া প্রত্যেক সুরের ব্যাখ্যা করেন। তিনি প্রচলিত সপ্ত পদ্ধতি বা সুর ব্যতীত আরও যে একটি বিশেষ সুর আছে, তাহার সম্বন্ধেও গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা করেন। ওমরের গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা শ্রবণ করিয়া কারিগণের প্রধান অল-গজ্জালী উচ্ছ্বাসভরে বলিয়া উঠেন, ভগবান করুন, যেন এই প্রকার জ্ঞানী পণ্ডিতের সংখ্যা পৃথিবীতে দিন দিন বৃদ্ধি পায়। সত্যকথা বলিতে কি,

১। ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ দার্শনিক। ইঁহার সম্পূর্ণ নাম শামস অল-দীন অল-শর্হজুরি। ইনি দর্শনশাস্ত্র সম্প্রদায়ের এক গুরুত্বপূর্ণ পুস্তক রচনা করেন। দার্শনিক-গণের ইতিহাস লেখক হিসাবে প্রসিদ্ধ। তাঁহার “নুসরহ-উল-আরওয়া” অতি প্রসিদ্ধ পুস্তক। এই পুস্তক ইহঁতে তৎকালীন মুসলীম সম্প্রদায়ের বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগণের বিবরণ ও দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস জানিতে পারা যায়।

কোন কার্যই ওমর খৈয়ামের মত কিরকঃ বিজ্ঞায় বিশেষজ্ঞ ত' নহেনই,
উপরক্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞ।(১)

মুসলিম ধর্মতত্ত্ব ও ব্যবস্থা-বিজ্ঞানেও ওমর খৈয়াম প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। এ বিষয়ে তিনি দেশবাসীকে তাঁহার সাধনামূলক জ্ঞান বিতরণ করিতেন। মোল্লা এবং অগ্ন্যাগ্ন জ্ঞানীর মত তিনি মসজিদে গিয়া বক্তৃতা দিতেন না। তিনি তাঁহার গৃহে বসিয়াই ধর্মতত্ত্ব ও ব্যবস্থা-বিজ্ঞানে ওমরের উপদেশামূলক বিতরণ করিতেন। তাঁহার ছাত্র-পাণ্ডিত্য সংখ্যাও যথেষ্ট ছিল। ঐতিহাসিক মহম্মদ শহ'জু'রি এই বিজ্ঞানে তাঁহার পাণ্ডিত্যের সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, ইমাম ওমর খৈয়াম নিশাপুরে জন্মগ্রহণ করেন; দর্শন ও বিজ্ঞানের নানা বিভাগে যেমন প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের—প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন, তেমনই ইতিহাস ও ব্যবস্থা-বিজ্ঞানেও অলৌকিক জ্ঞানের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।(২)

কোরান ও ধর্মতত্ত্বে ওমরের কি গভীর জ্ঞান ছিল, কাজী আবদুর রশিদের প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানা যায়। কাজী আবদুর রশিদ লিখিয়াছেন, কোরানের কোন সূরার অর্থবোধ করিতে না পারিয়া আমি তাৎপর্যের জন্য কোরান-সাহিত্যে সুপণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ ওমর খৈয়ামের ওমর ও কাজী আবদুর রশিদ শরণাপন্ন হই এবং তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করি, এই সূরার মধ্যে কোন কোন শব্দ উপযুক্তপরি বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে কেন, জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য ইমাম ওমর খৈয়াম সন্দীর্ঘ এবং গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ যে ব্যাখ্যা করেন, তাহা শ্রবণ করিয়া আমার সমস্ত সন্দেহ দূরীভূত হইয়া যায়; জ্ঞানের

১। মুজহৎ-উল আরওয়া।

২। মুজহৎ-উল-আরওয়া

উজ্জল আলোক সন্দর্শনে আমি মুগ্ধ হই। ওমর এই তুরার ব্যাখ্যাকালে এত অধিকসংখ্যক বিশেষজ্ঞের উক্তি যুক্তিসহকারে প্রকাশ করেন যে, তাহার অমূল্য লিপি সংগ্রহ করিয়া রাখিলে, উহা ধর্ম-সাহিত্যের উচ্চাঙ্গের মূল্যবান পুস্তক হিসাবে গণ্য হইতে পারিত। (১)

ওমর খৈয়াম তাঁহার স্বাধীন মতবাদের জন্য অনেক সময় চর্চিত হইতেন। ক্রমে তাঁহার অবস্থা এমন হইয়াছিল যে, সদা সর্বদা তাঁহাকে প্রাণের ভয়ে দিনযাপন করিতে হইত। প্রকৃত সুকীরা তাঁহার উক্তিভেদে সুকী সম্প্রদায়ের অনেক গুপ্ত রহস্য-কথা নিহিত দেখিয়া কখনও গোপনে কখনও বা প্রকাশে তাঁহার সহিত সুকী রহস্যবাদ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আসিত। কিন্তু ওমরের এই সকল উদার উক্তি বা মতবাদ ধর্ম্মিক সম্প্রদায় সহ্য করিতে পারিত না। এজন্য তাহার তাঁহার উপর

ধর্ম্মিক সম্প্রদায় ও একেবারেই প্রকাসম্পন্ন ছিল না। উপরন্তু তাহার ওমরকে গোপনে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র পর্য্যন্ত করিয়াছিল। ওমর তাহাদিগের গুপ্ত অভিসন্ধি

জানিতে পারিয়া প্রাণভয়ে মক্কায় পলায়ন করেন। এই সময়ে তিনি তাঁহার লেখনী ও রসনা কণ্ঠস্থ সংযত করেন। কিছুদিন পরে মক্কা হইতে বোগদাদে উপস্থিত হইলেন। বোগদাদবাসীগণ অসাধারণ জ্ঞানী ওমরের আগমন সংবাদ পাইয়া তাঁহার নিকট প্রাচীন বিদ্যা-জ্ঞান (২) সম্বন্ধে উপদেশ বক্তৃতা শ্রবণ করিবার জন্য দলে দলে আসিয়া তাঁহার গৃহদ্বারে উপস্থিত হয়। কিন্তু ওমর তাহাদিগকে ষাতুক সম্প্রদায়ের লোক মনে করিয়া ঘৃণাভরে অবরুদ্ধ দ্বার অর্গলমুক্ত করেন নাই। এইরূপে অসংখ্য জ্ঞানাতুলানেচ্ছু হতাশ হইয়া ফিরিয়া যায়। মানব-সমাজের

১। মিরাত-ই জহান নাম।

২। গ্রীক দর্শন-বিজ্ঞান।

উপর অত্যন্ত বিরক্ত হইয়াই এই সময় তিনি তাঁহার জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য গোপন করিয়াই চলিতেন। কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেন না।

ধর্ম্মাঙ্ক সম্প্রদায় তাঁহাকে সর্বদাই ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে তর্ক-বিচারে আহ্বান করিতেন। তিনি ধর্ম্মাঙ্ক মুসলমানগণকে অত্যন্ত ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিতেন, অবজ্ঞাতরে তাহাদিগের আহ্বান উপেক্ষা করিতেন। তিনি ইহাদিগকেই গদ্যভ সন্তাষণ করিয়াছেন।

অনেক সময় ধর্ম্মাঙ্ক মুসলমানগণ ওমরকে এরূপ জোর করিয়াই তর্ক করিতে বাধ্য করিত। ওমর স্বভাবতঃ ধীরপ্রকৃতির লোক ছিলেন, শাস্ত্রভাবে তর্কিকগণের প্রশ্নের উত্তর দিয়া তাঁহাদিগকে শাস্ত করিতেন। তিনি জানিতেন, ইহারা উত্তেজিত হইয়াই তর্ক করিতে আসিয়াছেন, সুতরাং তর্ক অপেক্ষা ইহাদিগকে শাস্ত করাই সর্বোপায় কর্তব্য। সকল সময়ই তিনি তর্ক চাহিতেন না। বিনা প্রয়োজনে তর্ক করা তাঁহার স্বভাববিরুদ্ধ ছিল। —অত্যাশ্চর্য্য জ্ঞানের বলেই ওমর অনেক সময় বিপদ হইতে মুক্ত হইতেন।

ওমর স্বদেশীয় ও বিদেশীয় উভয় বিদ্যাতেই এরূপ সুপণ্ডিত ছিলেন যে, তাঁহার তুলা জ্ঞানী ও বিদ্বান তৎকালীন যুগে আর কেহই ছিলেন না।

তিনিই সে যুগের মূর্ত্তিমান জাগ্রত প্রজ্ঞা ছিলেন।
পারশুর জাগ্রত প্রজ্ঞা

তিনি তৎকালীন পারশুর জাগ্রত প্রজ্ঞা ছিলেন বলিয়াই, হুজ্জত-উল-ইসলাম, ব্যবস্থাসাষ্ট্রবিদ ইমাম আবু হামিদ অল-গজ্জালী, যাঁহাকে উদ্দেশ্য করিয়া মিশরীয় জ্ঞানী, ধর্ম্মসাধক জমাল উদ্দীন বলিয়াছিলেন, “মহম্মদের মৃত্যুর পর যদি অপর কোন পয়গম্বর জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন, আমি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারি,— অল-গজ্জালীই সেই পয়গম্বর”— সেই অইন-উল-দীন (ধর্ম্মের জ্যোতিঃ) অশেষ শাস্ত্র-জ্ঞান-পাণ্ডিত্যের আধার অল-গজ্জালীও জানেও মৃত-

অবতার ওমর খৈয়ামের নিকট উপদেশ গ্রহণ করিতে আসিতেন। কোন বিষয়ে কোন সমস্তার নিরাকরণ করিতে অপারগ হইলে, সুপণ্ডিত ওমরের শরণাপন্ন হইতেন। বিদ্যা-জ্ঞানের আধার ওমর সানন্দে তত্ত্বকথা বুঝাইয়া তাঁহার সম্বন্ধে নিরাকরণ করিয়া দিতেন। কিন্তু অল-গজ্জালী, ওমরের স্বাধীন মতবার সন্মত করিতে পারিতেন না। এই স্বানৈই ওমরের সহিত গজ্জালীর মতানৈক্য ঘটিত। আমরা অল-গজ্জালীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম।

ইসলাম ধর্ম প্রচারিত হইবার পর, যাঁহার। এই ধর্মের গৌরব-পতাকা বহন করিয়া দিকে দিকে ইহার মহিমা প্রচার করিয়া ধন্য

হইয়াছিলেন,—শাস্ত্রজ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের আধার
অল গজ্জালী

ইমাম আবু হামিদ মহম্মদ অল-গজ্জালী তাঁহার দিগের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়া ধর্ম-জগতের ইতিবৃত্তে চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। ইমাম গজ্জালী খোরাসানের অন্তর্গত তুশনগরের ৪৫০ হিঃ (১০৫৮ খৃষ্টাব্দ) জন্মগ্রহণ করেন। স্নকুমার জীবন-প্রভাতে পিতৃ-মাতৃহীন হন। মাতা-পিতার মৃত্যুর পর গজ্জালী তাঁহার পিতৃবন্ধু আহমদ অল-রাধখানির সংসারে প্রতিপালিত হইয়া বিদ্যা শিক্ষা করেন; পরে খোরাসানের উচ্চ বিদ্যালয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেন। নিশাপুরে ও জর্জান প্রদেশের সুপ্রসিদ্ধ ধর্মতত্ত্ববিদ যথাক্রমে, ইমাম উলহার মোনের ও আবু নসর অল-ইসমাইলের নিকট ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। কুড়ি বৎসর বয়সের সময়েই অধ্যাত্মতত্ত্বের গভীর গুহায় আত্মনিমগ্নন করেন। এই বয়স হইতেই তিনি ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা প্রদান ও কতকগুলি ধর্ম-পুস্তিকা প্রচার করেন। এই ধর্মপুস্তিকাগুলি বিদ্বান-কুল-গৌরব, শ্রেণ্যভূক-মন্ত্রী নিজাম-উল-মুলকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুপণ্ডিত মন্ত্রীপ্রবর গজ্জালীর জ্ঞান-পাণ্ডিত্যে

মুখ হইয়া তাঁহাকে নব প্রতিষ্ঠিত নিজামিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক পদে নিযুক্ত করেন। অল-গজ্জালী যে-সমস্ত গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, সমস্তগুলিই ধর্ম-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠসম্পদরূপে মুসলিম-জগতে সম্মানিত। তাঁহার সমস্ত গ্রন্থই আরবী ভাষায় লিখিত। ইহার মধ্যে অনেকগুলি পুস্তক পারশ্য ভাষায় অনূদিত হয়। গজ্জালীর গ্রন্থাবলী লাতিন, জর্মান, ফরাসী, হিব্রু এবং ইংরাজী ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তিনি ১০৫ হিজরাদে (১১১১ খ্রিঃ) দেহত্যাগ করেন।

অল-গজ্জালী, ওমরকে “আকাশের অবস্থা” সম্বন্ধে প্রশ্ন করেন। তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া ওমর শাস্ত এবং গভীর স্বরে গজ্জালীকে বলেন, তিনি তাঁহার “এরাইয়ানুন নকিসা” নামক পুস্তকে এ বিষয়ে বিশদভাবে ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

ওমর খৈয়াম ও
অল-গজ্জালী

ঐ গ্রন্থ পাঠ করিলেই সমস্ত বিষয় জানা যাইবে। অল-গজ্জালী ওমরের মুখে ইহার বিশদ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিবার জন্ত তাঁহাকে পুনঃপুনঃ অনুরোধ করিয়া জিজ্ঞাসা করেন, “কোন গোলক যে অংশের সাহায্যে অক্ষের উপর ঘুরিতে থাকে, গোলকের সমস্ত অংশ একই প্রকার হওয়া সম্ভব ও ঐ অংশটি অগাঢ় অংশ হইতে পৃথকরূপে জানা কিরূপ সম্ভব?” ওমর গজ্জালীর অনুরোধে ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন, এই ব্যাখ্যা দ্বিপ্রহর হইতে আরম্ভ হইয়া অপরাহ্নেও শেষ হয় নাই। অপরাহ্ন-নমাজের সময় উপস্থিত হওয়ায় ওমর গাত্রোথান করেন অল-গজ্জালী মুখ চিহ্নে ওমরের গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া গাত্রোথান কালে বলেন, “সত্য মূর্তির দর্শনলাভ করিয়া শান্তি ও আনন্দ লাভ করিলাম। মিথ্যা-ষবনিকা অপসারিত হইয়াছে।

অর্থাৎ পূর্বে আমার যে ধারণা ছিল, উহাই মিথ্যা, আজ সত্যসাক্ষক ওমরের ব্যাখ্যায় সত্য মূর্তি প্রকাশিত হইয়াছে।”(১)

ওমর সাহিত্য-শাস্ত্রেও সুপণ্ডিত ছিলেন।—ঐতিহাসিক শহজুরি লিখিয়াছেন—ওমর-খৈয়াম অল-আরবিয়াতেও (প্রাচীন সাহিত্য-শাস্ত্র Classical Arabic) সুপণ্ডিত ছিলেন।

ওমর-খৈয়াম ও

অল-বৈহাকী

আবদুল হসন অল-বৈহাকী(২) ওমর খৈয়ামের

সাহিত্যশাস্ত্রে গভীর জ্ঞানের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, ৫০৫ হিজরাদে (১১১১ খৃঃ) আমি ইমাম ওমরের সহিত সাক্ষাৎ করিতে যাই। তাঁহার গৃহে উপস্থিত হইয়া দেখি যে, তাঁহার গৃহ বিদ্বানমণ্ডলীতে পূর্ণ; সকলেই তাঁহাকে নানাবিধ প্রশ্ন করিতেছে; ওমর একে একে সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া সকলের সন্দেহ নিরাকরণ করিতেছেন, আমি একটি দুরূহ আরবী কবিতার তাৎপৰ্য্য এবং ইহার টীকা বোধগম্য করিবার জন্ত তাঁহার নিকট গিয়াছিলাম। একে একে সকলের ব্যাখ্যা শেষ হইলে, তাঁহাকে হামসা হইতে একটি কবিতা পাঠ করিয়া উহার ব্যাখ্যা করিবার জন্ত অনুরোধ করি। সাহিত্য-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ওমর খৈয়াম ঐ শ্লোকের দরল ব্যাখ্যা করিয়া আমাকে বুঝাইয়া দেন।(৩)

ওমর খৈয়াম জ্ঞানরাজ্যে এতই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিয়াছিলেন যে, তিনি

১। নুজহরৎ-উল-আরওয়া।

২। খোরাসানের অন্তর্গত বৈহাক প্রদেশের বিদ্বান ও দার্শনিক।—৪৫০ খৃষ্টাব্দে জয়গ্রহণ ও ৫০৬ খৃষ্টাব্দে সমাধিস্থ হন। ইনি ওমরের সমসাময়িক ছিলেন; প্রাচীন সাহিত্যের সমালোচক হিসাবে তৎকালে এসিদ্ধ ছিলেন।

৩। কারদোস-উৎ-তওরারীখ।

তাহার চরম জ্ঞানের পরিচয় দেন—গ্রীক-বিদ্যা-জ্ঞানানুশীলন দ্বারা। গ্রীক-বিদ্যা-জ্ঞানানুশীলন তৎকালীন যুগে সাধারণের মধ্যে স্ফুলভ ছিল না।

বিদেশীয় বিজ্ঞান প্রসিদ্ধ গ্রীক বিদ্বানগণের পুস্তকাবলী আরবী ভাষায় অনূদিত হইয়াছিল। অধিকাংশ লোক ওমরের পাণ্ডিত্য অনূদিত পুস্তকের সাহায্যেই গ্রীক-বিদ্যা-জ্ঞানের

পরিচয় লাভ করিয়া ধৃত হইত। অসাধারণ বীশক্তিসম্পন্ন জ্ঞানী দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকগণই কেবলমাত্র মূল গ্রীক গ্রন্থাবলী অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞান সঞ্চয় করিতেন। ওমর থৈয়াম, অল্-কিন্দী, (১) অল্-ক্যারাবী, (২) তাহার সর্ববিদ্যাবিশারদ গুরু আবু-সিনা, ইবনে রোশন প্রমুখ যুগশ্রেষ্ঠ দার্শনিক, চিন্তাবীরগণের মত মূল গ্রীক গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়া গ্রীক-জ্ঞান-প্রতীকরূপে দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করিয়াছিলেন।

ওমর থৈয়াম গ্রীক-বিদ্যা আলোচনা করিয়া কিরূপ সুপণ্ডিত হইয়াছিলেন, দার্শনিকগণের বিবরণী লেখক, ঐতিহাসিক জমল উদ্দীন অল্-ককতী (৩) প্রদত্ত বিবরণ হইতে জানিতে পারা যায়। অল্-ককতী

১। মোসলেম দর্শনশাস্ত্রের জনক অল্-কিন্দী নবম খ্রীষ্টাব্দের মাঝামাঝি সময়ে কুশনগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাহার পিতা এই নগরের শাসনকর্তা ছিলেন। অল্-কিন্দী খলিফা মামুন ও মুতাসিমের দরবারে বিদ্বান পারিষদ ছিলেন। এই সময়ই তিনি গ্রীক-দর্শন গ্রন্থাবলী আরবী ভাষায় অনুবাদ ও সম্পাদন করেন। ইহার ভূলা গ্রীক বিদ্যা-বিশারদ তৎকালে কেহই ছিলেন না।

২। তুর্কিস্তানের অন্তর্গত ফ্যারাব প্রদেশবাসী দার্শনিক। ইনি গ্রীক-বিজ্ঞান অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করিয়া “দ্বিতীয় আরিস্তোতল” নামে সম্মানিত হইলেন। ৩৪৩ হি: (৯৫৪ খ্রী:) সিরিয়া দেশে ঘাতক সম্প্রদায় কর্তৃক নিহত হন।

৩। আরোদশ শতাব্দীর দার্শনিক। শহজুরির মত ইনিও মোসলেম দর্শনশাস্ত্রের ইতিহাস ও দার্শনিকগণের বিস্তৃত বিবরণ লিখিয়াছিলেন। “তারিখ-উল-হকমা” তাহার সুপ্রসিদ্ধ জীবনী পুস্তক।

লিখিয়াছেন,—যুগশ্রেষ্ঠ বিদ্বান, ইমাম ওমর খৈয়াম গ্রীক-জ্ঞান-বিজ্ঞান-শাস্ত্রের নানা বিভাগেই অসাধারণ জ্ঞানী ছিলেন। তিনি গ্রীক-পদ্ধতি অনুসারে জ্ঞানানুশীলন করিতেন এবং ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে দেশবাসীকে উপদেশ দিতেন।(১)

আর একজন চরিতকার ওমরের গ্রীক-বিদ্যা-জ্ঞানানুশীলন সম্বন্ধেও যে বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহাও নিম্নে বিবৃত হইল :—

খোঁরাসানের বিশিষ্ট বিদ্বান ওমর খৈয়াম গ্রী-জ্ঞান-বিজ্ঞানে সুপণ্ডিত ছিলেন। গ্রীকজ্ঞানানুশীলন তাঁহার প্রিয় কার্য ছিল। তিনি তাঁহার ছাত্রবর্গকে গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে বক্তৃতা উপদেশ প্রদান করিতেন।(২)

ওমর খৈয়াম জন্মান্তরবাদ ও জন্মান্তরীয় কর্মফলজনিত সুখ-দুঃখপ্রাপ্তি
ওমর খৈয়াম ও বিশ্বাস করিতেন। তিনি বলিতেন. এই তত্ত্ব
জন্মান্তরবাদ ভাল করিয়া জানিতে পারিলেই জটিল বিশ্ব-রহস্যের
বিষয় অবগত হওয়া যায়। ওমর পুনর্জন্মতত্ত্বেও
বিশেষ জ্ঞানলাভ করিয়া বিশেষজ্ঞের সম্মানলাভ করিয়াছিলেন। তিনি
যে জন্মান্তর স্বীকার করিতেন, নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে আমরা জানিতে
পারি।

নিশাপুরের এক কলেজে ওমর ছাত্রগণ সমেত উপস্থিত
হয়েন। এই সময় কলেজের জীর্ণ-সংস্কার হইতেছিল এবং কতকগুলি
গদর্ভ ইষ্টক বহন কার্যে নিযুক্ত ছিল; তন্মধ্যে একটি গদর্ভ প্রাঙ্গণে
প্রবেশ করিতে পারিতেছিল না। ইহা দেখিয়া ওমর সহাস্তে গদর্ভটির
নিকট গমন করিয়া একটি কবিতা আবৃত্তি করেন। অতঃপর গদর্ভ
প্রাঙ্গণে প্রবেশ করে। ইহাতে বিস্মিত ছাত্রের দল ওমরকে ইহার কারণ

১। তারিখ-উল-হকমা।

২। আকবর উল উলেমা।

জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, এই গদ্যভট্টর দেহে আপাততঃ যে, আত্মা বিরাজমান, পূর্বে সে এই বিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের দেহে ছিল, এই জ্ঞান লজ্জায় সে প্রবেশ করিতে পারিতেছিল না। কিন্তু এখন তাহার সহযোগীরা তাহাকে চিনিয়া ফেলিয়াছে বৃত্তিতে পারিয়া উপায়স্বরের অভাবে প্রবেশ করিল।(১)

ওমরের স্বরণশক্তি এরূপ অসাধারণ ও তীক্ষ্ণ ছিল যে, উহা

পারশ্ব দেশে প্রবাদ বাক্যে পরিণত হইয়াছিল।
ওমরের স্মৃতিশক্তি নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে ইহার পরিচয় পাওয়া

যায়। ইম্পাহানে অবস্থানকালে ইমাম ওমর খৈয়াম একখানি দর্শনশাস্ত্র পাঠ করিয়া এতই মুগ্ধ হইলেন যে, ঐ পুস্তকখানি উপর্যুপরি সাত বার পাঠ করিয়া কণ্ঠস্থ করিয়া ফেলিলেন। তিনি ইম্পাহান হইতে নিশাপুর প্রত্যাবর্তন করিয়া কোন শিগ্গকে সমগ্র পুস্তকখানি মুখস্থ বলেন। মূল পুস্তকের সহিত ওমর প্রদত্ত শ্রুতিলিখন মিলান হইলে দেখা যায় যে, অতি অল্পই মূল হইতে তফাৎ হইয়াছে।(২)

নূতন নূতন সাহিত্য ও শিল্প সৃষ্টি, দর্শনের ক্ষেত্রে নব নব চিন্তাধারা প্রবর্তন, বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নব নব রহস্যের দ্বার উদ্ঘাটন করা ব্যক্তিবিশেষের অনন্যসাধারণ প্রহিভার উপর নির্ভর করে। যিনি এই অসাধারণ কৰ্ম সম্পাদন করেন, তিনিই অসাধারণ বা যুগ-মানবরূপে

সম্মানিত হন। এই সকল মনীষীর সংখ্যা কোন
যুগেই অধিক নহে। ইহারাই জ্ঞান-রাজ্যের
যুগমানব
ওমর খৈয়াম
অভিজাত সম্প্রদায়ের মাহুয।—জ্ঞান-পাণ্ডিত্য-
প্রতিভার উজ্জ্বল মূর্তি ওমর খৈয়াম জ্ঞানের উজ্জ্বল বর্তিকা হস্তে দর্শন-

১। তারীখ-ই অলফী।

২। মুজহব-উল্ আরওয়া

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তাঁহার অদ্ভুত অধ্যবসায় ও গবেষণা দ্বারা নূতন আলোক-
 রশ্মিপাত করিয়া জ্ঞান-রাজ্যের অধীশ্বর—যুগ-মানবরূপে সম্মানিত হন।
 জেলজুক সম্রাট মলিক শাহের রাজত্বকালে যদি কোন উল্লেখযোগ্য ঘটনা
 ঘটনা থাকে, তাহা হইলে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা—জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য
 ওমর খৈয়ামের নবনবোন্মেষশালিনী বৈজ্ঞানিক-প্রতিভার বিকাশ।
 দশম শতাব্দীতে যেমন ওমর-গুরু আবু-সিনার প্রতিভাচ্ছটায় সমগ্র
 পারশ্ব দেশ আলোকিত হইয়াছিল, পরবর্তী যুগে তেমনই আবু-সিনার
 উপযুক্ত শিষ্য যুগ-মানব ওমর খৈয়াম অপূর্ব প্রতিভালোকে সমগ্র
 পারশ্ব আলোকিত হয়। শুলতান মলিক শাহের রাজত্ব-ইতিহাস জ্ঞান-
 বিজ্ঞানের সুবর্ণ যুগেইতিহাস বলিলে অত্যুক্তি করা হয় না।

জ্ঞানতপস্বী ওমর খৈয়ামের অলৌকিক প্রতিভা, জ্ঞানের পরিচয়
 দিতে গিয়া চরিতাভিধানকার সৈয়দ আলি বিন মহম্মদ অল-হুসেনী(১)
 পরম শ্রদ্ধাপূর্ণ যে মনোজ্ঞ বিবরণ প্রদান করিয়াছেন, তাহা নিয়ে প্রদত্ত
 হইল। তিনি লিখিয়াছেন, ওমর খৈয়াম এরূপ অননুসাধারণ জ্ঞান-
 পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন যে, তাঁহাকে অকুতোভয়ে জ্ঞান-

আকাশের ধ্বনিক্ষত্র, জ্ঞান-সমুদ্রের মুক্তারূপে শ্রদ্ধা
 জ্ঞান-আকাশের ধ্রুব

নক্ষত্র

ও সম্মান দেখাইতে পারা যায়। পারশ্বের
 পণ্ডিত-সমাজ তাঁহার ক্রীতদাস ছিল। অর্থাৎ

জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন যুগ-মানব ওমর খৈয়ামের জ্ঞান-
 পাণ্ডিত্যের নিকট তাহাদিগের জ্ঞান-পাণ্ডিত্য অকিঞ্চিৎকর; এই
 কারণে তাহারা শ্রদ্ধার সহিত একবাক্যে ওমরের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার

১। ষোড়শ শতাব্দীর কবি-বিবরণী লেখকরূপে বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার
 কবি-বিবরণী বা চরিতাভিধানের নাম “বাজমারাই’। এই গ্রন্থ তিনি ১০০০ হিজরাকে
 (১৫৯২ খৃ:) সমাপ্ত করেন।

করিয়া লইয়াছিল। আরবীর বিদ্বানগণও ওমর খৈয়ামকে অধিতীর আনিরূপে শ্রদ্ধাঞ্জলী প্রদান করিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিল। ওমর খৈয়াম এরূপ মনীষাসম্পন্ন ছিলেন যে, তাঁহার পূর্ববর্তী গ্রীক মনীষী ইউক্লিডকেও জ্ঞানের উৎকর্ষে অতিক্রম করিয়াছিলেন। শুধু ইহাই নহে, তাঁহার জ্ঞান-পাণ্ডিত্যের নিকট গ্রীক বিদ্বান আরিস্তোতলের জ্ঞান-পাণ্ডিত্য-মনীষাও ত্রিঘমাণ। (১)

ওমর খৈয়াম তাঁহার অত্যাশ্চর্য ও অননুসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভার দ্বারা যেমন যুগ-প্রসিদ্ধ হইয়া যুগ-মানবরূপে দেশবাসীর শ্রদ্ধালাভ করিয়াছিলেন, তেমনই দেশের সুলতান,— ওমরের প্রতি সুলতান-গণের শ্রদ্ধা নিবেদন প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা জ্ঞানতপস্বী ওমরের সহিত শ্রদ্ধেয় বহুর মত ব্যবহার করিতেন। সুলতান মলিক শাহের দরবারে বিদ্বান-পরিষদ ও মুনাজ্জিম-ই-শাহী রূপে অবস্থান করিলেও, সুলতানের মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্ত্ত পর্যন্ত ওমর তাঁহার নর্মসখা ছিলেন। সুলতান মলিক শাহের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সুলতান সঞ্জর সিংহাসনারোহণ করিলে, তিনিও ওমর খৈয়ামের সহিত পরম শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করেন। শুধু ইহাই নহে, ওমর খৈয়ামের যোগ্য আসন তাঁহার সিংহাসনের দক্ষিণ পার্শ্বে নির্দেশ করিয়া দেন। বোখারার শাসনকর্তা থাকান শাসন-উল-মুহু ওমর খৈয়ামকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করিতেন। তিনিও সুলতান সঞ্জরের মত রাজসিংহাসনের পার্শ্বে ওমরের উপযুক্ত স্থান নির্দেশ করিয়া দেন। (২)

১। বাজমারাই।

২। মুজহৎ-উল-আরওয়া।

জ্ঞান-যোগী ওমর খৈয়াম জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনার অগ্রযুক্ত হইলে
 পার্শ্বের জ্ঞান-দেবতা অলক্ষ্যে তাঁহার প্রতিভা-উজ্জল ললাটে অমরত্বের
 জয়টিকা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। বাস্তবিকই ওমর
 পার্শ্বের আশ্রিত প্রজা ছিলেন বলিয়াই গ্রীক-মনীষী আরিস্তোতল
 (Aristotle)—যিনি মুসলিম দার্শনিকগণের
 অমরত্বের জয়টিকা
 গুরু ছিলেন, যাহার দর্শন অবলম্বন করিয়া মুসলিম
 সম্প্রদায় দর্শন-শাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন,—সেই গ্রীক জ্ঞানবীর
 আরিস্তোতল এবং গ্রীক বিদ্বান ইউক্লিডের (Euclid) মনীষা ও জ্ঞানের
 সহিত তাঁহার জ্ঞান-পাণ্ডিত্য-প্রতিভার তুলনা করা হইয়াছিল।

নবম পরিচ্ছেদ

মুসলিম দর্শনে গ্রীক প্রভাব

আব্বাসবংশীয় খলিফাগণের রাজত্বকাল হইতেই প্রাচীন মুসলমান সম্প্রদায় প্রকৃতপক্ষে জ্ঞানসঞ্চয়ে অগ্রসর হইয়া জগতের বিভিন্ন উন্নতি-শীল জাতির জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ করিয়া বিদ্যা-জ্ঞানের ভাণ্ডার হইয়া উঠে। গণিত-জ্যোতিষ-চিকিৎসা-বিজ্ঞান অনুশীলন করিবার সময় তাঁহারা হিন্দু-গ্রীক-মিশর-পারসিক জাতির জ্ঞান-উৎস হইতে যেমন জ্ঞান সঞ্চয় করিয়াছিলেন, দর্শনশাস্ত্র আলোচনা করিবার সময় কিন্তু গ্রীক ব্যতীত অন্য জাতির জ্ঞান-ভাণ্ডার হইতে ঋণ গ্রহণ করেন নাই। ইসলাম ধর্ম যখন পারস্য সিরিয়া ও মিশর দেশে বিস্তৃতি লাভ করে, সেই সময় হইতে মুসলিম সম্প্রদায় গ্রীক সভ্যতার সংস্পর্শে আইসে।

সিদ্ধুদেশ বোগদাদ-খলিফার শাসনাধীন হইবার পর হইতে ভারত-বর্ষের সহিত বোগদাদের জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনার সংস্পর্কে যে পরিচয়

মুসলিম সম্প্রদায়ের
উপর হিন্দু প্রভাবের
অবগান

—যোগসূত্র স্থাপিত হইয়াছিল, সিদ্ধুদেশ অধীনতা-
পাশ হইতে মুক্ত হইবার পর তাহা বন্ধ হয়। ইহার
পর আর আরবীয় গ্রন্থে হিন্দুর সভ্যতা, হিন্দুর বিজ্ঞা-
জ্ঞানের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। গ্রীক

সভ্যতা, গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান পূর্ব হইতে মুসলিম সম্প্রদায়ের উপর
প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই ঘটনার পর হইতে মুসলিম সম্প্রদায়
সর্ববিষয়ে গ্রীক প্রভাবান্বিত হইয়া পড়েন। ইহার কলে, তাঁহারা গ্রীক

জান-ভাগুর হইতেই দর্শনশাস্ত্রের জ্ঞান আহরণ করেন। ইহার পূর্বে ইসলাম-জগতে দার্শনিক তত্ত্বমূলক অনুশীলন বা আলোচনা অতি অল্পই ছিল।

কোরান মানবের সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ হইলেও, ইহাতে দার্শনিক চিন্তার উপাদান অতি অল্পই পাওয়া যায়; এবং কোরান ও লুকম্যান

মাহা পাওয়া যায়, তাহাই আবার জ্ঞানী লুকম্যানের বাণীর প্রতিধ্বনি মাত্র। (১) জ্ঞানী লুকম্যানকে মহম্মদ স্বত্যস্ত প্রদ্বা করিতেন। কোরানের যে অধ্যায়ে তিনি এই জ্ঞানবীরের

সম্বন্ধে প্রদ্বাপূর্ণ আলোচনা করিয়াছেন, উহা জ্ঞানী লুকম্যান “নুরা-লুকম্যান” নামে পরিচিত। লুকম্যানের

বাণী রাজা সলোমানের মত বাণীর মত ঈশ্বর-অনুপ্রেরণায় রচিত। পৃথিবীর হাজার বৎসর পূর্বে তাঁহার নীতি-উপদেশ প্রচারিত হয়। (২)

পরগম্বর যে দর্শন শাস্ত্রকে ধর্ম হইতে পৃথক করিয়াছিলেন, তাঁহার জামাতা চতুর্থ খলিফা আলি উহাকেই আবার ধর্মের সহিত একত্র

করিয়া ধর্ম ও দর্শনের সমন্বয় সাধন করেন; ধর্ম ও দর্শনের সমন্বয়
সম্পর্কে চতুর্থ
খলিফার বাণী
তিনিই ইসলাম-জগতের প্রথম দার্শনিক হিসাবে
অনুসন্ধানের প্রদ্বা লাভ করেন। ধর্ম ও

দর্শনের সমন্বয় সম্পর্কে তাঁহার বাণী এইরূপ:—
“বিশ্বাসীরা (মুসলমানেরা) যে দর্শন শাস্ত্রকে এতকাল ধর্ম হইতে

১। কোরান ৩১শ অধ্যায়; Encyclo of Religion and Ethics.

২। হকিম-ই-লুকম্যানের বাণী উপদেশের সংখ্যা দশ হাজার। তিনি ভগবদ-অনুপ্রাণিত ছিলেন কিনা, এ বিষয়ে সমস্ত ব্যাখ্যাকার একমত নহেন। একজন আরব ব্যাখ্যাকার তাঁহার বাণীর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, সমগ্র পৃথিবী অপেক্ষাও তাঁহার বাণী অধিকতর মূল্যবান। তাঁহার বাণী ও নীতি-উপদেশপূর্ণ গল্পগুলি ঈশ্বরের গল্পের মত; এই কারণে অনেক পণ্ডিত ঈশ্বরের মৌলিকত্ব অস্বীকার করিয়া বলিয়াছেন, জ্ঞানী লুকম্যানই তাহাদের প্রকৃত রচয়িতা।

পৃথক করিয়া রাখিয়াছিল, উহাকে পুনরায় ধর্মের সহিত একত্র করিতে হইবে : আংশিক হইলে বিধর্ম্যের নিকট হইতেও গ্রহণ করিতে হইবে।”(১) ইহাই মুসলিম দর্শনের গোড়ার কথা।

প্রাচীন মুসলিম সম্প্রদায় সিরীয় অনুবাদের মধ্যস্থতার স্রোতো
(Plato) ও আরিস্তোতলের (Aristotle) দার্শনিক
আরিস্তোতলের মতবাদের মতবাদের সহিত প্রথম পরিচয় লাভ করেন।(২)
সহিত মুসলিম সম্প্রদায়ের প্রথম পরিচয় সিরীয় জাতিই সর্বপ্রথম আরিস্তোতলের গ্রন্থাবলীর
অনুবাদ টীকা ও ভাষ্য রচনা করেন।(৩)

খলিফা অল-মামুনের রাজত্বকাল হইতেই মুসলিম সম্প্রদায় গ্রীক
দার্শনিক মতবাদের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় লাভ করেন।(৪) গ্রীক
মনীষী আরিস্তোতল (Aristotle) প্রাচীন মুসলমান সম্প্রদায়ের উপর
এক প্রভাব বিস্তার করেন যে, তাঁহার বান্ধী
আরিস্তোতলের প্রভাব তাঁহাদিগের বীজমন্ত্ররূপ হইয়াছিল। কোরান
এবং আরিস্তোতলের দার্শনিক মতবাদ পাশাপাশি রাখিয়া তাঁহারা লর্চ
করিতেন এবং এই মতবাদকেই কোরানের পরিশিষ্টরূপে গ্রহণ

১। Encyclo of Religion of Ethics.

২। A History of Classical Scholarship. Sandys ;
Encyclo of Islam,

৩। A History of Classical Scholarship. Sandys.

৪। Encyclo of Islam ; A History of Classical
Scholarship. Sandys ; Ueberwg's, History of Philosophy.
Translated by Morris.

করিয়াছিলেন।(১) মোটকথা, মুসলিম দর্শন বলিলে, তৎকালে আরিস্তোতলের দার্শনিক মতবাদকেই বুঝাইত।(২)

আরিস্তোতলের দার্শনিক তত্ত্বমূলক বাণী যখন ইসলাম-জগতে প্রথম প্রকাশ পায়, তখন ইহা কোরানের বাণীর মতই প্রতীত হইয়া তাঁহাদিগের মনচ্ক্ষে অমৃতের সোপান প্রদর্শন করিলেও, তখনও তাঁহারা এই মতবাদ বুঝিবার মত জ্ঞানলাভ করেন নাই; সর্বজন-স্বীকৃত ধর্মতত্ত্ব (orthodox theology) ও আরিস্তোতলের মতবাদের মধ্যে অনৈক্য (discrepancy) কোথায়, তাহা তাঁহারা তখনও বুঝিতে পারেন নাই। এই কারণেই তাঁহারা কোরান এবং আরিস্তোতলের দর্শন পাশাপাশি রাখিয়া দৃঢ়বিশ্বাসের সহিত উহাকেই কোরানের পরিশিষ্ট রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন।(৩)

মুসলিম জ্ঞানী সম্প্রদায়ের মানসিহ অবস্থা যখন এইরূপ, ঠিক এই সময়েই গ্রীক দর্শন অনুশীলন করিবার জগৎ একটি দল বা সম্প্রদায় গঠিত হয়, ইহারা ইতিহাসে “অল-ফলসফা” বা দার্শনিক নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইসলাম-সভ্যতার ইতিহাসে এই সম্প্রদায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার

করিয়াছিল। ইহারা ই দার্শনিক আরিস্তোতলের মতবাদের প্রচারক ছিলেন। গ্রীক গ্রন্থ পাঠ করিয়া গ্রীক দর্শনের অর্থবাদ প্রচার এবং অনুশীলন করাই এই সম্প্রদায়ের ব্রত ছিল। ইহারা এই কার্যে আত্মনিয়োগ করিতেন, তাঁহাদিগকে

১। Arabic thought and its place in history. De Lacy O'Lary.

২। History of Eastern Philosophers. Macdonald.

৩। Arabic thought and its place in history, De Lacy O'Lary.

গ্রীক পুঁথি এবং গ্রীক বিদ্বানগণের টীকা গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া সবিশেষ জ্ঞান সঞ্চয়পূর্বক অনুবাদকের দায়িত্বপূর্ণ কৰ্ম করিতে হইত। ইহারাই

“কলসফা” বা দার্শনিক নামে সম্মানিত হইতেন।

কলসফা ও হকিম

ইহাদিগের পর যাহারা গ্রীক দর্শন অনুশীলন বা আলোচনা করেন, তাঁহারা “হকিম” বা জ্ঞানী নামে অভিহিত হইতেন। কলসফা সম্প্রদায় তৃতীয় হিজরাদ হইতে অনুবাদ কার্য আরম্ভ এবং সপ্তম হিজরাদে উহা সুসম্পন্ন করেন।

ঐতিহাসিক আবুল কতেহ মুহম্মদ অন-শহরতানী এই সম্প্রদায়ের বিস্তৃত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি তাঁহার ইতিহাসে বিংশতি জন কলসফার নাম উল্লেখ করিয়াছেন, যাহারা মূল গ্রীক গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া আরিস্তোতল ও প্লেটোর গ্রন্থাবলীর অনুবাদ ও

ভাষ্য রচনা দ্বারা “কলসফা” নামের সার্থকতা

প্রতিপাদ

সম্পাদন করিয়াছিলেন। প্রতিনাস (Plotinus)

২০৩-২৬২ খ্রীঃ) যিনি মুসলিম-জগতে আফ্লাতুন-ই-মিশরী (মিশরীয় প্লেতো) এবং অন-শেখ-অল-মুনানী (গ্রীক প্লেতো) নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁহার মতবাদের মধ্য দিগ্বাই মুসলিম-সম্প্রদায় নব-প্লেতো-পন্থার (Neoplatonism) মতবাদের সহিত পরিচিত হয়। (১) ইহা হইল খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীর কথা। ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ইহার তিন শত বৎসর পূর্বে পারস্যের শাসনাবলী নরপতি নওশেরওয়ান রাজত্বকালে পারস্যদেশে গ্রীকদর্শনের অনুশীলন ছিল। (২) প্রতিনাস আফ্লাতুনরূপে পারস্য দেশে অসীম প্রভাব বিস্তার করেন। (৩)

১। Introduction. Rubaiyyat by Edward Heron Allen.

২। Fall and Decline of Roman Empire. Gibbon.

৩। Encyclo of Religion and Ethics.

আরও জানা যায় যে সাতজন গ্রীক দার্শনিক পারশ্ব নরপতির সাদর আহ্বানে পারশ্ব দেশে আহুত হন, তাঁহারা প্রত্যেকেই নব-প্লেতো পন্থী (Neoplatonist) ছিলেন(১)

প্লেতো, আরিস্তোতল অপেক্ষা মুসলিম-সমাজে স্বল্পখ্যাত হইলেও, মুসলিম সম্প্রদায় নব-প্লেতো-পন্থী সম্প্রদায়ের মতবাদের মধ্য দিয়াই প্লেতোর মতবাদের সহিত পরিচিত হন। ফলসফা-সম্প্রদায় যখন গ্রীক দর্শন অহুশীলন আরম্ভ করেন, তাঁহারা নব-প্লেতো-পন্থারই অহুশীলন করিতেন। এইজন্য বলিতে পারা যায় যে, ফলসফা সম্প্রদায় প্রকৃতপক্ষে নব-প্লেতো-পন্থারই বিকাশ মাত্র (development of Neoplatonism)।(২)

প্লেতো ও আরিস্তোতলের মতবাদ প্রচলিত গ্রীক-চিন্তাধারা হইতে বিচলিত হইয়া বিভিন্ন পথগামী হয়। প্লেতো সম্প্রদায়ের গুরুভক্তি একনিষ্ঠ হইলেও, গুরু সহিত প্লেতো-শিষ্যগণের মতবিরোধ হয়। কিছুকাল ধরিয়া গ্রীসে সর্বদর্শনসারসংগ্রহবাদ (Eclecticism) প্রচলিত হওয়ায় গ্রীক-চিন্তা কোনো প্রকার কলপ্রস্থ হয় নাই।

নব-প্লেতো-পন্থার (Neoplatonism) জন্ম গ্রীস দেশে নহে, পরন্তু বিশবের আলেকজেন্দ্রিয়ায় (Alexendria)। যে সময় মিশরের জ্ঞানী সম্প্রদায় জ্ঞান-জগতে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেন, যে সময় গ্রীসের শিক্ষা-পরিষদ (Official Academy) এবং উহার অধ্যাপকগণ পঞ্চম খ্রীষ্টাব্দের প্রারম্ভকাল পর্যন্ত গুরুত্বহীনতা (Insignificance) দোষে ছুট হয়, ঐক সেই সময়

১। Fall and Decline of Roman Empire, Gibbon.

২। Encyclo. of Religion and Ethics.

এই বিদ্যালয় প্লতিনাস-সম্প্রদায় অথবা ইএমব্লিকাশ (Iamblicus) সম্প্রদায়ের অধিকারে আইসে এবং ৫২০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত নব-প্লেতো-পন্থী হয়। নব-প্লেতো-পন্থী সম্প্রদায় সুদীর্ঘ আটশত বৎসর ধরিয়া গ্রাস-দেশে এই দর্শনের অধ্যাপনা ও প্রচার করেন। এই সময় হইতে প্লতিনাস ও তাঁহার শিষ্য পরফিরি (Porphyry) এবং ইএমব্লিকাশ (Iamblicus; “প্লেতো-পরিষদের সভ্য” (Academician) নামের পরিবর্তে নব-প্লেতো-পন্থী (Neoplatonist) নামে পরিচিত হন।

এই সময় পূর্ব এবং পশ্চিমের জ্ঞান-চিন্তা ও ভাবধারার সম্মেলনে আলেকজেন্দ্রিয়ার (Alexendria) বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্য ফুটিয়া উঠিয়াছিল; এসিয়ার জ্ঞান-বিজ্ঞান-চিন্তা-ধারা এই সময় জ্ঞান-রাজ্যের শীর্ষদেশে অধিরোধণ করিয়াছিল। ভারতীয়গণ যে জ্ঞান-রাজ্যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, ফিলসট্রেতাস (Philastratus), পরম শ্রদ্ধাভরে উহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ য্যাপলোনিয়স (Apalloneus) ভারতীয় জ্ঞান-চিন্তা-ধারার সহিত পরিচিত হইবার জগুই ভারতবর্ষে আগমন করেন। প্লতিনাস (Plotinus) জ্ঞানার্জনের জগুই রোমান সৈন্তসহকারে পারশ্ব দেশে উপস্থিত হইলেন; যখন তাঁহার সৈন্যগণ ধনরত্ন লুণ্ঠনে ব্যস্ত, সে সময় তিনি জ্ঞান-রত্ন আহরণে ব্যস্ত। কাজেই বলিতে পারা যায় যে, নব-প্লেতো-পন্থার মধ্যে প্রাচ্য প্রভাব যথেষ্ট ছিল। এই মতবাদ যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দর্শনের সমন্বয় কল, তাহা অকুতোভরে বলা যায়।

শহরস্তানী লিখিত বিংশতি কলসকার মধ্যে নিম্নলিখিত চারিজনকে নাম ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে। যথাক্রমে, ইহাফিগের নাম :—

(১) অল-কিন্দী, (২) অল-ফারাবী (৩) আবুসিনা ও (৪) ইবনে রোশদ। অল-কিন্দী গণিতবিদ ও জ্যোতির্বিদ হিসাবেই সুবিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার সময়ে গ্রীক দর্শনের পুঁথি অল-কিন্দী যেমন দুস্তাপ্য ছিল, সংগ্রহ করাও তেমনি কঠিন ছিল। তিনি অমুসন্ধিৎসু ছাত্রের মত যতগুলি পুঁথিসংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন, তাহারই অনুবাদ করেন। ইসলাম-জগতে গ্রীক-জ্ঞান-বিজ্ঞান প্রচারের জন্ত তিনি জীবন উৎসর্গ করেন। অশেফাকৃত পরবর্তী গ্রীক দর্শনের পরিভাষায় 'সংগ্রাহক'-মাত্র হইলেও, অল-কিন্দী পিথাগোরিয় গণিত-বিজ্ঞানকে সকল বিজ্ঞানের ভিত্তি-স্বরূপ মনে করিতেন এবং তিনি নব-প্লেতো-পস্থিগণের ধরণে প্লেতো ও আরিস্তোতলের মতবাদ সম্মিলিত করিবার চেষ্টা করেন। কেবলমাত্র জড় বিজ্ঞানেই যে তিনি গণিত প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন তাহা নহে, পরন্তু ভৈষজ্য-বিজ্ঞানেও—অর্থাৎ ভেষজ-সমূহের মিশ্রণ-তত্ত্বেও—উহার প্রয়োগ-সাক্ষ্য স্বীকার করিতেন। উষ্ণতা, শৈত্য, শুষ্কতা ও আর্দ্রতা ভেদে দৈহিক গুণগুলির জ্যামিতির অনুপাতে সংমিশ্রণ, ভেষজ-সমূহে কি ভাবে ফলের তারতম্য ঘটায়, তাহার তিনি বিশদ ব্যাখ্যা করেন; এইজন্ত প্রতীচ্য দার্শনিক কারভান, তাঁহার চিহ্নিত বারোজন কুশাগ্র-বুদ্ধি ব্যক্তির মধ্যে অল-কিন্দীকেও অন্যতম বলিয়া ধরিয়াছিলেন।

প্রধানতঃ জড়বিজ্ঞানবিৎ হইলেও ইনি আত্মা ও মেধার ধর্মও আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মতে এই দুঃশ্রম বিদ্যা-জগৎ কোনো এক বাহ্যিক ক্রিয়াশীল কারণের কাছা; এই কারণ—ঐশী মেধা—উর্দ্ধ হইতে বিচিরিতভাবে জগতে সঞ্চারিত হইতেছে। ঈশ্বর ও জড়-জগতের মাঝখানে আত্মার জগৎ বিद्यমান, আর ঐ আত্মার জগৎই

জ্যোতিষমণ্ডলের স্রষ্টা। মানবাত্মা বিখাত্মা হইতেই উদ্ভূত, এবং যে পরিমাণে ইহা দেহের সহিত সংশ্লিষ্ট সে পরিমাণে ঐ জ্যোতিষমণ্ডলীর প্রভাবের অধীন। কিন্তু আত্মিক উৎস ৬ সত্তার দিকে সে স্বাধীন; কারণ একমাত্র জ্ঞানের অগতেই স্বাধীনতা ও অমরতা বিরাজমান।

সে যাহা হউক, মোটের উপর বলিতে পারা যায় যে, অল-কিন্দীই প্রকৃতপক্ষে আরব-দার্শনিক মতবাদের (Arab Scholasticism) প্রকৃত জনক। (১)

অল-ক্যারাবী দার্শনিক আবু-সিনার আবির্ভাবের পূর্বের দার্শনিক। অল-ক্যারাবীই প্লেতো ও আরিস্তোতলের দর্শনের সর্বপ্রধান টীকাকার ছিলেন। তিনি টীকা রচনায় একপ গভীর পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছিলেন যে, তৎকালে অল-মওয়ালীন অল-সানী”

অল-ক্যারাবী (দ্বিতীয় আচার্য) অর্থাৎ প্রথম আচার্য

আরিস্তোতলের উত্তরাধিকারী নামে ভাষ্যভাজন ছিলেন। গ্রায়শাস্ত্রে তিনি আরিস্তোতলের মত অনুসরণ করেন। প্লেতো যে রূপ পরিবর্তনশীল এবং নিত্যবস্তুর পার্থক্য বিচার করেন, অল-ক্যারাবীও তদ্রূপ যাহা সম্ভব হইতে পারে এবং যাহার সম্ভা আছে, এতদুচ্চের পার্থক্য বিচার করেন। তিনি যে কেবল গ্রীক দর্শনের ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহা নহে, তাঁহার প্রতিভা মৌলিক গবেষণাতেও নিযুক্ত হইয়াছিল। তিনি মনোবিজ্ঞান ও অধ্যাত্মবিজ্ঞান সম্বন্ধেও কতকগুলি গ্রন্থ রচনা করেন।

অল-ক্যারাবী এই মত পোষণ করিতেন যে প্রাচীন দর্শন-রাজির মধ্যে একটি মঠিক্য থাকি আবশ্যক -অন্ততঃ উহার বিশিষ্ট

প্রতিভু-যুগল প্লেতো ও আরিস্তোতলের মধ্যে, পরস্পর বিরোধ অবাহনীয়। তাঁহাদের চিন্তাধারা একই সত্যে উপনীত হইবার দুইটি বিভিন্ন প্রকাশভঙ্গী ব্যতীত অন্য কোনোরূপ হওয়া উচিত নহে। এরূপ মত বর্তমানে বিন্দ্বয়কর, এমন কি উদ্ভট মনে হইলেও, প্রাচ্য-দার্শনিকগণের সর্ব-সমন্বয়-প্রবণতাকেই (Syncretism) ইহার কারণ বলা যাইতে পারে। এই মত মূলতঃ প্রাচীনকালের তাবৎ জ্ঞানী-মণ্ডলীকে যেন ত্রিকালজ্ঞ মহাপুরুষরূপেই গণ্য করিতেছে, এবং বলিতে চাহিতেছে যে তাঁহারা সকলেই ধর্মাচার্যের মত 'ইমাম' আখ্যায় অভিহিত হইবার যোগ্য ও তাঁহাদের প্রার্থ্য ঈশ্বরেরই আদেশ বাণী, বাহাতে ভ্রম প্রমাদ ও মতবৈতের স্থান নাই।(১)

আবু-সিনা আরিস্তোতলের মতবাদের প্রকৃত প্রচারক ছিলেন। অব্যাক্সান্ডের (metaphysics) জ্ঞান তিনি অল-ক্যারাবীর নিকট

আবু-সিনা ঋণী ছিলেন। দার্শনিক অল-কিন্দী ও অল-

ক্যারাবী আরিস্তোতলের দার্শনিক মতবাদের যে বাখ্যা ও টীকা প্রচার করেন, উহা অস্পষ্ট ও অনুব্যক্ত হওয়ার সর্বসাধারণের বোধগম্য হয় নাই। আবু-সিনা উহাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সর্বোৎকৃষ্ট করিয়া উহার অনবচ্ছিন্ন রূপ দান করেন। আবু-সিনার মূল্যবান ব্যাখ্যা অনুসন্ধিস্থ ও জ্ঞান-পিপাসুর জ্ঞানলাভের পথ উন্মুক্ত করিয়া দেয়।

আবু-সিনা গ্রাযশাস্ত্রকে সকল বিজ্ঞানের মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর বিজ্ঞান বলিয়া উচ্চাসন দিয়া গিয়াছেন। গ্রাযশাস্ত্রকে তিনি নয় ভাগে বিভক্ত করেন। আরিস্তোতলের আটখানি পুস্তকের সহিত আবু-

সিনার গ্রাফশাস্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন অংশের সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। আবু-সিনা রহস্যবাদী (mystic) ছিলেন কি না, বলা বড় কঠিন। কেন না তিনি নব-প্লেতো-পন্থিগণের মত রহস্যবাদকে (mysticism) দর্শনশাস্ত্রের অংশ বলিয়া স্বীকার করিতেন। ইবন তুফারেল বলেন, আবু-সিনার প্রকৃত মূর্তি, তাঁহার “হিকমত-অল-ইসরাক” দর্শন গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায়। শুরওহুর্দাঈ অল-মকতুল বলেন, এই মতবাদই আবু-সিনার নিজস্ব এবং উহাই নব-প্লেতো-পন্থার নামান্তর।

আবু-সিনার পর ইবনে রোশদ “ফলসফা”-রূপে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। ইনিও পূর্ববর্তী দার্শনিকগণের মত মূল গ্রীক অধ্যয়ন করিয়া আরিস্তো-তলের গ্রন্থাবলীর টীকা ভাষ্য ও অনুবাদ প্রচার করেন। এই কার্যে ইবনে রোশদের এরূপ কৃতিত্ব পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা প্রকাশিত হয় যে, তিনিও অল-ফারাবীর মত তৎকালে কর্ডোভা শহরে “দ্বিতীয় আরিস্তোতল”-রূপে প্রসিদ্ধিলাভ করেন। উপরোক্ত চারিজন ফলসফার মধ্যে আবু-সিনা ও ইবনে রোশদ মৌলিক চিন্তাশীল (free thinker) ছিলেন। ইসলাম-জগতে দর্শনশাস্ত্র বড় আদৃত ছিল না। দর্শনের ঈশ্বরবাদ কোরানের মতের বিরুদ্ধ, সেই কারণে তৎকালীন ফকিহ (ধর্মতত্ত্ববিদ)-গণের সহিত ইহাদিগের দার্শনিক ও মৌলিক চিন্তাবাদের সংঘর্ষ উপস্থিত হইয়াছিল। ইহার ফলে ফকিহ অল-গাজ্জালী ইহাদিগের মতবাদের বিরুদ্ধে এক গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থ আজিও ইসলাম-জগতে সম্মানিত।

আবু-সিনা ষে রূপে উচ্চ শ্রেণীর দার্শনিক ছিলেন, তাহাতে তাঁহার সমকক্ষ তৎকালে কেহই ছিল না। চিকিৎসা-বিজ্ঞান-ক্ষেত্রে ষে রূপে অপ্রতিদ্বন্দ্বী, দর্শনের ক্ষেত্রেও তদ্রূপ তুলনা-রহিত হইয়া সর্বশ্রেষ্ঠ

দার্শনিক (Prince of philosophers) আখ্যায় অভিহিত হইয়া ছিলেন। কিন্তু তাঁহার দল বা সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার সমতুল্য দার্শনিকের আবির্ভাব না হইলেও এক্ষেত্রে তাঁহার উপযুক্ত শিষ্য ওমর খৈয়ামের নামোল্লেখ করিতে পারা যায়। খৈয়ামই প্রকৃতপক্ষে মুসলিম সম্প্রদায়ের জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাধনার অমৃতময় ফল। ওমর যে যুগে জন্মগ্রহণ করেন, উহা জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ ছিল। তিনি এই যুগ-সঙ্কীর্ণক্ষেত্রে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার পূর্ববর্তী মনীষীদের এবং প্রাচীন ভারত ও গ্রীক জ্ঞান-বিজ্ঞান-চিন্তাধারার উৎস হইতে প্রেরণা লাভ করিয়া জয়যুক্ত হইলেন। কাজেই বলিতে হয়, ওমর খৈয়াম মুসলিম জ্ঞান-বিজ্ঞান-সাধনার অমৃতময় ফল। ওমর ফলসফা সম্প্রদায়ের পরের যুগের দার্শনিক হইলেও, তিনিই তৎকালে পূর্ববর্তী দার্শনিকগণের মত মূল গ্রীক দর্শন গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া গ্রীক-জ্ঞান-প্রতীক হইলেন। তাঁহার চতুঃপদীতে গ্রীক মনীষিগণের বাণীর প্রতিধ্বনি পাওয়া যায়।

দূরাস্থস্বরূপ নিয়োক্ত কবাই-যুগল-উদ্ধৃত হইল—

“যৌবনে মোর আমিও দার্শনিকের যুক্তিটরে
সমুৎসাংহেই বরণ করি’ পুবেছিলাম কদম-নীড়ে ;
ভরু কতই শুনেছিলাম ইহকাল ও পরকালের
হায় রে, সে যে থাকতো পড়েই যে-তিমিরে সেই-তিমিরে ।

•

আমার জ্ঞানের বীজগুলিও উষ্ট তাদের যুক্তি নিয়ে,—
অন্ধুরে তার গজিয়ে তোলা আপন হাতে সলিল দিবে,
সারাজীবন পরিশ্রমে ফসল বা’ মোর—এই তা’ শুধু
স্রোতের মতন এইছি,—যাবো—ঝড়ের মতন সন্সনিষে ।”

‘Republic’ গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে, বিশেষভাবে “Phaedo”-তে প্লেটোর সফ্রেতিস যে রূপ প্রণালী অনুসরণ করিয়াছেন, এখানেও যেন তাহাই অবিকল অনুসৃত হইয়াছে। “Phaedo”-র একস্থানে সফ্রেতিস বলিতেছেন—

“In my youth I had a wonderful desire for the wisdom which people call natural science. It seemed to me a proud thing to know the causes of every matter ; how it comes to be ; ceases to be ; why it is. I lost my sight in this inquiry to the degree of unlearning what I had hitherto seemed to myself and others to know clearly enough.”

লোকে যাকে “প্রকৃতি-বিজ্ঞান” (natural science) বলে, তদ্বিষয় জ্ঞানলাভের ক্ষুধা যৌবনে আমার খুবই প্রবল ছিল ; পদার্থ-সমূহের কারণ-মূল জানিতে পারা আমার বিশেষ গর্বের জিনিস মনে হইত ; কেন ইহারা জন্মে, কেন মরে—কেন এরূপ হয়। কিন্তু এই সকল তথ্যানুসন্ধানের কালে এমন হইল যে যাহা বেশ জানা আছে বলিয়াই ধারণা ছিল, তাহাও ভুলিয়া বসিলাম।

সফ্রেতিস এই সময় এনাক্সাগোরাসের (Anaxagoras) শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। সূক্ষী দার্শনিকগণের দরবারে ওমরের যে অবস্থা ঘটিয়াছিল বলিয়া রুবাই-য়ুগলে প্রকাশ, দেখা বাইতেছে যে সফ্রেতিসের পক্ষেও অবিকল তাহাই ঘটে। বস্তুতঃ, সিদ্ধান্তের একান্ত অভাবই অধিকাংশ প্লেটো-মতবাদ-মূলক প্রদ্রোস্তরের প্রধান বিশেষত্ব—অপরূপক্ষে, সূক্ষীমতবাদেরও এই বিশেষ ধর্মই, ওমরকে উহা আক্রমণ করার বিবিধ সুযোগ প্রদান করিয়াছে। “স্রোতের মত এইছি—যাবো, ঝড়ের মত সনসনিবে”—বুঝিবা Heraclitus-এর “Perpetual Flux”-এরই

মৰ্মাহুসারী। “কিছুই চিরস্থায়ী নয়, সমস্তই চির-গতিশীল”—এই স্বীকৃত বিষয়টি বিশেষভাবে Heraclitus-এরই। প্লেটো স্বয়ং তাঁহার ‘Divine Dialogues’-এর মূলে এই সুর ধ্বনিত রাখার জন্য Heraclitus-এর নিকট ঋণ স্বীকার করিয়াছেন এবং ওমরের কুবাইগুলিতেও যে এই সুরের প্রভাব বারংবার দেখা দিয়াছে, তাহা স্পষ্টদর্শী পাঠকমাত্রেই লক্ষ্য করিবেন। (১)

অতএব ওমর যেখানে বলিতেছেন—

“আছে-কি-নেই বিচার করা দার্শনিকের জ্ঞান-নিকষে,

সারাজীবন ভাসিয়ে চলা বীজগণিতের সূত্র-বশে

ঢের হয়েছে এই জীবনে ; সত্য তবু এই কথাটি

মন মজেনি কোথাও তেমন, যেমন রে এই দ্রাক্ষা-রসে।”

সেখানেও তাঁহার কবি-আত্মা আপন বহুমুখী মনীষা-জনিত যশঃপ্রভা ও জ্যোতির্বিদ-খ্যাতিকেই তুচ্ছ করিয়া প্লেটো-মতবাদেরই সুরে সুর মিলাইয়াছে। প্লেটো অতএব বলিয়াছেন—“He indeed is the wisest of all men who, like Socrates, is aware that he is really worth little or nothing in the way of knowledge—তিনিই যথার্থ জ্ঞানিগণাগ্রগণ্য, যিনি সন্ধেতিসেরই মতো জানেন যে, জ্ঞান-রাজ্যে তাঁহার অধিকার নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর।”

কেহ কেহ এই কুবাইটিকে এই অর্থে ঐশ্বর-প্রেমিকদিগের প্রতি বিদ্রোপাত্মক বলিয়া বুঝিয়াছেন যে, ওমরের মতে, তাঁহাদিগের তন্ময় অবস্থাটি সুরা-বিভোর অবস্থা অপেক্ষা উন্নততর নহে (২);

১। Introduction. Rubai'yyat of Umar Khayyam by]

Edward Heron-Allen. London 1908.

২। Mrs. Batson's commentary.

প্রকৃতপক্ষে, তাহা ভ্রান্ত ধারণা। মূল কবাইটির সরল গজালুবাধ এইরূপ—‘অস্তি’ ও ‘নাস্তি’র ধর্ম আমি জানি, ‘উচ্চ’ ও ‘নীচ’-এর মর্মও আমার অজ্ঞাত নয়, তবু আপন জ্ঞান সম্বন্ধে সর্বিনয়ে এইটুকু বলিতে চাই যে, ও-সকল-জ্ঞানের মূল্য পানমত্ততা অপেক্ষা বেশী নয়।”

পূর্বপ্রচলিত যাবতীয় মতবাদকে গল্পকথা বলিয়া উড়াইয়া দিবার জন্য, ‘স্বাধীন-চিন্তা’র পক্ষ-সমর্থক ওয়র বলিয়াছেন—

ভক্তজনের কথামৃত, ঋষি-গুণের আগু-বাণী,

অকাট্য সব সত্য বলে আমরা যা আজ নিচ্ছি মানি—

গল্প সবই ; ঘুমের ফাঁকে সন্মীজনে বানিয়ে বলে

ঘুমের কোলে পড়তে চলে, গেছেন চলে যতক জ্ঞানী।”

প্লেটোর সফ্রেতিসের উক্তি—“Just now, as in a dream, these opinions have been stirred up within him.—এই সকল মতামত, যেন ঘুমের মাঝখানে স্বপ্নের মতন, তাঁহার মধ্যে জাগিয়া উঠিল”—এই কবাইটির প্রসঙ্গে স্বরণযোগ্য। প্লেটো তাঁহার “Republic” গ্রন্থে “অলীক-দার্শনিকগণের” (Pseudo-Philosophers) অবিশ্বাস-যোগ্য উক্তি ও কলুষপ্রবণতাকে কশাঘাত করিয়া অত্যন্ত বলিয়াছেন—“We find that though they may dream about real existence, they cannot behold it in a waking state, so long as they use hypotheses which they leave unexamined, and of which they can give no account—যদিও বা “সত্য-অবস্থা” সম্বন্ধে স্বপ্ন দেখা ইহাদের স্বভাব, তথাপি সজ্ঞানে ঐ অবস্থা দেখিতে পাওয়া তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব ; কারণ তাঁহাদের তর্কপ্রণালীতে যে সমস্ত অসুস্থমিতি ব্যবহৃত, তাহা একদিকে যেমন অপরীক্ষিত এবং অপর দিকে তেমনি অযৌক্তিক।”

দশম পরিচ্ছেদ

দার্শনিক ওমর থৈয়াম

বিষয়-নিচয়ের প্রণালীবদ্ধ ও যুক্তি-শাসিত জ্ঞানই দর্শনশাস্ত্রের উপাদান। যখন আমরা এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তাৎব বস্তু নিরীক্ষণ করি, তখন স্বভাবতঃই মনে প্রশ্ন আগে—ইহারা কি, অজ্ঞতার দার্শনিক তত্ত্ব কেমন করিয়া আসিয়াছে, কোন্ প্রণালী অনুসারে ইহাদিগের ভিন্ন ভিন্ন আকার সম্ভব হইয়াছে? ইহাদিগের স্রষ্টা কে? কোন্ উপাদানে ইহারা গঠিত? ইহাদের প্রকৃতি কিরূপ? ইহারা বিচ্ছিন্ন ন পরস্পর সম্বন্ধ? ইহাদের বিশেষ বিশেষ রূপে বিকাশ আকস্মিক—না তদ্ব্যেথা কোনো শৃঙ্খল বিরাজমান? যদি শৃঙ্খলা থাকে তবে উহার হেতু কি, প্রকারই বা কিরূপ? এই সকল প্রশ্নের উত্তরের জন্যই দর্শনশাস্ত্র দায়ী।

এখন কথা এই যে, বিষয়-নিচয়ের স্বরূপ ও স্বার্থ প্রকৃতি সম্বন্ধে নিশ্চিত জ্ঞান সম্ভব কি না? সাধারণতঃ দার্শনিকেরা বলেন যে, উহা সম্ভব। কিন্তু এমন খ্যাতনামা দার্শনিকও আছেন, যাহাদের মতে বস্তু-শাস্ত্রেরই স্বরূপ জ্ঞাত হওয়া অসম্ভব। হার্বার্ট স্পেনসার (Herbert Spencer) বলেন—“আমাদের চেতনাক্রিয়ের যেমন একটি নির্দিষ্ট দিক আছে, তেমনি একটি অনির্দিষ্ট দিকও আছে; আর ঐ অনির্দিষ্ট দিকের কোনো সংজ্ঞা নির্ধারণ চলে না।”(১) ইহা হইতে আমরা বুঝি যে, এমন বস্তু আছে বাহার প্রকৃতি মানব-জ্ঞানের অধিগম্য; আবার এমন বস্তুও আছে বাহার স্বরূপ জানাতীত—অর্থাৎ এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যে শক্তির আভ্যন্তর

তাহা সম্পূর্ণরূপেই অবিগ্ৰেয্য। প্রসিদ্ধ জার্মান-দার্শনিক শোপেনহায়ারের (Schopenhauer) মতে বিষয়-নিচেষ্টে স্বরূপজ্ঞান একপ্রকার অসম্ভব বলেলেই হয়—আর ওমর খৈয়ামেরও দার্শনিক মতামত এই শ্রেণীর।

বস্তুতঃ, আমাদের জানা জিনিসও বুঝিবা আমরা ঠিক জানি না। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একটি ‘আতা’কে পরীক্ষা করা যাক :—

আমাদের বিশ্বাস, জিনিসটি আমাদের সুপরিচিত ; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহার কতটুকুই বা আমরা জানি ? শুধু এইটুকু আমাদের জানা আছে যে, আতার একটি নির্দিষ্ট আকার, গন্ধ, বর্ণ ও স্বাদ বিद्यমান। এগুলি অবশ্য গুণাবলী মাত্র, এবং দর্শনশাস্ত্রোক্ত জ্ঞানের ‘ব্যাপ্তি’-পর্যায়ভুক্ত ; ইহাদের কোনটিই আতার শরীর হইতে পৃথকভাবে দৃশ্যমান বিশেষ বস্তু নহে। আতা বলিতে আমরা যাহা বুঝি, তাহা এইসকল গুণাবলীর একত্র সমাবেশ মাত্র। অপরপক্ষে, আতার স্বরূপ-নির্ধারণে আমরা অসমর্থ।

যখন আমরা বস্তু-বিচারে প্রবৃত্ত হই, তখন কার্য-কারণ-সম্বন্ধীয় তথ্যের প্রয়োগ করি—কিন্তু বিচার যতই অগ্রসর হইতে থাকে, ততই উহার উপর আস্থা কমিতে থাকে, এবং অবশেষে দেখি যে কারণ-সম্বন্ধে কিছুই জানিতে পারা যায় নাই। উপর হইতে সকল বস্তুই মাটিতে পড়ে ; গ্রীক দার্শনিকগণ মনে করিতেন যে, এই ঘটনা কেন্দ্রীয় শক্তিরই ফল, এবং মাটিই ঐ সকল বস্তুর কেন্দ্র। নিউটন আবিষ্কার করেন যে উক্ত ধারণা ভুল, এবং দেখান যে প্রত্যেক জড়দেহেরই আকর্ষণ শক্তি আছে এবং পৃথিবী বিরাট বলের হওয়াতেই ক্ষুদ্রতর বস্তুসমূহকে আকৃষ্ট করে। কিন্তু এই মাধ্যাকর্ষণের অস্তিত্ব ছাড়া অপর কিছুই আমরা জানি না। বস্তুমাত্রেরই কেন এই আকর্ষণ-শক্তি বিद्यমান? এ প্রশ্ন আজও অসাম্যাসিতই থাকিয়া গিয়াছে ; একটি রহস্য উদ্ঘাটন কল্পিবামাত্র

আমরা অপর একটি রহস্তের সম্মুখীন হই—একটি গ্রহি খুলিতেই দেখি অপর একটি গ্রহি আমাদের অপেক্ষায় রহিয়াছে। সত্যের রহস্ত-উন্মোচন দার্শনিকের অসাধ্য, কেননা যে রহস্তের মীমাংসায় সে প্রবৃত্ত হয়, সেইটিই শেষে অগ্নি এক রহস্ত হইয়া দাঁড়ায়।

বহু দূরদর্শী দার্শনিকগণ অবশেষে স্বীকার করিয়াছেন যে তাঁহাদের স্বসামান্য জ্ঞানই—যাহাকে অজ্ঞতারই নামান্তর বলা চলে—যাবতীয় প্রকৃত দার্শনিকতার মূলস্থ। সক্রেতিস তাঁহার জীবনব্যাপী অভিজ্ঞতার পর স্বীকার করিতে বাধ্য হন যে, ‘এইটুকু মাত্রই তিনি জানিয়াছেন যে কিছুই তিনি জানিতে পারেন নাই।’ অপর কথায়, আংশিক জ্ঞান ও সামগ্রিক অজ্ঞতাই এই স্বীকারোক্তির তাৎপর্য। ওমর খৈয়ামও ঐ ‘চরম অজ্ঞতা’ স্বীকার করিয়াছেন এবং আপন প্রচার্যরূপে গ্রহণ করিয়াছেন :—

“দেখলু সে এক রুদ্ধ দুয়ার, গেল না তা’র চাবিই পাওয়া ;

দুলাছে কি এক কুহেলী-জাল ভিতরে যা’র যায় না চাওয়া ;

মুহূর্তকাল ভোমায় আমায় একটি দু’টি কণিক কথা—

তাহার পরে—‘তুমি’—‘আমি’ নিব্বদ্দেশেই তলিয়া যাওয়া।”

চাবি পাওয়ার অর্থ, অবশ্যই অজ্ঞাত রহস্তের আবরণ মোচন। এই আবরণ মুক্ত হইলে মানুষ্যের পক্ষে সেই গুহাভীত সত্যের জ্ঞানলাভ সম্ভবপর—বাহ্য অনাদি অনন্ত। ইহার ফল এই হইবে যে জ্ঞানী বিশ্ব-বিশুদ্ধ, বাহ্যজ্ঞানশূন্য, বিবেক বুদ্ধিহারা ও মোহন হইয়া মানবত্ব হইতে সম্পূর্ণ অগ্নরূপ না হইয়া পারিবে না। এইজন্যই—“ভগবান মুসাকে বলিলেন, যাও, মানুষ্যকে সাবধান কর, অগ্রথা তাহারা আবরণের ভিতর দিয়া ভগবানের পানে চাহিবে, কলে অনেকেই ধ্বংস হইবে।”(১)

“উভয় দলেই,—চরম আনে বাহারা এই বর্তমানে
কিনা যারা তাকিয়ে আছে ভবিষ্যতের মুখের পানে—
অন্ধকারের অসীম হ’তে কণ্ঠ সে এক বলছে ডাকি,

‘মূৰ্খ’! তোমাদের পারিতোষিক নেই ও দু’য়ের কোনোখানে।”

এখানে ওমরের দার্শনিক-আত্মা বলিতে চাহিয়াছে যে, মৃত্যুর পরপারে কোন্ ভাগা আমাদের প্রতীক্ষায় আছে তাহা কেহই নিশ্চয় করিয়া আনিতে পারে নাই। যে কেহ ইহজগৎ ছাড়িয়া অতৃতর লোকে যায়, সে আর লোকান্তরের সংবাদ লইয়া ধেরে না। অপর কথায়, লোকান্তর সম্বন্ধে সর্বপ্রকার জ্ঞানের অসম্ভাব্যতাই এখানে ওমরের প্রচারণা। মৃত্যুর পরপারের জীবন বা গরিমাময় অবস্থার উল্লেখ করিয়া বাহারা নিশ্চয়াত্মিক বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, ওমরের উক্তিকে তাঁহাদের প্রচারণার বিরুদ্ধবাদ হিসাবে গ্রহণ করা চলিতে পারে।

বর্ণ আমার, গন্ধ আমার, মন-ভোলানো,—নিলাম মানি’,
লতার মতন তরুর গঠন, ফুলের মতন আননখানি ;
শিল্পী তবু কিসের লাগি’ এই ভুবনের প্রমোদ-বনে
হৃজন মোরে করেছিলেন—এই কথাটি নাহি জানি।”

দেখা যাইতেছে, ওমরের দার্শনিক-দৃষ্টি কারণ-নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়াছে। আমাদের চারিদিকে অসামান্য রূপরশি, অনবন্ত গঠন-সৌকুমার্য,—কিন্তু তাহা চিরস্থায়ী নয়, বিবর্ণ ও মরণগ্রস্ত হইবার জ্ঞাত। এ হেন পরিণাম লাভার্থ এত সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করায় ভ্রাতার কোন অভিপ্রায় সাধিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে বহু চিন্তার ফলে ওমর এইমাত্র সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, একমাত্র স্রষ্টা ব্যতীত অপর কেহ সৃষ্টির তাৎপর্য্য নির্ধারণে অক্ষম।

মানুষ ভাবে যে, জীবনের রহস্য সম্বন্ধে তাহার অভিজ্ঞতা খুবই বিশদ,

অথবা মৃত্যু সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান ও সৃষ্টির মধ্যে উহার স্থান প্রদানে ভগবানের উদ্দেশ্য খুবই স্পষ্ট। থৈয়াম আমাদের সাবধান করিয়া দিয়া বলিতে চান যে, আমরা যাহাকে জীবনের অভিজ্ঞতা মনে করি, তাহা প্রকৃতপক্ষে কুবিচার-দুষ্ট গণনা ও স্বকপোল-কল্পিত সিদ্ধান্তের বলে উপর কতকগুলি ভ্রান্তির সমষ্টিমাত্র। আপনাদিগকে চিন্তাশক্তি ও বিচারশক্তির অধিকারী এবং স্বাধীনেচ্ছাশক্তিসম্পন্ন মনে করা সত্ত্বেও, এই জীবনের স্বার্থ প্রকৃতি সম্বন্ধে একদিকে যেমন আমরা অজ্ঞ, অপরদিকে যেইরূপ পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধেও জ্ঞানহীন। এ সকল বিষয়ে জোর করিয়া কিছু বলা আত্মপ্রতারণারই নামান্তর; কারণ, জীবন যে কি, তাহা অগৎ সৃষ্টি হওয়া অবধি আজ পর্য্যন্ত কেহই নির্ণয় করিতে পারে নাই। ঘটনা যখন এই, তখন মৃত্যু-রহস্য-সম্বন্ধে মতামত প্রকাশ যে আরও শোচনীয়, তা'হা বলাই বাহুল্য। এইজন্তই বুঝিবা পরমজ্ঞানী সক্রেতিস মৃত্যু-মুহূর্ত্তে বলিয়াছিলেন—‘বিদায় নেবার দিন ঘনিষে এসেছে; আমি চলেছি মরণের পথে আর তুমি জীবনের; কিন্তু এতদূরত্বের কে যে উন্নততর অবস্থার দিকে যাচ্ছে তা’ এক ভগবান ছাড়া অন্য কেহই বলতে পারে না।’(১)

তবে কি সক্রেতিসের মতে ‘অজ্ঞতা’-রত্নই সকল অধেষণের চরম পুরস্কার ও পরম জ্ঞান? অপরপক্ষে, ওমর-দর্শনের প্রতিপাতও কি তবে ঐ অজ্ঞতা-পরিণামাত্মক? এ সিদ্ধান্তের অর্থ কি তবে এই যে, নির্বোধ ও অজ্ঞ লোকেরাই স্বার্থ দার্শনিক পরবাচ্য?

অবশ্যই নয়। সক্রেতিসকে যখন লোকে বলিল যে তিনিও যেমন কিছুই জানেন না তাহারো তেমনি কিছুই জানেন না; অতএব তাহার

ও ঐ সকল লোকের মধ্যে কোনো স্পষ্ট ও সুবোধ্য প্রভেদ নাই। “এইটুকু যাত্র প্রভেদ”—উত্তরে তিনি বলিলেন—“যে ‘কিছুই জানি না’ ইহা আমার জ্ঞাত, কিন্তু ‘কিছুই যে জানি না’ এ সত্যও তোমারা অবগত নও।”

জ্ঞান বিবিধ—অন্ধ ও যুক্তি-প্রতিষ্ঠা। একজন অজ্ঞ ব্যক্তি, ঠিক দার্শনিকেরই অরূপ, সূর্য্য চন্দ্র ও জাগতিক অগাধ পদার্থের পার্থক্য বুঝিতে পারে—কিন্তু সে বিষয়সমূহকে জানে অন্ধভাবে, অপরপক্ষে দার্শনিক জানেন যুক্তির আলোকে ও ধারাবাহিকভাবে। একজন কৃষক ভূমিজাত শস্ত-কসলাদিকে চেনে, এবং একজন কৃষি-বিজ্ঞানবিদও তাহা চেনেন; কিন্তু এই উভয়ের জ্ঞানর মধ্যে ব্যবধান স্পষ্ট ও প্রচুর। ‘অজ্ঞতা’র জ্ঞান স্বত্বও ঠিক এটরূপ। দার্শনিকের চিন্তামূকুরে ঐশ্বর্য্যশস্ত যেমন স্পষ্টতঃ অনবিগম্য, অজ্ঞ ব্যক্তির নিকটেও সেইরূপ; কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে বুদ্ধি-বিপ্লব প্রভেদ প্রচুর।

ঐশ্বর্য্য তাঁহার অজ্ঞতাকে গর্বেরই বিষয় মনে করেন, অথচ উচ্চ-কণ্ঠে জানান ‘যে, অজ্ঞতার এই পরম-অভিপ্রের্ত-স্তর সকলের পক্ষে সুলভ নহে।

“সংজ্ঞাহীন তুমি সত্য—নহে তবু হেন সংজ্ঞা হারা।

যাহারাই সংজ্ঞাহীন এ অবস্থা নাহি পাষ তারা।”

কিন্তু দার্শনিক-নির্দিষ্ট এই ‘অজ্ঞতার, সত্য-মিথ্যা যাচাই করা আমাদের অতিপ্রের্ত নয়; তথাপি উহার ফলাফল লক্ষ্য করার লাভ আছে। এই অজ্ঞতা-গর্ভ দার্শনিকতাই বাবতীয় গবেষণা, অন্বেষণ অরুসন্ধিসা ও স্বাবিকারের উৎস ও শক্তি-কল্প। যদি আমাদের পদার্থ-বিভাগে চরম বলিয়া ধরিয়া লই, অথবা যদি মনে করি যে আমরা যাহা জানিয়াছি তাহাই সম্পূর্ণ ও সংশয়লেশহীন, তাহা হইলে ভবিষ্যন্দের

অশ্রু অসুস্থান বা গবেষণার প্রয়োজন একেবারেই থাকিয়া যায়। কার্যতঃ, অজ্ঞতার দর্শনই আমাদের দ্রবতারা এবং এই অজ্ঞতা সফলীয় চৈতন্য আমাদেরকে বিবর্তনের পথে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করে। খৈয়াম একদিকে আমাদেরকে যেমন এই ‘অজ্ঞতার’ দর্শনে দীক্ষিত করেন, অপর দিকে তেমনি নূতন আলোক ও নূতন চিন্তার রাজ্য আবিষ্কারেও পরিচালিত করিতে চান। তাঁহার কথা :—

“মত্ত হলে নারীর তৃষ্ণায় কিম্বা বিলাস অধেষণে,
 ক্ষিরতে হবে ভরা ডুবি,—এই কথাটি রেখো মনে ;
 ‘কে তুমি’ ? তা’ বুঝিতে শেখো ; এলে হেথায় কোথেকে সে
 ‘করছো বা কি ?’ ‘যাবে কোথায় ?’ ভেবো বসে ক্ষণে ক্ষণে।”

স্মৃতিকাগার হইতে সমাধি-মন্দির পর্যন্ত প্রসারিত মানব-জীবনের অপরিহার্য অংশটুকু যে করটি মহা সমস্তার সহিত বিশেষভাবে জড়িত, সেইগুলি তিনি সর্বাত্মেই সর্বসমক্ষে তুলিয়া ধরিয়াছেন—বেন না ইহারই মীমাংসার চেষ্টায় বিচিত্র পথের স্রষ্টি সম্ভবপর।

অদৃষ্টবাদ উদ্বেগী পুরুষসিংহেরা গ্রাহ্য করিতে পারেন না।

অদৃষ্ট ও পুরুষকার তাঁহাদের মত উহা কুসংস্কার, এমন কি

পরিত্যজ্য—কারণ, স্মৃতিঃ চেষ্টা করিয়া তাঁহারা

যে কাজ করিয়াছেন তাহা যথার্থই স্বাধীন চেষ্টার ফল নয়, পরন্তু যে

সকল অদৃষ্ট কারণের উপর তাঁহাদিগের কোনো হাত নাই তাহাদেরই

যোগাযোগে নিম্পন্ন হওয়া সম্ভব হইয়াছে, এরূপ মনে করায় কেন

আপনাকেই কাকি দেওয়া হয়। “চেষ্টা থাকিলেই উপায় হবে” “ন হি

সুপ্তস্ত সিংহস্ত এবিশন্তি মুখে বৃগাঃ” প্রভৃতি বাকীই এই পুরুষকার-

বাদীর বুদ্ধান্ত। অপর পক্ষ বলেন—কোনো একটি ঘটনা যখন ঘটে,

তখন বিশ্ব-বিধানে এমন সমস্ত অবস্থার স্বতঃই স্রষ্টি হয়, যাহাতে ঐ

ঘটনাটি ঘটাইবার উপযোগী কারণসমূহ দেখা দেয়। বস্তুতঃ মানুষ অসহায় এবং কোনো কাজ করার পক্ষে তাহার ইচ্ছাশক্তির মূল্য এই সকল কারণের সম্পর্কে নিতান্তই অকিঞ্চিংকর। ইহাদের মতে, 'ইচ্ছামৃত্যু' ব্যক্তির মৃত্যু-ইচ্ছার উদ্বেকটুকু পর্য্যন্ত তথাকথিত কারণ ও অবস্থার অধীন।

এই অদৃষ্টবাদীদের একটি বিশিষ্টতা লক্ষ্যস্থানীয়। অত্যাধিকার্য্য করিলে শাস্তি পাইবার সম্ভবনা বিষয়ে তাহার সচেতন, সুতরাং সম্মত। এই শাস্তির ভয় অল্লাধিক পরিমাণে উভয়পক্ষেই থাকিতে পারে—তবে প্রভেদ এই যে, পুরুষকারবাদীরা তাহাদের কৃত অত্যাধিকার্য্য সম্বন্ধে মানিয়া লইয়া যথাবিহিত শাস্তি গ্রহণ করিতেই প্রস্তুত হয় ; অপরপক্ষে, অদৃষ্টবাদীরা এই বিশ্বাসকে আশ্রয় করিয়া সাধুনা লাভ করে যে, যাহা ঘটা অবশ্যসম্ভাবী তাহাই ঘটিতেছে বা ঘটে। পুরুষকার-পন্থীরা যেন বা গোটেরই (Goethe) ভাবোদ্দীপনী মন্ত্রস্পৃষ্ট ; আর অদৃষ্টবাদীরা দিমোক্রাইতাস (Democritus), এপিকিউরাস ; (Epicurus) ওমর খৈয়াম ও অস্কার ওয়াইল্ডেরই (Oscar Wilde) স্বগোষ্ঠীর লুক্রেসিয়াসের (Lucretius) প্রকৃতিবাদপন্থী।

মানুষ যখন প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ ও আগতিক ঘটনা-পরম্পরার বিষয় গভীরভাবে চিন্তা করিতে বসে এবং মনন-শক্তির সাহায্যে বস্তুর যথার্থ প্রকৃতিটি খুঁজিতে চেষ্টা করে,—তখন স্বভাবতঃই সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, এই বিরাট বিশ্বশক্তির, অপরকথায় ভগবৎ-বিধানের, সাহায্যে সে একান্তই অসহায়। এই শক্তিসমূহের ক্রিয়ার বিরুদ্ধাচরণ যেমন তাহার সাধ্যাতীত, সেইরূপ আপন জীবনধারণের জগৎ সাধারণতঃ যাহা আবশ্যক তাহাও পরিবর্তনে সে অসমর্থ। একজন নিয়ামক যে আছেন তৎসম্বন্ধে এই দৃষ্টমান বিশ্বই তাহার নিকট এক জীবন্ত দৃষ্টান্ত।

এই ধারণা ও আনুমানিক অজ্ঞাত চিন্তা, সুস্পষ্ট সত্যের আভাস-প্রদানে, যখন তাহার আত্মশক্তিবোধকে অবসর করিয়া কেনে, তখন সে বিশ্বাস করিতে বাধ্য হয় যে, মানুষের প্রচেষ্টা, মানুষের শক্তি ও প্রাপ্তির সীমা আছে,—পরন্তু বিশ্বজগতের যাহা-কিছু, সমস্তই এক “সকল ঈশ্বরের পরম ঈশ্বর” কর্তৃক শাসিত। ওমর খৈয়ামের পক্ষেও এই অবস্থাই ঘটিয়াছিল, এবং সমস্তকেই ঐ অনাদি-অনন্ত-পরমাশ্রয়-ঐশীশক্তিতে আবোধ করিয়া তিনি মানুষকে তাহারই সৃষ্টির মধ্যে এক শালন বিনম্র অসহায প্রাণিরূপে দেখিয়াছিলেন।

পুরুষকার-পন্থীরা বলিবেন যে ভগবান তাঁহাদিগকে কোনো কার্য করা না-করা সম্বন্ধে প্রভূত শক্তির অধিকারী করিয়াছেন, অতএব সে আপন ইচ্ছানুযায়ী অনুষ্ঠান করিবার বিষয়ে সর্বতোভাবে স্বাধীন। কিন্তু এখানে প্রায়ই একটি মারাত্মক ভুল ঘটে। মানুষ যে কাজ করিতেছে বা করিতে পারে বলিয়া মনে হয়, তাহার উপর প্রকৃতপক্ষে মানুষের কোনো হাত নাই। এমন অবস্থার সৃষ্টি হইতে পারে, যাহাতে ইচ্ছা বা শক্তিসত্ত্বেও সে অভীক্ষিত কর্ম করিতে পারে না,—সুতরাং পরিণামে সম্পূর্ণভাবেই অদৃষ্টনির্ভরশীল হইয়া পড়ে। এখানে অবশ্য স্মরণ রাখা দরকার যে, ঐরূপ সংঘটন মানুষকে তাহার করণীয় বা দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি দেয় না! এ সমস্তার সরল নিরাকরণ এই—“কর্তব্য করিয়া যাও—ফলাকল ঈশ্বরেই অপিত থাক।”

ওমর খৈয়াম অদৃষ্টবাদী হইলেও, ইচ্ছাশক্তির অনুশীলন-সম্বন্ধে বারবার আমাদিগকে সতর্ক করিয়াছেন, দুঃখের জগতে যতদূর সম্ভব সুখের সৃজন করিবার জন্য উৎসাহিত করিয়াছেন, এবং যথাসক্তি পানাহার-প্রকল্প থাকিবার জন্য অনুরোধও জানাইয়াছেন। কিন্তু এই বিশ্বব্যাপারের অপেক্ষাকৃত প্রথমতর অর্থ ও অধিকতর ব্যাপক

দৃশ্যপটের সম্মুখীন হইবামাত্র তিনি “শোচনীয় বিষয় পরিকল্পনা” ও “মজাদার ছাত্রবাজী”র মধ্যেই কিরিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এই ছাত্রবাজী চলিয়াছে—“তপন শিখার কেন্দ্রে ধরি” এবং “আমরা তারি রঙীন ছবি, আসা-যাওয়ায় ঘুরছি সদাই।”

নৈসর্গিক শক্তিরাজির লীলানৃত্যের সম্মুখে মানুষের অসহায় অবস্থার প্রত্যক্ষ সত্যটি যখন আমরা ধীরভাবে গ্রহণ করি, তখন ওমর খৈয়ামের পরমাধিক দুঃখবাদ আমাদের অন্তরে সুগভীর রেখাপাত করে, এবং প্রাণের তার সম্বন্ধে বাক্য হইয়া উঠে। এই নিষ্ঠুর সত্যের প্রবল প্রচারে, বা সবল পরিচয়-গ্রহণে, ওমর খৈয়ামই অবশ্য প্রথম বা শেষ প্রচারক নহেন। জ্ঞানী সলোমনও একদিন নিষ্পেষিত বিশ্বমানবের ক্রন্দন ধ্বনিত করিতে গিয়া বলিয়াছিলেন—“সৌরজগতে যে-সকল কর্ম অদৃষ্ট হই তাহার সবই দেখিলাম ; জানিও এ সমস্তই অনর্থক জ্ঞানভ্রমিতা ও যন্ত্রণাময়।” প্লেটো বড় দুঃখেই বলেন ‘মৃত্যু যদি স্বপ্নহীন নিদ্রা হয়, তবে তাহাকে এক পরমার্চ্য মহালাভই বলিতে হইবে। ‘জব’ও ওমরেরই মত মনে করিতেন যে পৃথিবীতে আমাদের গোণা দিনগুলি ছায়াবৎ।

সেক্সপিয়রও গাহিয়াছেন—

‘জীবন তো কলচ্ছায়া শুধু—দীন অভিনেতা,

লক্ষ্যবাক্ষ, গলাবাজি ক্ষণমাত্র রঙ্গমঞ্চপরে,

তারপর, নাহি সাড়া আর। এ এক কাহিনী,

মূর্খ যার রচয়িতা ; আছে শব্দ, আশ্ফালন

শূন্যগর্ভ অর্থ কিছু নাই’—(১)

এমন কি, দার্শনিক কান্টের নিকটও ‘জীবন’ ছিল—‘কষ্টের বিরুদ্ধে

অবিশ্রাম লড়াই—একটা অশুভক্ষণ যাহার কাছে অধিকাংশ জীবই হার মানে এবং শ্রেষ্ঠতমেরা সুখী হয় না’; শোপেনহায়ার দৈনন্দিন জীবনের বিরুদ্ধে এতই খড়গহস্ত হইয়াছিলেন যে, দীর্ঘনিখাসের সহিত সেই লক্ষ্যগুণে—শ্রেয় দিনটির প্রতীক্ষা করিতেন,—যেদিন এই নিরর্থক, এক্ষেপে আনন্দ-বেদনার হাত এড়াইয়া, চিরশান্তিময়, নির্দোষের কোলে আশ্রয় লাভ করিবেন।

খৈয়াম যখন সুপণ্ডিত মুসলমান, তখন অদৃষ্ট ও পুরুষকার-ঘটিত জটিল তথ্যের ব্যাপারে তাঁহাকে কোরান প্রচারিত ধর্মের দিক হইতেই বিচার করা দরকার। মুসমানদিগের ধর্মবিশ্বাস এই যে, জগতে যাহা কিছু ঘটিয়াছে, ঘটে বা ঘটবে, সে সমস্তই ঈশ্বরের আজ্ঞায়। জীবনে মানুষ যে অবস্থা লাভ করে, তাহা জগৎ সৃষ্টির পূর্বে হইতেই ভগবান কর্তৃক বিহিত। তাহাদিগের আরও বিশ্বাস, ঐ ভগবৎ-বিধির বিধান-অনুসারে কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি নরকে ও কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি স্বর্গে গমন করিবে। এই বিশ্বাসবশেই ওমর লিখিয়াছেন :—

“হে ভগবান, তুমি আমাকে কদম হইতে গড়িয়া তুলিয়াছ; তোমার করুণা ও প্রেমে অভিসিক্ত করিয়া আমাকে পরম সম্মানিত করিয়াছ; ইহার পর, আমার অপরাধগুলিকে আর বড় করিয়া দেখিয়া শাস্তিবিধান করিও না; আমাতে যে রূপ বীজ তুমি রোপন করিয়াছিলে, আমি অবিকল তাহারই ফল।”

এইরূপ বিশ্বাস-হেতুই জাগতিক ব্যাপারে মুসলমানেরা পিছাইয়া পড়িয়াছে, এবং তাহাদিগের ধর্মশাস্ত্র-পরিকীর্তিত কর্তব্যকার্যও অবহেলা করিতে শিক্ষা করিয়াছে। অদৃষ্ট ও ইচ্ছাশক্তিকে দুটি পরস্পর-বিরুদ্ধ পথ হিসাববই তাহার গণ্য করিয়াছিল। মানি, অতি তুচ্ছ ঘটনাটির সংঘটনও যে বিধাতার বিধিসাপেক্ষ, এরূপ মনে করা মুসলমানের পক্ষে

অপরিহার্য। এ সত্যও সমান স্বীকার্য যে ভগবৎ-প্রজ্ঞার আলোকে অনাদি ভবিষ্যতের ঘটনা-বীজটুকু পর্যন্ত সমান আলোকিত—তথাপি ইহা হইতে এমন মনে করা চলে না যে, আমাদের কৃতকর্মের শাস্তি বা পুরস্কার সম্বন্ধে অগত্যা আমরা সম্পূর্ণ দায়শূন্য। অদৃষ্টবাদকে এই জাতীয় অর্থে গ্রহণ করার অপেক্ষা অধিকতর ভ্রান্তি আর নাই। প্রকৃতপক্ষে, যাহা যাহা খুশী তাহাই করিতে যেমন অধিকারী নয়—সেইরূপ আবার এতখানি নিষেধ-নিবন্ধ গতিও নয়—যাহাতে সে আপনাপন বর্তব্য-সম্পাদনে বা কার্যের অনুরূপ ফললাভে অক্ষম। “সমস্তই ভগবৎ বিহিত”—এ উক্তির তাৎপর্য এই যে সমস্তই নৈসর্গিক নিয়মের অধীন, আর ভগবানই ঐ নিয়মাবলীর নিয়ন্তা। ইসলামীয় শিক্ষার সংক্ষিপ্তসার এই—“তুমি কোথাও ঐশী নিয়মের ব্যতিক্রম দেখিতে পাইবে না। আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারও এই উক্তির সত্যতা প্রতিপন্ন করিতেছে। ‘সমস্তই বিধাতৃ নিয়ন্ত্রিত’—এ কথা অবশ্যই এমন বুঝায় না যে, তিনি ইচ্ছাপূর্বক আমাদের স্বন্ধে এমন বোঝা চাপাইয়াছেন যাহা বহনে আমরা অক্ষম। আমাদের দিকে কি করিতে হইবে তাহা অবশ্যই তিনি জানেন—কিন্তু তাই বলিয়া, এমন বিধান তিনি করেন নাই যে আমাদের দিকে উহা করিতেই হইবে। তাঁহার কথা—“বিশ্বাসী ও অকৃতজ্ঞ হইবার স্বাধীনতা সকলেই সমান”—। বিশেষতঃ, সদসদকর্ম ব্যাখ্যায় কোরান স্পষ্টতঃই বলিয়াছে—“তোমার পক্ষে যাহা কিছু ভাল, তাহা ভগবান হইতেই আসে; যাহা কিছু মন্দ তোমাকে পীড়িত করে তাহা তোমার কলুষিত বাসনারই ফল।” ফলকথা, কোন্ পথে চলা উচিত তাহা জানিলেও, ভগবান আমাদের কোনো বিশেষ পথে চলিতে বাধ্য করেন না; বিবেক ও সং-অসং-বিচারশক্তির অধিকারী করিয়া তিনি আমাদের কর্ম-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনতাই দিয়াছেন।

এক্ষেণে, ধর্ম ও অদৃষ্টবাদ সম্বন্ধে এমন কথা উঠিতে পারে, যে অদৃষ্টবাদকে ধর্মের অঙ্গীভূত করা নিতান্তই অসঙ্গত হইয়াছে; যেহেতু

উহা অত্যন্ত অটল এবং নানারূপ ভ্রমপ্রমাদের
ধর্ম ও অদৃষ্টবাদ

উৎস। এ কথার উত্তর এই যে মানুষ অদৃষ্টে বিশ্বাস পরিহার করিতে পারে না। উহা পরিহার করার প্রধান ও প্রবল বাধা এই যে, সেক্ষেত্রে মানুষ নিজেকেই চরম কর্মী বলিয়া ধরিয়া লইতে শিথিলে এবং ভগবানের অস্তিত্বকে নিতান্তই একটা কল্পনার সৃষ্টি মনে করিবে। তাহা ছাড়া, একমাত্র অদৃষ্টবাদই আমাদের জীবনে শক্তির ও সান্ত্বনার যোগান দিয়া থাকে এবং জীবনের প্রতি পদক্ষেপেই স্মরণ করায় যে সমস্ত ব্যাপারেরই একজন চরম নিয়ন্তা বিद्यমান—গাছকে দেশভেদে ও কালভেদে লোকে নানা নামে অভিহিত করিয়াছে। আমরা অনুভব করি যে আমাদের কলুষিত চিন্তার দ্বারে তাঁহার দৃষ্টি জাগিয়া আছে এবং তাঁহার এই সর্বব্যাপকতা বিষয়ক চৈতন্যই আমাদের পাপানুষ্ঠান হইতে সূদূরে রক্ষা করে। দর্শনও নয়, বিজ্ঞানও নয়—কিন্তু এই ঈশ্বরে বিশ্বাসই আমাদের চরম সান্ত্বনা ও পরম আশ্রয়স্থল। সারা জীবন জ্ঞানের অগুণীলনে জীবন নিয়মিত করিয়া আসিলেও দুঃখ-দুর্দশা ও প্রয়োজনের মুহূর্ত্তে জ্ঞান আমাদের কাছে আসে না। একমাত্র ধর্মই এই সঙ্কটকালে আমাদের সহায়—আর ঐ সহায়তার উৎস ভগবৎ-বিশ্বাসের উপরই সম্পূর্ণ নির্ভরতা। যাবতীয় ঘটনার সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক আমাদের চির-হিতৈষী, কোনো এক মহাশক্তিমানই যে আমাদের দুঃখ-দুর্দশার নিয়ামক, এইটুকুই আমাদের সবচেয়ে বড় সান্ত্বনা; এবং বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার যখন আমাদের কোনো কাজেই লাগে না, তখনও এই বিশ্বাস—একমাত্র এই বিশ্বাসই আমাদের ত্রাণকর্তারূপে দেখা দেয়।

অতঃপর ওমর খৈয়ামের কথা। এ অভিযত খুবই সত্য যে, ভগবৎ

কার্যের ক্রটি-বিচার বা খুঁত ধরবার চেষ্টা প্রকাশ করার কোনো অধিকারই তাঁহার ছিল না ; কিন্তু এরূপ করার মূলে তাঁহার অভিপ্রায়টি কি ছিল তাহা সমস্তে বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন—কারণ কোনোখানেই তাঁহার প্রজ্ঞার অভাব ঘটে নাই, এবং মানব-প্রকৃতির দৌর্বল্য যে কত অধিক, কেবলমাত্র তাহাই তিনি দেখাইতে চাহিয়াছেন। ওমরের মতামত যেন প্রাণাধিক প্রিয়তমের বিরুদ্ধেই অভিযোগ—আর সত্যানু-সন্ধিসা-প্রসূত বলিয়াই বুঝিবা সুসঙ্গত। মৃত্যুকালে ভগবৎ-অন্বেষণ-সম্পর্কে ওমর যে শেষ কথা কয়টি উচ্চারণ করেন তাহাকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, স্বাধীন ইচ্ছা অনুশীলনের আবশ্যকতা তিনি কতক পরিমাণে স্বীকার করিয়া ব্যবহার লাগাইয়াছিলেন—তথাপি প্রাক্তনের তুলনায় ইহাকে তিনি বড়-বেশী মূল্যবান মনে করেন নাই। মৃত্যুকালীন উক্তির মধ্যেই মানুষের সমগ্র জীবন সাকার হইয়া উঠে, স্ততরাং ওমরকে যাহারা চিনিতে চান, তাঁহারা এইটিকে যেন বিশেষভাবে লক্ষ্য করেন।

ভগবানের বিরুদ্ধে ওমরের যে অভিযোগটিকে সাধারণতঃ ভ্রান্ত অর্থে গ্রহণ করা হয় তাহা এই :—

‘ওগো দয়াল ! ফাদ পাতি ও কষ্টকিত শুহায় ভরি’

‘রেখেছো যে পথখানি এই, পথিকজনের সামনে ধরি’—

সত্য কহ,—পারতে না কি অগত্যর বিধান-বলে

রাখতে সবায় বিমুক্ত পাশ কলুষ হ’াত তফাৎ করি’।’

ইহা হইতে এমন মনে করা অসঙ্গত যে, ভগবানের দ্বন্দ্বের দোষ চাপাইয়া দিয়া বাহা খুশী করিবার অধিকার মানুষের আছে। বিবেক-বিরুদ্ধ কর্তব্যই ‘কষ্টকিত শুহা’। ইহাতে পড়া না পড়া অবস্থা মানুষের নিজের উপরই নির্ভর করে। এই সঙ্কটে মানুষ যে পথ বাছিয়া হয়, তাহা হয় তাহাকে সিদ্ধির রাজপথে চালিত করে, অথবা পাপের অন্ধকার

গলিপথে লইয়া যায়। এক্ষেত্রেও ভগবৎ-বিধি সমাক বলবৎ সত্য; কিন্তু আপন ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের ইচ্ছা সত্ত্বে মানুষ স্বাধীন, এবং সং ও অসং উভয় কর্ণই 'তাহার বিধিভক্ত শক্তির অধীন। Samuel Smith-এর ভাষায় "Heaven helps those that help themselves"—কিন্তু একথা মানুষ যেন মনেও না আনে যে, সে ভগবৎ-নিরপেক্ষতাব কোন সংকার্য্য করিতে সক্ষম। এরূপ অভিমান মনে জাগিলে 'ত্রিশকু'র দৃষ্টান্ত স্মরণ করা মন্দ হইবে না। ওমরের এ উক্তি অবশ্যই অকাট্য যে—

“প্রারম্ভেই সমাপ্ত ভাই শেষের মানুষটিকেও গড়া,
শেষ দিবসের ফসলগুলি, ঐ দিবসেই রোপণ করা;
স্বজনকালের প্রথম উষাই লিখেছে সেই হরফগুলি
প্রলয়কালের শেষ উষাটির চক্ষে যাহা পড়বে ধরা।”

এই উক্তির সহিত সম্পূর্ণ একমত হইয়াই বুঝিবা Fate and Free will গ্রন্থের লেখক লিখিয়াছেন—

“By fate, I understand a belief that the order of things is unalterably fixed and established from the begining of Creation once and for ever, and that no power we know of, human or divine, can hasten, stay or retard even by a second this per-determined succession of events, or deviate by a hair's breadth its fixed line of direction.”

ওমরের ভগবৎ-স্রোহিতা সত্ত্বে উপরি-উক্ত পুস্তিকায় যাহা বলা হইয়াছে, তাহার ভাংপধ্য এই—“মানবজাতির নিঃসহায় অবস্থার নির্ধমতা-বিন্দু হইয়াই ওমর খৈয়াম আপন কাণ্ডের দারিদ্র্যটুকু পর্যন্ত অস্বীকার করিয়াছিলেন। তাহার চক্ষে মানবজাতির ভ্রমাক্ষিত

পাপরাশি শাস্তির যোগ্য অপরাধরূপে প্রতিভাত না হইয়া, তাহাদিগের প্রকৃতির মূলীভূত দৌর্বল্যরূপেই দেখা দিয়াছিল। এমন দৌর্বল্য, যাহাকে অতিক্রম বা নিবারণ করাও বুঝিবা তাহাদের সাধ্যাতীত। স্বজাতীয় জীবের জ্ঞান তিনি যেমন করিয়া অনুভব করিয়াছেন, এমন যত্নাময় অনুভূতি বুঝিবা আর কেহ প্রত্যক্ষ করে নাই। মানুষকে তিনি যেমন জানিয়াছেন, এমন অল্প লোকই জানিয়াছে। তিনি জানিয়া গিয়াছেন যে, মানুষ অগ্ৰাণ প্রাকৃতিক পরিবেষ্টনী হইতে আপনাকে পৃথক করিয়া লইতে অশক্ত এবং তাহার সম্ভাষ্যে নিয়ম ও সন্তোষমূহও, ঋতুচক্র ও গ্রহ-নক্ষত্রাদির গতিবিধিরই মত, অলঙ্ঘ্যরূপে সুনির্দিষ্ট। আমরাও যদি, তাহার ভগবৎ-বিদ্রোহে সহসা বিচলিত বা বিমুগ্ধ না হইয়া, সঙ্কুতার সহিত পাপ ও অপরাধের গোপন উৎসগুলির বিষয় চিন্তা করি, তাহা হইলে বুঝিব, যে কি তীক্ষ্ণভাবে ওমরের দিব্যদৃষ্টি কষ্টির মধ্যে মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে।”

পূর্বে বলা গিয়াছে যে ওমরের যথার্থ উদ্দেশ্য ছিল—ঈশ্বরের সন্মুখে নতজানু হইয়া, তাহাকে সৃষ্ট মানব-হৃদয়ের দৌর্বল্য বুঝিবা বুক চিরিয়াই দেখানো। এই কার্য্য করিতে গিয়া যদি তিনি ভব্যতার সীমা লঙ্ঘন করিয়াও থাকেন—আমাদের বিশ্বাস করেন নাই—তাহা হইলেও ভগবৎ-সকাশে বরণা ও মাঝের দাবী-কল্পে, সর্বদা অনুযোগের আকারে, তিনি অনন্ততঃ হৃদয়গ্রাসী সাহিত্যে সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন।

খৈরামের জীবন-বিষয়ক দার্শনিকতা প্রভূত পরিমাণে ‘এপিকিউরাসের’ই প্রতিধ্বনি। অতীত বা ভবিষ্যতের কোনো তোহাফা না রাখাই ইহার বিশেষত্ব। বর্তমান সহস্রকে সর্বদা সঙ্গাগ থাকিতেই ইহা শিক্ষা দেয়। জীবনকে উপভোগ কর—পানাহারে প্রকৃত খাদ্য—কারণ এই পৃথিবী ক্ষণিকের ওমর খৈরাম—৮

এবং জীবনে এমন কিছুই নাই বাহাকে স্থায়ী বলিতে পারা যায়। নিত্য-পরিবর্তনশীলতাই যখন জগৎ ও জীবনের প্রকৃতি, তখন যতদিন বাঁচিয়া থাকি যায়, মনের সুখে বাঁচাই বাঞ্ছনীয়। জীবনের দুঃখকে সুখে রূপান্তরিত করিতে থাক এবং জীবন যেমনই হোক, তাহাকে প্রফুল্লচিত্তে ও সন্তোষের সহিত গ্রহণ কর। কাল হয়তো তোমাকে মৃত্যুমুহুর্তের সম্মুখীন হইতে হইবে এবং উদার কবল হইতে ফিরিয়া এই জগতের আনন্দরাজি আর উপভোগ করিতে পাইবে না; অতএব যে-দিনগুলি তোমার আয়ত্তে আছে, তাহাদিগকে সানন্দে বরণ কর—কারণ তাহা তুমুল্য।

“মাতা যদি অধিকই হয়, তবু খৈয়াম, সুখীই থেকে ;
 পদ্মসুখীর সঙ্গী যদি, তবু খৈয়াম, সুখীই থেকে ;
 শেষে যখন দিন ফুরাবে, অচল হবে বাড়ির কাঁটা,
 জেনো তুমি নেইকো খেঁচে ; যাবৎ জীবন সুখেই থেকে।।”

মৃত্যুর ভাষা অনিশ্চিত আর কিছুই নাই। এ সম্বন্ধে বিভিন্ন সম্প্রদায় বিভিন্ন মত পোষণ করে—এবং মৃত্যু-পরবর্তী অবস্থা—সম্বন্ধে অত্যাশ্চর্য আশার কথাও শুনাইতে চায়। খৈয়ামের নিকট সে সম্বন্ধেই “দূর-দামামার বিজয়-নাড”। ‘মৃত্যুর অপরিহার্যতা অস্বীকার্য’ এই সত্যটুকু মাত্র মানিয়া লইয়া তিনি আমাদেরকে বলেন যে সম্বন্ধে অপব্যবহার অকর্তব্য, এবং জীবনকে উপভোগ-সামগ্রী করিয়া লওয়া দরকার। বাহ্যের অবস্থা সুখ-সন্তোষের অমূল্য তাহাদিগকে ওমর অভিনন্দিত করেন এবং বলেন যে, তৃপ্তিপ্রদ মুহূর্তগুলির মূল্য বুঝিয়া লইতে হইবে। জীবন তাহার চক্ষে আনন্দ ও উপভোগের উৎস। জীবন যে কষ্টক-শয্যা এই ধারণা সবেলে পরিহার করিয়া তিনি উহাকে কুশুম শয্যায় পরিণত করিবার পক্ষপাতী; তাহার মতে এই জগতের বাহা-

কিছু, সে সমস্তই আমাদের কলোচিত ও গ্রাহ্যসম্মত উপভোগের অঙ্গ
নহই।

কিন্তু ধৈর্য্য বর্তমানের উপরই এতটা জোর দিয়াছেন কেন ?
কারণ, তাঁহার চক্ষে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ পরস্পর-অবিচ্ছিন্ন এবং
একই বুনানের ত্রিভুজের অংশমাত্র। আজ যাহা বর্তমান তাহা
অতীতেরই পরিণতি ; আর এই বর্তমানই যখন অতীত হইয়া দাঁড়াইবে,
তখন উহা ভাবী বর্তমানের গঠন-মূলে ভিত্তিরই কাজ করিবে। এই
বুনানের উপাদান দুঃখ, যন্ত্রণা, সং ও অসং। তাহার জগতের
বিবর্তমান প্রকৃতি ও মাহুতের মানস-দেহের স্বভাবকে রূপ দেয়
এবং পরিণামে মানব জাতির সুখ ও শান্তির আকারে বিকশিত হইবার
দিকে অগ্রসর হয়। অতীতের অধিজ্ঞতার উপর আমরা বর্তমান
জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করি এবং ভাবীকালের সুবিধার
অঙ্গ উচ্চতর নৈতিকতার অট্টালিকা গাঁথিয়া রাখিতে চাই। তাই
বর্তমানের উপর জোর দিয়া, দার্শনিক যের একদিকে অতীতের স্থিতির
বেদনা ও অঙ্গদিকে ভাবীকালের সম্ভাব্য বিপ্লব-বিকোলাদির দুর্ভাবনা
নিরোধ করিতে চান। তিনি আমাদেরকে বর্তমানের সম্ভাবহার ও
জীবনে সর্বদা সর্বদা বোঝাপড়ার কাজেই প্রোৎসাহিত করেন
—কারণ এ বিষয়ে তিনি নিঃসংশয় যে, সত্যতার সহিত যে পরিশ্রম
করা যায়, তাহার ফল সন্তোষ ও পরিশ্রম সুখময়ই হইয়া থাকে ! আর যদি
অন্ততর্কাত্মকতাই অদৃষ্টের আকারে দেখা দেয়, তাহা হইলেও এই সাধনা
আমাদের হতাশা হইতে রক্ষা করে যে আমাদের সাধামত কষ্টের
কষ্টটা ঘটিতে দেই নাই।

একাদশ পরিচ্ছেদ

কবি ওমর খৈয়াম

ওমর খৈয়ামের জীবন-স্বাধীন আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আপন জীবদ্দশায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক হিসাবে স্বদেশবাসীর প্রশংসাজলি লাভ করিলেও ওমরের কবি-ধন্য কবিরূপে সম্মানিত ছিলেন না। পারস্যের প্রসিদ্ধ কবি-বিবরণী-লেখক মহম্মদ আওফি (১০১৫-১৬ খ্রী:) তাঁহার “লুবার-উল-আলবাব” গ্রন্থে ওমরের নামোল্লেখ করেন নাই। মহম্মদ হামদুল্লা মুস্তওফি (১৩৪০ খ্রী:) তাঁহার “তারিখ-ই শুজিহা”তে ওমরের কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে কোন উল্লেখ না করিয়া কেবলমাত্র তাঁহার কতকগুলি আরবী ও ফার্সী কবাই উদ্ধৃত করিয়াছেন। দৌলতশাহ (১৫৩৩ খ্রী:) তাঁহার “তাজ ক্বিরাতুলশোয়ারা” গ্রন্থে অপর কবির তুলনায় প্রসঙ্গে ওমরের কবিতা উদ্ধৃত করিয়াছেন। ওমরের কবি-প্রতিভা সম্বন্ধে কোন বিবরণ এই গ্রন্থ মধ্যে স্থান পায় নাই। ওমরের প্রিয় শিষ্য নিজামী অরুসী সমরকন্দী (১০৬০-৬১ খ্রী:) তাঁহার ‘চহর মকাল’ গ্রন্থের প্রথম ‘মব’লা’য় (কবি-প্রসঙ্গে) ওমরের নাম উল্লেখ করেন নাই। লুতফ আলি বেগ (১১২১-২২ খ্রী:) তাঁহার “আতশকদা” গ্রন্থে কতকগুলি চতুঃপদী উদ্ধৃত-করিয়া লিখিয়াছেন, ৭মর সুবিখ্যাত হকিম (দার্শনিক) হইলেও কতকগুলি সুন্দর আরবী ও ফার্সী কবাই রচনা করিয়া গিয়াছেন। ইমাম উদ্দিন খাতিব (১৩৪০-৪৪ খ্রী:) তাঁহার “কবিরাত-উল-আসার” গ্রন্থে ওমরের যে সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রদান

করিয়াছেন, তাহাতে ওমর খৈয়ামকে খোঁরাগাণের কবি-তালিকাভুক্ত করিয়াছেন।(১) তকি কাশী (১৫৩০ খ্রী:) তাঁহার সুবিখ্যাত “খুলাস-উল-আসর” নামক পারস্ত কবিগণের জীবনী পুস্তকে ওমরকে কবি-রূপেই উল্লেখ করিয়া তাঁহার ষোলটি রুবাই উদ্ধৃত করিয়াছেন।(২) তকি কাশী তৎকালীন নিতুল জীবনীকার ও সমালোচকরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন।(৩) সৈয়দ আলী বিন মহম্মদ অল-হসেনী (১৫০২-২৩ খ্রী) তাঁহার “বাজমারাই” নামক কবি-বিবরণীতে লিখিয়াছেন, ওমর খৈয়াম কতকগুলি অতি সুন্দর চতুশ্লী রচনা করিয়া গিয়াছেন। তিনি চিন্তাশীল ও জ্ঞানী ছিলেন। তিনি নিজ শক্তি পরীক্ষা ও জ্ঞানবৃদ্ধি করিবার জন্য কাব্য অশ্লীলন করিতেন।

আমাদের মনে হয়, জ্ঞানচর্চার অবসরে রচিত ওমরের স্বল্পসংখ্যক চতুশ্লী ও শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক-প্রতিভা স্বদেশে কবি-বশ লাভ করিবার পক্ষে কবি-বিশেষ প্রতিবন্ধক হইয়াছিল। ইরাণে স্বল্পসংখ্যক কবিতা-রচয়িতারা কবি-তালিকাভুক্ত হইতেন না। ইরাণের অধিকাংশ কবিই এত অধিকসংখ্যক কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন যে, তাহার তালিকা প্রস্তুত করা কঠিন ব্যাপার। তৎকালে অধিকসংখ্যক শ্লোক-রচয়িতাই কবির সম্মান লাভ করিতেন। পঞ্চাশ হাজারের অধিকসংখ্যক শ্লোক-রচয়িতা কারদোস্তী মহাকবিরূপে সম্মানিত। ইহা ব্যতীত আরও দেখিতে পাওয়া যায়

১। Catalogue of Oriental Manuscripts in the Leydon University Library Dozy.

২। Catalogue of Arabic and Persian Manuscripts in the Oriental Public Library. Fatma vol viii.

৩। Catalogue of Oudh Mss. Dr Sprenger 1854.

যে, রাজ-অনুগ্রহে প্রতিপালিত রাজ-স্তুতিকারক কবিগণ জনসাধারণের চিত্তজয় করিতে সমর্থ হইতেন; তাঁহাদিগের কবিত্ব কিবা। রাজসম্মান জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করিত, তাহা বলা কঠিন হইলেও আমরা উদাহরণস্বরূপ পারস্যের দ্বিতীয় কবি-পয়গম্বর আনওরির—যিনি প্রথম জীবনে বৈজ্ঞানিক ছিলেন,—কবিরূপে অবতীর্ণ হইবার কথা উল্লেখ করিতে পারি।

ইরাণে রাজকবি—সুলতানের স্তুতিকারক—অধিকতর সম্মানিত হইতেন। ওমর খৈয়াম রাজকবি ছিলেন না। তিনি রাজ-জ্যোতিষী (মুনাজ্জিম-ই-শাহী) ছিলেন; সুতরাং কবি-রূপে ইরাণে কাহারো কবিত্ব সম্মান লাভ করিবার কোন উপায় ছিল না। তাহার পর দেখা যায় যে, ইরাণের বিদ্বান্‌মারাই কবিতা রচনার প্রয়াস পাইতেন—কবি-প্রতিভা থাকুক আর নাই থাকুক। উদাহরণস্বরূপ ওমর-সুক আবু-সিনার নাম উল্লেখ করিতে পারা যায়। ওমরের মত আবু-সিনার কবি-প্রতিভাও পারস্যের জনসাধারণের চিত্তজয় করিতে পারে নাই—তাঁহার স্বল্প রচনাই ইহার জন্য একমাত্র দায়ী। বেসনের কবিতা সম্বন্ধে প্যালেস্ট্রা বলিয়াছিলেন,—

“A fine example of a peculiar class of poetry that is written by thoughtful men who practice this art but little.”

আমাদের মনে হয়, ওমরের স্বদেশবাসিগণ ওমরের কবি-প্রতিভা তাঁহাদিগের চিত্তজয় করিতে সমর্থ হয় নাই।

সে বাহা হউক, স্বদেশে আপন জীবদ্দশায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী জ্যোতির্বিদ ও দার্শনিক হিসাবে বিখ্যাত হইলেও দেশ-দেহান্তরের জন-সাধারণে প্রায় হাজার বৎসরের কালতরঙ্গ ভেদ করিয়াও ওমর খৈয়াম আজ যে

কবি

অগ্র পরিচিত, তাহা তাঁহার কবিত্ব শক্তি যাত্র। স্তম্ভীকৃত জ্ঞান ও
 জগৎসভার ওষধের
 পরিচর কারণ
 পাণ্ডিত্যের ভার আজ কালসাগরের অন্তলম্পর্শে
 নিমজ্জিত; কিন্তু জ্ঞান-চর্চার কঁাকে কঁাকে
 বিরচিত কতকগুলি চতুষ্পদীর সমষ্টি একখানি
 মানব-জগতের আশা-ভালবাসা সংশয়-বিশ্বাস ও আনন্দ বেদনার কাহিনী
 বহিরা আজ পর্যন্ত ভাষা হইতে ভাষান্তরে তাহার অব্যাহত অব্যাহত
 রাখিয়াছে।

পারশ্বের কাব্য-সাহিত্য নানা ছন্দ-ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ। যে ছন্দে কবি
 ওমর তাঁহার উক্তি ও যুক্তিগুলিকে মুর্ত্ত করিয়া গিয়াছেন, তাহার নাম
 “রুবাই”। পারশ্বের সাহিত্য-শিক্ষণ যত প্রকার ছন্দে কাব্য রচনা
 করিয়া কাব্য-সাহিত্যকে শ্রীযুক্ত করিয়াছেন, তন্মধ্যে রুবাই
 ছন্দের নাম সসন্মানে উল্লেখযোগ্য; ওমর
 ছন্দ-কথা
 খৈয়ামের রুবাই বিশ্বের বাবতীর ভাষার অনুবাদ
 হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে “রুবাই” শব্দটি বাংলার সাহিত্য-রসিকগণের নিকটও
 সুপরিচিত হইয়াছে।

রুবাই ছন্দের প্রাচীন নাম ‘দু’বইতি’।—প্রাচীন যুগে এই ছন্দ দুইটি
 বসে বা চরণে সীমাবদ্ধ হওয়ার উহা ‘দু’বইতি’
 পরিচর
 নামে পরিচিত হয়। (১) পারশ্বের প্রাচীন
 কবি মুইজ্জি (২) ‘দু’বইতি’ ছন্দে কাব্য রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ

১। A Literary History of Persia vol I.

২। সমরকন্দের এসিদ্ধ কবি। ইহার প্রকৃত নাম জামীর আলী। সুলতান
 মহম্মদ শাহ ও সুলতান সঙ্গের আশ্রিত-কবি ছিলেন। পরে সুলতান সঙ্গের সুনজরে
 পতিত হইয়া ‘মলিক-উদ-দৌলার’ (রাজ-কবি) উপাধিতে সম্মানিত হন। ইঁহার
 দীওয়ান ১০০০০ শ্লোক পূর্ণ। ৫৫২ হি: (১১৫৭ খ:) মৃত্যুস্থানে পতিত হন।

করেন; (১) কালক্রমে এই ছন্দ চারি বৈধ বা চরণে সীমাবদ্ধ হইয়া 'চহার বইতি' নাম ধারণ করে। 'রুবাই' চহার বইতির সংকৃত প্রকরণ। ইহার বহুচিন্তা রূপের নাম—রোবাইয়াৎ।

চহার বইতি পারস্যের নিজস্ব সম্পদ। মুসলিম, মুতীক অথচ সংক্ষিপ্ত গঠনের এই ছন্দ পারসিক ধাতের সহিত বেশ খাপ খাইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কেন না আজ পর্যন্ত জনসাধারণে ইহার আদর অক্ষুণ্ণই রহিয়া গিয়াছে। এই চতুস্পদীর চারিটি চরণের প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণ পরস্পরের সহিত মিল রাখিয়া চলে। তৃতীয় চরণ স্বাধীন, তবে কখনও কখনও স্বেচ্ছায় মিলের অধীন হয়। সমগ্র রুবাইয়ের ভাব-টুকুকে ঘনীভূত করা এবং উহার গতিটিকে নির্দেশ করাই চতুর্থ চরণের কার্য। পারসিকদিগের উদ্ভাবনা হইলেও এই ছন্দের যাত্রা আরবীয় আদর্শ অনুসারেই নির্ধারিত হইয়াছে। (২) কেননা আরব জাতি কর্তৃক বিজিত হওয়ার পর পরসিকেরা যখন নিজেদের পহ্লবী ভাষাকে উহার চরম পরিণতির ছাঁচে ঢালিয়া লইতেছিল, এই ছন্দ সেই সময়েরই সৃষ্টি এবং এই সময় হইতেই ইহা 'রুবাই' নামে পরিচিত হয়। (৩) পাণ্ডিত্য-প্রদর্শক বৈয়াকরণিকের দল ঐ চারিটি যাত্রা চরণ-সীমার মধ্যে চক্ষণ প্রচারের যাত্রা-প্রণোদনীতি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছেন বটে, কিন্তু আসলে দুইটি যাত্রাই বর্তমান—যেহেতু বাকীগুলি শব্দ-সংখ্যার সঙ্কোচন বা প্রসারণের কালে, ঐ দুটিরই প্রকরণভেদ যাত্রা।

১। A Literary History of Persia vol II.

২। Persian Prosody. Prof. K. D. J. Irani;
A Literary History of Persia vol II.

৩। Persian Prosody. Prof. K. D. J. Irani.

কবি-বিবরণীর লেখক দৌলত শাহ(১) বলেন, আমীর ইব্রাহিমের
 পুত্র আনন্দোচ্ছাসের সহিত সুর করিয়া হঠাৎ
 জন্ম-কথা পড়ে কথা কন, উহাই তৎকালে ‘রুবাই’ নামে
 পরিচিত হয়।(২) শামস-ই-কাইস(৩) বলেন, প্রাচীন অন্ধ কবি রূপকী(৪)
 এই চন্দ্রের অন্নদাতা।(৫)

পারস্য দেশের প্রাচীন কবিগণের মধ্যে যাহারা এই চন্দ্রে কাব্য
 রচনা করিয়া বশবী হইয়াছিলেন এবং যাহাদিগের কবিতা কালের কষ্টি-
 পাথরে পরীক্ষিত হইয়া আজ পর্যন্ত বাঁচিয়া আছে, তাহাদিগের মধ্যে
 পারশ্বের প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও কবি আবু শকুরের(৬) নাম সর্বপ্রথমে ও

১। বোড়শ শতাব্দীর লেখক ও ধোরাসানের অধিবাসী। আমীর আলি উন্ডোলা
 ইসকারাইনের পুত্র। দৌলত শাহ কবি-বিবরণী লিখিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাহার
 তজ্জিকিরাতু শোয়ারা প্রসিদ্ধ ও প্রামাণ্য পুস্তক।

২। তজ্জিকিরাতু শোয়ারা।

৩। ধোরাসানের অধিবাসী ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রোছুত বৈরাগ্যনিক ও কবি-
 বিবরণী লেখক। সিরাজের বাদশাই আতাবক আবু বকরের অনুরোধে শামস-ই-কাইস
 সিরাজে আগমন করেন এবং তাহারই আদেশে কবি-বিবরণী পুস্তক রচনা করেন। এই
 গ্রন্থের নাম মূল-“মুরাজ্জাম।”

৪। পারশ্বের সমানিবংশীয় আমীর নসরের রাজত্বকালীন প্রোছুত প্রাচীন কবি
 ও গায়ক। ইনি জন্মাক্ত ছিলেন। নিজ প্রতিভা বলে রাজদরবারে উচ্চাসন লাভ
 করিয়াছিলেন। পারশ্ব কবিগণের মধ্যে তিনিই প্রথম দীর্ঘদ্বয় রচনা করেন। ইহার
 রচনাবলীর মধ্যে নারী ও ‘সুরা’ স্তুতি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার প্রকৃত নাম করিম-
 উদ্-দ্দিন আবুহুসাইন আবু। ৪৪৪ হিঃ (১০৮ খ্রীঃ) বৃত্তান্তে পণ্ডিত হন।

৫। মূল-মুরাজ্জাম।

৬। বলখ নগরের অধিবাসী ১০০ খ্রীঃাব্দে প্রোছুত কবি। ইনি দার্শনিক ও
 কবি উভয় রূপেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। ইহার অনেক রুবাই পারশ্বের সুপ্রসিদ্ধ নীতি-
 সংগ্রহ পুস্তক “কুবাস-নামা”র উদ্ধৃত হইয়াছে।

সম্মানে উল্লেখযোগ্য। কবি শকুর অনেকগুলি সুন্দর রুবাই রচনা করেন। (১) আবু শকুরের সমসাময়িক ও পরবর্তী কবিগণ মগনী ও গজল রচনা দ্বারা নিজ নিজ শক্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহারা কেহই রুবাই রচনার দিকে আঁধো মনোযোগ প্রদান করেন নাই।

একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে অনেকগুলি রুবাই রচনাকারীর —
 আবির্ভাব হয়। ইহারাই এই ছন্দটিকে কাব্য রচনার সম্পূর্ণ অঙ্গুল
 করিয়া তোলেন। এই দলের কবিদিগের মধ্যে
 রুবাই চন্দ্র রাজ্যের সত্রাট আবু সৈয়দ(২), বাবা তাহির(৩), আনসারী(৪)
 ও ওমর খৈয়ামের নাম সর্বাপেক্ষে ও সম্মানে
 উল্লেখযোগ্য। ওমর খৈয়াম ব্যতীত এই তিনজন কবি সুকীমরমীবাদকে
 সংক্ষিপ্ত অ'কারে রুবাই ছন্দে প্রকাশ করেন। ইহাদিগের প্রত্যেকের
 রচনার বিশেষত্বের ছাপ বিস্তারিত। কবি আবু সৈয়দ

১। Persian Literature. Levy.

২। কবি আবু সৈয়দ ১০৮ খৃষ্টাব্দে খোরাসানের অন্তর্গত মাহানা প্রদেশে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি উচ্চ শ্রেণীর মুকী ও দার্শনিক ছিলেন। প্রসিদ্ধ দার্শনিক আবু-সিনার সঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন।

৩। একাদশ শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত প্রসিদ্ধ-মুকী কবি। চতুস্পদী রচনাকারী হিসাবে প্রসিদ্ধ ছিলেন। কাব্যে উন্নয়ন (উলঙ্গ) তথলঙ্গ (ভণিতা) ব্যবহার করিতেন। ইনিও কবি আবু সৈয়দের বড় দার্শনিক আবু সিনার সঙ্গ লাভ করিয়া যত্ন করেন।

৪। কবি আনসারী রুবাই রচনার জন্য প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইঁহার সম্পূর্ণ নাম শেখ আবু ইসমাইল আবুহুস্না আনসারী। কবি আনসারীর পূর্বপুরুষ আরবের অধিবাসী ছিলেন। কবি আনসারী বহুশব্দের সহচর আবু আরাসের বংশধর ছিলেন। হিরাতে ১০০৬ খৃঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কবি আসজাদী ও কবি করিকির সাহিত্য-গুরু ছিলেন। কবি আনসারীর দীওরান ৫০,০০০ শ্লোক পূর্ণ।

সর্বপ্রথম এই ছন্দকে সর্বজনগ্রাহ্য ও কাব্য-প্রকাশের অতুল করিয়া ধর্মসম্পর্কীয় কবিতা রচনার পথ উন্মুক্ত করেন; কবি বাবা তাহির রুবাই ছন্দে তাত্ত্বিকবিশোধ এবং তৎসমগ্রসংক্রান্ত সমালোচনাত্মক কবিতা (Dialectic poetry) রচনার পথ-প্রদর্শক; কবি আনসারী রুবাই ছন্দের শক্তিশালী লেখক এবং ওমর খৈয়ামকে রুবাই-রাব্বের সয়াট আখ্যা দিতে পারা যায়।

বৈয়াকরণিক-নির্দিষ্ট সমস্ত ছন্দই কবি ওমর খৈয়াম কাছে লাগাইয়াছেন এবং পারসিক চতুষ্পদী ছন্দের আকাবের ওমরের রচনারীতি যত কিছু বৈচিত্র্য সম্ভবপর, ওমরের রোবাইয়াতে তাহার সবগুলিই বিস্তারিত আছে। পারিতোষিক শিল্পে নিক হইতে এবং উক্ত ছন্দের ক্ষেত্রে, ওমরের রচনা-রীতি একদিকে যেমন কমলীয় ও নমনীয়, অপরপক্ষে আবার তেমনি লঘুভার ও সঙ্গীতময়। তাঁহার ছন্দের প্রয়োগ প্রায়শই মনোরম। তৃতীয় পংক্তিটি কখনও কখনও অপর চরণত্রয় হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ছন্দে রচিত হওয়ার অত্যন্তই চমকপ্রদ হইয়া উঠিয়াছে। কাব্যের জগৎ ওমর যে ভাষা ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা শিক্ষানিপুণ সারল্যে পরিপূর্ণ। প্রকৃতপক্ষে ভাষার এই সরলতাই তাঁহার চতুষ্পদীগুলিকে সুশাসিত ও শক্তিসম্পন্ন করিয়া তাহাদিগকে বিশ্বকর ও আকর্ষণের বস্তু করিয়া তুলিয়াছে। ওমরের কবিতার প্রত্যেক পংক্তিই অমূল্যবস্তুর সত্যতা ও চিন্তার গভীরতার এতই সজীব যে, পারস্ত ভাষা ও সাহিত্যের যে-সকল সমালোচক তাঁহাকে নিতান্তই সাধারণ শ্রেণীর কবি ভাবিয়া লঘুভাবে দেখিয়াছিলেন, তাঁহার কবির সর্বপ্রধান গুণগুলিকে লক্ষ্য না করিয়া তৎপ্রতি অবিচার করিয়াছিলেন বলিতে পারা যায়। অভিপ্রায়ের সারল্য ও উক্তির বেগবত্বই সমস্ত মহৎ ও সংগ্রহের অন্তর্নিহিত প্রাথমিক কার্যাবী শক্তি; এবং ওমর

খৈয়ামে এই শক্তি সুপ্রচুর। ওমরের সরল গতিবেগ, নির্ভীক ও ঝড়ুতাকে একেবারেই সার কথাটির দিকে ঝাড়া, সমস্ত ছাড়িয়া একান্ত মনে লক্ষ্যবেধ—এই বিশেষ ভঙ্গীটি কাব্য-চতুষ্পাষ্ঠীর কোন পদ্ধতিপ্রিয় লেখক দিতে পারিয়াছেন? পারশ্য কাব্যের সমগ্র ইতিহাসে ওমরের মত উল্লেখিত কে কবে লিখিয়াছে—

“বিশ্বের মোরে ভরিয়া দিল সে প্রথমতঃ হেথা আনি,
কুড়ানু শ্বেল কীণ অহুমান ঢুঁড়িয়া জীবনখানি ;
চলি পুনরায় ঘুরণ হাওয়ায় ; কেন আসা ? বাঁচা ? মরা ?
এতই মনে আগে ও মিলায়, উত্তর নাহি জানি ।”

ওমরের চতুষ্পদীগুলিকে বিষয়ের দিক হইতে মোটামুটি ছয় ভাগে ভাগ করা চলে ; যথা :—

১। অদৃষ্টচক্রের নির্মমতা, জগতের অবিচার, মানুষের সীমাবদ্ধ ক্ষমতা ও ভাগ্যস্বকীয় অভিযোগ।

২। ধর্মশুদ্ধতার বৃজুকী, সাধুজনের পাবিত্রতা, পণ্ডিতগণের অজ্ঞতা এবং তাঁহার সমসাময়িক জনসাধারণের অশিক্ষিতার প্রতি বিক্রপ।

ওমরের রবাইয়ের
বিষয়গত শ্রেণী
বিভাগ

৩। পার্থিব বা অপার্থিব প্রিয়তমের সহিত মিলনের আনন্দ ও বিচ্ছেদের বেদনা বিষয়ক

শ্রেণী-কবিতা।

৪। বসন্ত বাল, উজান ও পুষ্প প্রভৃতির প্রশংসামূলক কবিতা।

৫। সৃষ্টির ভিতরকার পাপাধির জন্ত সৃষ্টিকর্তাকে দায়ী করিয়া ধর্মবিরোধী ও ভাববিরোধী উক্তি, কোরানে বর্ণিত স্বর্গ ও নরকের প্রতি বিক্রপ ; মরা ও সন্তোষের জরগান এবং ঘুরিয়া-কিরিয়া “পানাহারের” এই বলিয়া আবশ্যিকতা প্রচার যে, মৃত্যু কেশে ধরিয়া টানিতেছে।

৬। পাপের জন্ত অমৃত্যু ও ক্ষমার জন্ত অমৃত্যু করিয়া, কখনও বা সাধারণ অনুরাগের ভাষায় ভগবৎ-সন্তোষন; আবার কখনও বা সুকী মরমীদিগের অনুরূপ রূপকের ভাষায়, অহমিকা হইতে মুক্তির ও শ্রমাত্মার সহিত মিলনের জন্ত আকুলতা প্রকাশ।

প্রথম শ্রেণীর চতুর্দশীগুলিকে কবির জীবনের পরিচিত ঘটনাগুলির সহিত জড়িত করা যাইতে পারে। স্বাধীন শ্রেণীগুলির সংক্ষিপ্ত মতামতের জন্ত তাঁহাকে সাধারণ্যে যে নির্ধ্যাতন পরিচর্য করিতে হইয়াছিল, এই সকল অভিযোগ সম্ভবতঃ তাহারই কল। কোরানের উদ্দিষ্ট ছবী ও অপরাপের পবিত্র বিষয়াদির প্রতি তাঁহার ব্যাকোক্তি অনসাধারণক কবির বিদ্বে একরূপ উত্তেজিত করিয়াছিল যে, নিশাপুর হইতে তিনি যে প্রাণ বাঁচাইয়া পলাইতে পারিয়াছিলেন, ইহাই বিস্ময়কর। দ্বিতীয় শ্রেণীর বিজ্ঞপন কবিতাও ঐ একই কারণপ্রসূত। তৃতীয় শ্রেণীর রুবাইগুলি এমন এক জাতীয় রচনার নমুন, যাহা ওমরের পরবর্তী কবিগণের মধ্যেই অধিকতর সাধারণ। তাহাদের অধিকাংশেরই অন্তরে কোন গুঢ় অর্থ নিহিত থাকাই সম্ভব। কারণ, ওমরের ধাত যে প্রেম প্রভৃতি কোমলা-বৃন্তি-চর্চায় বড় বেশী অহুকুল ছিল, এমন মনে হয় না। “গোলাপী গণ্ড” বা “ললিত-তনু তুলী”র তিনি তারিক করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার সুন্দরী বান্ধবীগণের প্রতি বোনো গভীরতর আকর্ষণ অনুভব করিয়াছেন, এখন কোনো নিদর্শন তাঁহার কাব্যে দেখা যায় নাই।

চতুর্থ শ্রেণীর প্রাকৃতিক-দৃশ্যাবলী-উপভোগমূলক কবিতাতেও ওমরের বিশেষত্ব বড় বেশী লক্ষিত হয় না। ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিকর প্রাকৃতিক বিষয়-গুলিই শুধু ওমরের চোখে পড়িয়াছে। ফুলের হাসি, পানির গান, শ্রোতবতীর তৃণাভীর্ণ তট, ছায়ায় উজান প্রভৃতিই বহুসম্ভার আনন্দকি

উপকরণ হিসাবে ওমরের মনে ছায়াপাত করিয়াছে। তবে কতগুলি মৌলিক উপমা ও জীবন্ত অনুভূতি তাঁহার এই শ্রেণীর কয়েকটি চতুঃপদীর ভিতর উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।

ওমরের কবিতার অধিতীয় বিশেষত্ব ও উল্লেখযোগ্য শ্রীসম্পদ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাঁহার পঞ্চম ও ষষ্ঠ শ্রেণীর কবাইগুলিতে। একদিকে তত্ত্ব-বিদ্রোহী ও ধর্মবিদ্রোহী উক্তির তীব্রতা, আবার অতৃপ্তিকে সাধুজনোচিত ইচ্ছাশা ও অনুশোচনা প্রভৃতির করুণ কমনীয়তা—পাশাপাশি এই পদস্পর্শ-বিরোধী চিক-বৃষ্টির জলন্ত বিকাশ কবির পার্থক্যবর্ণকে তাঁহার সহস্রে নিতান্তই বিপদীত ভাবের ধারণায় অনুপ্রাণিত করিয়াছে। ওমরের সমসাময়িক এবং ইয়োয়োরোপীয় সহ সমালোচক তাঁহাকে ধর্মঘেবী, মত্তপ ও অসচ্চরিত্র আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন, অপদপক্ষে স্ত্রী সম্প্রদায়ভুক্ত পণ্ডিতমণ্ডলী তাঁহার সুস্পষ্ট 'চার্কা'—পন্থী চতুঃপদগুলিরও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা আবিষ্কার করিয়াছেন। পারশ্ব ও ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর প্রণালী অধিকতর সমাদৃত হইলেও কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তিই চক্ষু বুজিয়া ঐ দ্বিবিধ পন্থার কোনোটিকেই সমগ্রভাবে গ্রহণ করিতে পারেন না। তর্কের খাতিরে যদিও ধরিয়া লওয়া যায় যে, সে সময়েও স্ত্রী সাধন-পদ্ধতির সঙ্কেতগুলি পরিচ্ছন্ন আকার লাভ করিয়াছিল, তথাপি সংজ্ঞ-বুদ্ধির খাতিরেও আমরা এ কথা স্বীকার করিতে পারি না যে, ওমরের স্ত্রী ও সন্তোগ-বিষয়ক কবাইগুলি—যাহার সহিত লোক-নিন্দা ও অনুশোচনা জড়িত রহিয়াছে, যাহা পরিহার করিবার চেষ্টা ও পক্ষসমর্থনের বিবিধ যুক্তির ভিতর দিয়া বারংবার দেখা গিয়াছে—কোনো ভক্তিগতীর অর্থের স্ফোতক।

এ কথা খুবই স্পষ্ট যে, ওমরের কবাইগুলি তাঁহার জীবনের কোনো বিশেষ বয়সে, কোনো সুনির্দিষ্ট ভাবধারার বশে বিরচিত হয় নাই।

জানচর্চার অবসরে বিস্ত-বিস্তেপের জন্ত বা বন্ধুদের উপভোগের জন্ত, বিশেষ বিশেষ মানসিক অবস্থার এবং বিশেষ বিশেষ মুহূর্তের ওমরের রুবাই কোন চিন্তা, প্রতিপত্তি বাসনাদির প্রভাবে উহার সময় রচিত আকারবদ্ধ হইয়াছিল। ওমরের সমধামনিক শহরতানীর বিবরণে যদি তাঁহার উক্তরূপ মত-পরিবর্তনের বা তাব-বিরোধের কোনো উল্লেখ থাকিত, তাহা হইলে আমরা ধরিয়া লইতে পারিতাম যে, তাঁহার ধর্মত্রোহী ও সন্তোষবিষয়ক কবিতাগুলি যৌবনকালের এবং ভগবৎ-বিশ্বাসমূলক কবিতাগুলি পরিণত-বয়সের রচনা। কিন্তু শহরতানীর বিবরণ দৃষ্টে এরূপ অনুমান যেমন অসম্ভব, ওমর ঠৈয়ামের কান্য-পরিচয় হইতেও এরূপ ধরিয়া লওয়া ভেমনই কঠিন। তিনি আগাগোড়া নিজের এই পরিচয় দিয়াছেন যে, দুটি বিরোধী মতের মাঝখানেই তিনি দোহলায়মান। উদাহরণস্বরূপ নিম্নলিখিত রুবাইট উদ্ধৃত করা যাইতে পারে—

এক হাতেতে কোরান কেতাব ; অত্র হাতে মজা নিরে,

মন্ড-ভালর মধ্যপথে দাঁড়িয়ে গেছি থম্ থমিয়ে ।

সুনীল আকাশ দেখেছে মোরে কলঙ্কী এক মুংলমান

দাঁড়াইনিবে। যদিও ঠিক অধ্যাত্মিকের পথে গিয়ে ।”

বিচ্ছিন্নভাবে না দেখিয়া ওমরের এই পদস্পন্দ-বিরুদ্ধ রচনাগুলিকে যদি ইতিহাসের আলোকে দেখা যায় এবং সেই সঙ্গে তাঁহার মনের আভিযাত্রা ও আবেগনের বিবর্তন মণ্ডলীর কথা স্মরণ করা হয়, তাহা হইলে তাঁর বিরোধের অপেক্ষাকৃত সন্তোষজনক কারণ হইতো ধরা পড়ে। যৌবনে ওমর সুদী-ভাগবত ইশাম মঞ্জারিক উদ্দিনের চরণতলে বসিয়া জানচর্চা করিয়াছিলেন। ইনি যে সম্পূর্ণরূপে “একমেবাদ্বিতীয়ের” অথবা মহম্মদীয় ভাববোধিজ্ঞানের ভাষায় “একমাত্র যথার্থ বিশ্বাসকের”

ধারণায় অল্পপ্রাণিত ছিলেন, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সর্বত্র ও সকল কার্যে এক অর্থেই সর্বশক্তিম'নেরই ক্রিয়ার বিকাশ উপলব্ধি করিতে যে-সকল চিত্ত অভ্যস্ত, তাহাদের মধ্যে যে প্রকৃতি ইচ্ছাশক্তি বা অগতের নাপ ভাবের অস্ত্র দায়ী অপর কোনো দ্বিতীয় কর্মীর স্থান থাকিবে না ইহাই স্বাভাবিক ; যেহেতু ঐ “একমাত্র স্বার্থ নিয়ামকই” তাহাদিগের মতে সকল ব্যাপারের দায়িত্ব স্বীকারে বাধ্য। ইহুদী রাজা সলোমনও বলিয়াছিলেন যে, অস্ত্রার ও অবিচারই অগতে চিরজরী হইয়া চলিতেছে। কারণ, ভগবান (জিহোভা) সমস্ত ব্যাপারকেই ঠাকা করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাদিগকে সোজা করিবার সাধ্য কাহারও নাই।

ইসলাম-ধর্ম প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই এবং অদ্বিতীয় সর্বনিয়ন্তার বার্যে পাপের অস্তিত্ব সমস্তা মোসলেম ভাগবতগণকে পীড়িত করিতে আরম্ভ করে। তদুপরি পূর্ব-বিধান (Predestination) তথ্যের প্রয়োগে ঐ সমস্তা তাঁহারা আরও বেশী ঘোরালো করিয়া তুলেন। তাহাদিগের তর্ক-বিতর্কের একটি মূল বিষয় এই দাঁড়াইয়াছিল যে - ঈশ্বরের সুবিচার ও করুণার সহিত তাঁহার ঐ পূর্ব-জ্ঞান বা প্রাক-বিধানের সম্বন্ধ কেমন করিয়া ঘটানো যায়। কি হিসাবে তিনি যত্নবদ্ধ প্রণোজনীয়তার খাতিরে একজনকে উচ্চ, অপরকে হীন করার প্রাক-বিধি প্রয়োগ করিতে, অথবা যাহা সম্ভবই ঘটে তাহা ছাড়া অপর কোনো ঘটনার ভাবী সম্ভাবনা নিরোধ করিতে পারেন। ওমর খৈয়ামের অদ্বৈত-বুদ্ধিও তাঁহাকে এই সমস্তার কেলিয়াছিল বলিয়াই বারংবার তিনি এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। তবে ইহুদী রাজার মত পণ্ডীর মস্তব্য প্রকাশ না করিয়া, তিনি নিতান্তই লঘুভাবে এটিকে তাঁহার স্বল্প-কৌতুকের বিষয় করিয়া তুলিয়াছেন।

অপরদিকে, সুখী প্রভাবও যে তাহাকে স্পর্শ করিয়াছিল তাহা

সম্বন্ধে নাই। পারস্য-প্রতিভার কেন্দ্রভূমি খোরাসানে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি যে যোসলেম দার্শনিক অল-কিন্দী, অল-কারাবী, আবুসিনা ও ইবনে রোশদ্ প্রমুখ সুবিখ্যাত দার্শনিকগণের মতবাদের সহিত সুপরিচিত ছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। দর্শনচর্চার কলে সংশয়বাদী হওয়া এবং নুকীভাবাভিবিজ্ঞ হওয়া কলে, ভগবদ্-নির্ভর মনোভাবের অধিকারী হওয়া তাঁহার পক্ষে যেমন সম্ভব, তেমনি স্বাভাবিক।

ওমরের কবি-প্রতিভার একটি বিশেষ ক্ষুতির দিক তাঁহার রক-কৌতুক ও রসিকতায়।—জাতি হিসাবে পারসিকেরা প্রায়ই মজলিসী ও রসালাপ-রসিকতা ও রস-কৌতুক নিপুণ এবং তাহাদিগের মধ্যে প্রচলিত গল্প-নাটকাদির ভিতর দিয়া বেশ একটি হাসির স্রোত প্রবাহিত দেখা যায়। কিন্তু এই জাতির কাব্য-কর্ষিকার হাসির স্রব বিরল হওয়া সত্ত্বেও ওমরের চতুস্তরীর এইটাই বেন “জানু”। অনেক স্থলে মনে হয়, যেন জোর করিয়াই কবি আপন স্বভাবকে নিঙড়াইয়া নিঙড়াইয়া একটা অদ্ভুত রকমের কিছুতে দাঁড় করাইতে চাহিয়াছেন—যেন বা নিজের একটা কৃত্রিম চরিত্রই লোকচক্ষে ধরিয়া দেওয়া খুব মজার জিনিষ মনে করিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ ছ’—একটি কবিতা উদ্ধৃত করা গেল :—

“স্বর্গপুরীর হৃদ্যে না কি বেদার ছবি বসত করে
সেখার না কি অটল স্রার উর্মিধ্বজর খণা করে ;
পূণ্যবানের কাব্য ভূমির মর্থ যদি এমনভর—
যোব কি তবে বরণ করার আগেই এদের মর্ত্য “পরে ?”

অন্তঃ—

‘অন্ত বুঝিমানের মতই, সত্য বটে মডটা ঘাই,
কারণ, আমি ভালই জানি, খোদার তাহে আগন্তি নাই ;
ওমর খৈয়াম—২

কালের যখন হয়নি জনম, তখনও তাঁর ছিল জানা
করবে ওমর মত্ত সেবন ; আমি কে—সেই প্রজ্ঞা-প্রভাই ।”

* * *

“মত্তপেয়ে দোষ দিও না সর না যাদের মত্ত খেলে,
আমিও হতুম পান-বিরোধী জগন্নাথের আশীষ পেলে,
নিজের মাঝে ভলাও যদি, দেখবে তবে ধর্মাবতার
তোমার গোপন পালের পাশে মাতালরা সব দুধের ছেলে ।”

কবির রক্ত-রসিকতা শুধু যে তাঁহার কোরানের প্রতি কটাক্ষ বা ভণ্ডামী
বা বুজবুজীর প্রতি ব্যঙ্গোক্তিভেদেই প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা নহে। ইহা
অত্যধিক— ইহা যেন জীবন-মৃত্যু সম্বন্ধেও তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গী নিম্নো-
ক্ত কবিতাটির লক্ষ্যস্থানীয়—

“ধোঁত করো মত্ত ধরায় যখন আমার মরণ হবে
নিখুঁত করো ঔর্ধ্বেদেহিক সুরেশ্বরীর একটি তত্ত্ব,—
নেহাৎ যদি খোঁজ পড়ে মার শেষ বিচারের সাজার লাগি”
পাশালাই এই ভিত্তের নীচে কবরটা তো বেঁচেই রবে ।”

অতএব এই একই রকমের রংমশাল অত্যাভাবে জলিয়াছে—

“বাড়িয়ে দিয়ে নিজের গলা আমার সুরার বাঁধন পরি,
উজল তাহার হাসির লোভে জীবনটাকেও তুচ্ছ করি ;
ইত্তরজনে শোষণ করে সুরা দেবীর জীবন-শোণিত
লোলুপ করে বোতলখানায় মরাল গ্রীবা মট্কে ধরি ।”

নেশাখোর মাতালশ্রেণীর সহিত ওমরের সুরা-বিলাসের পার্থক্য
খুঁজিতে চাহিলে উক্ত চতুঃপদীটি পাঠকের কাছে লাগিতে পারে।
কিন্তু ব্যাবর্তব্য-বিচারপরায়ণ তাত্ত্বিকের বিজ্ঞান করিয়া ওমর এ সম্বন্ধে
অতএব বলিয়াছেন—

‘মদিরা পান দোষের, তবে সাবধানেতে সঙ্গী বাছো
চিন্তা ক’রো তুমিই বা কে, ওই বা কে যার প্রসাদ যাচো,
পানটি ক’রো স্বেচ্ছানুধে ; এ তিন দফার বিধান মেনে
বিষম রকম বিজ্ঞ ছাড়া মদিরা কা’র রুচবে আঁচো ?’

এ বিষয়ে আর উদাহরণ বাড়ানো অনাবশ্যক। রুবাইয়ের পর রুবাই
এইরূপ চাপা হাসির দীপ্তিতে উজ্জ্বল। প্রকৃতপক্ষে, এই রক-প্রিয়তাই
কবি ওমর খৈয়ামের রচনাবলীর প্রাণস্বরূপ।

আসল কথা, চন্দ্রে কলকের মতন একাদশ শতাব্দীর পারসিক প্রজার
জীবন্ত বিগ্রহ ওমর খৈয়ামের চরিত্রে এ সকল ক্রৌটি আমরা উপেক্ষার চক্ষেই
দেখি—কিন্তু উহার অস্তিত্ব অস্বীকার করি না। কবি স্বঃও এ বিষয়ে কোন
প্রকার ভাণ করেন নাই।

মুরা ও সাকী-প্ৰীতিই অবশ্য ওমরের কবি-প্রতিভার সর্বস্ব নহে।
তাঁহার জগৎ-জোড়া কবি-বশের কারণ অত্যন্ত খুঁজিতে হইবে। চিত্র-
ওমরের চিন্তা-ধারা ও
স্বাধীন মতবাদ

রহস্যময় জীবন-মরণের সমস্তা, ভগবান ও অমরতা,
ইহজগৎ ও পরলোক প্রভৃতি গুরুতর বিষয়সমূহও
তাঁহার কাব্যের উপদানরূপে গৃহীত হইয়াছে—
কিন্তু স্বভাবতঃ একটি স্বাধীন ও লৌকিক-প্রথা-নিরপেক্ষ চিন্তের অধিকারী
হওয়ায়, ঐ সকল সমস্তার যেরূপ সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হইয়াছেন,
তাহা, তৎকালীন প্রতিষ্ঠিত মতামত ও সাধারণ ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে লুপ্তই
যেন সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছিল। তাঁহার দার্শনিক মতিগতি দুঃখবাক-
প্রবণ হওয়ায়, প্রথমতঃ উহা সংশয়ে ছলিতে থাকে এবং ক্রমে ভগবৎ-
বিধিকে যেন অস্বীকার করিতেই উদ্যত হয়। মাহুয়ের জীবন-পরিচালনায়
কোনো করণীয় ভগবানের কল্যাণ-হস্ত অপেক্ষা কঠোর ভাগ্য ও স্বর্গ
অনুষ্ঠাই তাঁহার চক্ষে অধিক করিয়া পড়ে। সেই জন্যই স্বভাবতঃ পরলোক

অপেক্ষা ইহলোক এবং ভবিষ্যৎ অপেক্ষা বর্তমানই তাঁহার অধিকতর আলোচ্য হইয়া উঠে। এককথায়, তাঁহার চিন্তার গতি সাধারণ গ্রাহ্য নোসলেম ধর্ম-বিশ্বাসের সম্পূর্ণ পরিণতী হইয়া পড়ে। একমাত্র এই কারণেই, পারস্য সাহিত্যে হাকিজ ও কির্দেসীর নাম বারংবার সম্মানে উল্লিখিত হইলেও, ওমরকে বহুকাল অবজ্ঞাতই থাকিতে হয়। ওমরের কৃত্যের এক শত বৎসর পরে লিখিত নজম-উদ্দিন রাজীর ‘মিরসাদ উল-এবাদ’ নামক সুকী ধর্মব্যাখ্যানমূলক পুস্তিকায় ওমরের বিরুদ্ধে যে মন্তব্য আছে, তাহা হইতে বুঝা যায়, কোরানের আলোকে বাহারা জগৎ-সংসার দেখিতে, ওমরের বিরুদ্ধে তাঁহারা কিরূপ খড়গশূন্য হইয়াছিলেন। সে মন্তব্যটি এখানে উদ্ধৃত হইল—

“নির্শল, সমুন্নত ও অপার্থিব আত্মাকে সঙ্গীর্ণ পার্থিব আধারে আবদ্ধ করিয়া পুনরায় ঐ ছাঁচ হইতে দিচ্ছিন্ন করার মূলে যে কি গভীর জ্ঞান বিদ্যমান, তাহা সুপরিস্ফুট। দেখকে ধ্বংস করিয়া শেষ বিচারের দিন উহার উপাদানগুলিকে বিক্ষিপ্ত ও আত্মাকে প্রাণবন্ত করিয়া তোলার উদ্দেশ্যে যে মাহুকে “কোরান-নিদিষ্ট ভ্রান্তি”(১) এড়াইতে সাহায্য করা এবং বাহাতে “অজ্ঞানের ধ্বনিকা”(২) পার হইয়া তাহার আপন আপন রচি ও অহুরাগকে সত্যপথে চালিত করিতে পারে, তজ্জ্ঞতা তাহাদিগকে বহুদূর উচ্চতর সোপানে উন্নীত করা, ইহাও সকলের জানা আছে। কিন্তু, যে সময় হতভাগ্য দার্শনিক ও জড়বাদী এই করণায়ুগল হইতে বঞ্চিত এবং মডিস্ট, তাহারা এমন এক মহামনীষীর সহিত নিরুদ্দেশ

১। “তাহারা জানোয়ারের দল—না—বুঝিবা তাহা অপেক্ষাও ভ্রান্তি”—তারা
গণ্য১৭৮।

২। তাহারা বর্তমানের বাহু দিকই নেখে, কিন্তু ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে নির্ভীক অন্ধ।
জ্ঞান ৩০৭৩।

হইয়া গিয়াছে, যে আপন প্রতিভা, বিদ্যাবত্তা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিজ্ঞতার কণ্ড ভাহাদের মধ্যে সুবিখ্যাত ছিল। সেই মনীষীর নাম ওমর খৈয়াম। সে যে কত বড় নিরলঙ্কার ও নষ্টমতি, তাহার পরিচয় পাইতে হইলে তাহার রচিত বক্ষ্যমান শ্লোক দু'টিই পর্যাপ্ত হইবে—

“দেখছে। যে এই গোলকখানা, মোদের আগম-নিগম গড়া
কোথায় এটার আরম্ভ আর কোথায় বা শেষ যায় না ধরা,
কেউ পারে না এই জগতে,— বাতলে দিতে সহজ কথায়
কোথেকে হয় হেথায় প্রবেশ, কোথায় বা যায় বেরিয়ে পড়া।”

* * * *

“শ্রষ্টা যখন দিয়েছিলেন স্বভাবগতি নির্ধারিয়া
হ্রাসের এবং নাশের অধীন করাটা তার কেমন ক্রিয়া ?
কুরূপ যদি ইহার গঠন,—দায়ী কে সে খুঁতের লাগি ?
নিখুঁত যদি—ধ্বংস করা কেনই বা ফের বও তো মিজা ?”

কিন্তু নজমউদ্দিন রাজীর নিকট কোরানের গভীর জ্ঞান যতই
কোরানের
অসঙ্গতি
সুপরিজ্ঞাত হউক না কেন, ওমর খৈয়াম অবশ্য
উঁহার গোড়ার কথাই মানিয়া লইতে পারেন নাই।
মাহুযের সকল কর্মের প্রাক-বিধান যে গ্রন্থ এটার
কহিতেছে, সে আবার মানব-স্বভাবের “প্রাপ্তি” “অজ্ঞান” প্রভৃতির
কথা তোলে কেন ? সে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য ভগবানের “করণী” হইতে
কোনো কোনো “হতভাগ্য” বঞ্চিতই বা হয় কেন ? নিষেধের ঘোষে ?
একই বিশ্বাসে “প্রাক-বিধান” ও “মাহুযের দায়িত্ব” স্বীকার করায়
মুসলমান ধর্মশাস্ত্রে যে যুক্তি-বিরোধ প্রকাশ পাইয়াছে, ওমরের দার্শনিক
চিন্তা তাহা লক্ষ্য না করিয়া থাকিতেই পারে নাই ; সুতরাং এ হেন শাস্ত্রের
অন্ধ দাসত্বে তিনি কোনো সাঙ্ঘাত্যও পান নাই। ইহা খুবই সত্য যে

তৎকালীন মোল্লা সম্প্রদায়ের বুজুর্কি ও লোক-দেখানো ধার্মিকতার ক্রিয়া-
শক্তি তাঁহার মনকে নিতান্তই তিক্ত করিয়া তুলিয়াছিল—অন্ততঃ তাঁহার
জিজ্ঞাসু চিত্তকে ধর্ম্মাঙ্ক ইমামদিগের বাহ্য ধর্ম্মাচরণের বা শূফীদিগের
রহস্য-গুঢ় সঙ্কেতের ভেঙ্কির সাহায্যে অভিভূত করা নিশ্চয়ই সম্ভব ছিল
না। প্রচলিত শূফী দর্শনের মধ্যে তৃপ্তি পাইতে অথবা কোরানের
অপৌকবেয়ত্বের বিষয়ে নিঃসংশয় হইতে না পারিয়া এবং এতদুভয়ের
ভিতর জীবনের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কোন গ্রহণযোগ্য অর্থারোপের চেষ্টাই না
দেখিয়া তিনি তৎকালীন ধর্ম্মবিশ্বাস হইতে স্থলিত হইয়া পড়েন। কিছুই
তাঁহাকে জীবনমৃত্যুর বিপুল রহস্যভেদে সাহায্য করিতে না পারায় তিনি
বিশ্বাসের আলোকিত দিকে আদিত্তে অক্ষম হন এবং বারংবার তিক্ত
অনুশোচনায় এই বলিয়াই আর্তনাদ করেন যে, জ্ঞানার্জ্জ্বনের জগৎ সমস্ত স্বয়ং
পাতিয়া দিয়াও এইটুকুনা তিনি দেখিতেছেন যে, জগতে তাঁহার আগমনও
যেমন উদ্দেশ্যহীন হইয়াছে, এখান হইতে নিষ্করণও সেইরূপই হইবে—

“বিশ্বভুবনখানির কোলে কোথেকে বা কোন্ কারণে

কিছুই নাহি বুঝতে পারি আসছি ভেসে স্রোতের টানে ;

শূণ্য করি এ কোল আবার দমকা-হাওয়ার ঘূনি বেগে—

বেরিয়ে যাবো কোথায়, কেন—পাইনে রে তার কোনই মানে।”

পানোৎসব বা জীবনের আধোদ-প্রমোদে তাঁহার অন্তরের বেদনাময়
শূন্যস্থান পূর্ণ হইবার নহে ; ফলে প্রাণের উৎসুক্য পরিতৃপ্ত করিবার
উপায়াভাবে তিনি নিতান্তই অশুখী ও অশান্ত। স্বয়ং বিশ্বাসপূর্ণ অথচ
ঐশী নিয়মকে ধরা-ছোঁয়া চলিতেছে না—এই ঘটনাই তাঁহাকে উত্তেজিত
ও স্নিগ্ধ করিয়া তুলিয়াছে, তাঁহার অসীত জগৎসমূহের মধ্যে মাহুকের চিন্তা,
অনুরাগ ও উদ্বেগমূলক জগৎটি মাত্রই তাঁহার নিকট সর্ব্বাপেক্ষা সত্য—
অথচ “কোথা হইতে” “কি জগৎ” বা “কোন্‌খানের” সমস্তা-সমাধানে

মানব চিত্ত যে শক্তিহীন, ইহা তাঁহার অসহ্য। জীবনের প্রতি বিশ্বদৃষ্টিপাত ছাড়া ইহা হইতে তাঁহার অণু কোন লাভেরই আশা নাই। তাঁহার আসায়, বাঁচিয়া থাকায়, বা যাওয়ায়, কোন সম্ভাব্য উদ্দেশ্যের ভরসা কোনো দিকেই দেখা যাইতেছে না। এরূপ অবস্থায় তাঁহার সমসাময়িক অনেকেই হয়তো রহস্যবাদকেই চরম আশ্রয়-ভূমি করিয়া লইতে পারিত, অথবা তালাই লইয়াছিল।—আবার কেহ বা হয়তো ভগবৎ-নির্দ্ধারিত নিখিল চরাচরের নিত্যকালীন সন্থকের উপর ইসলামধর্মের প্রতিষ্ঠা ঘটে নাই জানিয়াও একটা লৌকিক ধর্ম-ভাণকেই আশ্রয় করিয়া খুসী থাকিতে পারিত; কিন্তু ওমরের স্বচ্ছ বিবেক-বুদ্ধি, এবং নিজের নিকট খাঁটি হৃদয় উক্ত পন্থা-যুগলের কোনটিকেই অনুমোদন করে নাই।

আলোকের অণু ওমরের গভীর অনুসন্ধিৎসার মূলে এই ধারণাই দৃঢ় ছিল যে, মানব মনোবীর এমন কোন শক্তি থাকিতে পারে না, যাহা ভগবানের দেওয়া নহে, অথবা এমন কোন স্বাধিকার প্রবণতাও থাকিতে পারে না যাহা স্রষ্টার দান নহে। সুতরাং তাঁহার চিন্তের যে অনুসন্ধিৎসা, একমাত্র ভগবানই তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে তৃপ্ত করিতে পারেন। যদি ভগবানের দেওয়া এই মানব বুদ্ধি ভগবানের উদ্দেশ্য বুঝিবার পক্ষে তাহার একটুও সহায় না হয়—অথচ এই উদ্দেশ্যটি বুঝিবার অষ্টটি ওমর খৈয়াম সর্বাস্তঃকরণে ব্যগ্র—তবে মানুষকে উহার অধিকারী করা কেন?

অগংসংসার একটি সুনিয়মিত উদ্দেশ্যজ্ঞান বিস্তার করিয়া চলিয়াছে

এবং এই কার্য সাধন করিতে করিতে, বাহারা

বিশ্বগ্রন্থ ও

ওমর খৈয়াম

সুনিতে জানে, তাহাদিগকে যেন বলিয়াও

চলিয়াছে যে, এ সময়ের ভিতর এমন একটি

আত্মা বিরাজমান—যাহা সমস্তই জানিতেছে, সমস্তই বিবৃত রাখিয়াছে।

বাহারা দেখিতে জানে, তাহারা বিশ্ব-প্রকৃতির অন্তরে যেন একটি

ব্যক্তিত্বেরই সম্মান পায়, জগতের সুশাসিত ও ধারাবাহিক অবস্থাটি তাহাদিগকে যেন ইহার কোনো শঠা বা চালকের অস্তিত্ব স্বীকারেও অস্বীকারিত করে। মানবাত্মা স্বতঃই একটি উচ্চতর আত্মার সন্ধ খুঁজিয়া বেড়ায় এবং প্রকৃতিকেই প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ভগবান অন্বেষণের একটি উপায় হিসাবে গ্রহণ করিতে চায়।

ওমর খৈয়াম নিম্নে বিখ-প্রকৃতির বিবিধ প্রয়োজনীয় ও নয়নাভিরাম রূপরাজির মধ্যে অধিষ্ঠিত দেখিতেছেন—এত সুন্দর ও প্রয়োজনীয় যে তাহার মধ্যে অপর উদ্দেশ্যও নিহিত না থাকিয়া পারে না; অথচ তাহারা এতই বিচিত্র যে মানব-চিত্তের ধারণা-শক্তি তাহাদিগকে আয়ত্ত করিতেও অক্ষম। বিকশিত গোলাপগুচ্ছ, বীণাকণ্ঠ বুলবুল, নদী-তটস্থিত উদ্ভান, বহু সম্ভানের গরীয়সী জননী ধরিত্রী, গর্জনাভ্যস্তিত সাগর, সীমাহারা নীলাকাশ, অসংখ্য উজ্জল জ্যোতিষ্ক এবং সর্বশেষ মানব স্বয়ং, এই সমস্তই এমনি একটি নিগূঢ় অস্তিত্বের আভাস প্রদান করিতেছে, বাহ্য সমস্তকেই ভরিয়া রাখিয়াছে, সমস্তকেই এক সম্বন্ধ সূত্রে বাঁধিয়াছে। কি উদ্দেশ্যে এই বিশাল বহির্জগৎ উদ্ভুক্ত গ্রন্থখানির মত পার্থক্য আকর্ষণ করিতেছে? উদ্দেশ্য আরোপে অনভ্যন্ত সুকী-পদ্ধতির প্রতিকূলে ওমর এ সমস্তের অন্তর্নিহিত কারণ আবিষ্কার করিতে চাহিয়াছেন, একটি উদ্দেশ্যের পরিকল্পনাকে হিসাবের ভিতর ধরিয়া পাইবার আশা রাখিয়াছেন এবং সেই গূঢ় অভিসন্ধিটি ব্যক্ত করিবার জন্য বারংবার ভ্রমবানের উদ্দেশ্যে দরবারও করিয়াছেন। মানুষের অসম্পূর্ণ শক্তি যে পরিণতিসম্ভাবনাহীন বীজের অনুরূপ হইতে পারে, এরূপ ধারণা তিনি করিতেই পারিতেন না। মানুষের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য যদি উচ্চ ও পবিত্র হয়, তবে চিরন্তন ঐশী নিয়ম কেন না তৎসমূহের উপযোগী করিয়া সংঘটিত হইবে। কিন্তু জীবনে তিনি কি দেখিতে পাইতেছেন? অগত্যা

কে যেন তাঁহাকে ছুট করাইয়া আনিল, আবার তেমনি ছুট করাইয়াই জগতের বাহির করিয়া দিল—তাঁহাকে পছন্দ-অপছন্দের কোনো অবকাশই দিল না ; তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনখানির অভিপ্রায় স্পষ্ট হইতে না-হইতেই জগৎ-জীবন হইতে তাঁহাকে ছিঁড়িয়া ফেলা হইল। কখনও আপনার দৌর্দল্যের, কখনও বা শক্তির অমুভূতি ঘটিতেছে, অথচ এই পরস্পরবিরুদ্ধ ভাবের অধিকার থাকার সহিত জগৎ-মর্যাদার যোগা-যোগটি বুঝিয়া পাওয়া যাইতেছে না বলিয়াই তাঁহার সমস্ত অন্তরাত্মা কাতর। ফলে, ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মের ভিতর মারাত্মক অপূর্ণতাই তিনি দেখিতেছেন—তবু এইটুকুই বুঝিতেছেন না যে নিজে সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী না হইলে এরূপ অসম্পূর্ণতার অভিযোগ অসঙ্গত ; যেহেতু সীমাবদ্ধ মানব কেমন করিয়া সীমাতীরের ধারণা আশা করিতে পারে ? তবে, ঐশ্বর্য নিয়মের কল্পিত ক্রটির বিরুদ্ধে তাঁহার আপত্তি প্রকাশের ভিতর কোনরূপ অশ্রদ্ধা বা রক্ষ নাটকিতার যে আভাসমাত্রও দেখা দেয় নাই, এইটুকুই ওমর খৈয়ামের বৈশিষ্ট্য।

“কারে শুধাই—এই দেশেতে এলাম ছুটে কোথেকে সে ?

কারে শুধাই—এ দেশ থেকে যাবেই বা কোন নিরুদ্দেশে ?

পাত্র ভরি’ পুনঃপুনঃ নিষিদ্ধ ঐ সুরার ধারায়

ডুবাও স্বস্তির বেয়াদবি—তাবনা-ভীতি থাকে রে ভেসে।”

পৃথিবীতে আসা-যাওয়ার উপর যখন নিজের কোনই হাত নাই এবং

ভগবানের উপর গোলকধাঁধগুলির সমস্তা-সমাধানেরও কোনো

প্রতিশোধ গ্রহণ সম্ভাবনা নাই, তখন সাকীর নিকট পিয়ালার দাবী

করাই যন্মের ভাল। মহম্মদের নিকট আত্ম-

প্রকাশের ভিতর দিয়া আল্লা যখন সুরার বিরুদ্ধে নিবেশ-বিধিই প্রচার করিয়াছেন, অপরপক্ষে, মাহুকের আত্মতৃপ্তিরও সুব্যবস্থা করিবার অন্ত

বিশেষ উদ্গ্রীব নহেন—তখনি ভগবানের চক্ষে বাহা মন্দ ও নিষিদ্ধ, তাহাই সর্বাগ্রে গ্রাহ্য করিয়া প্রতিশোধ লওয়া ছাড়া আর কর্তব্য কি? ক্ষণিক-উল্লাসের ভিতর হুচিস্তাগুলি যত ডুবাইয়া রাখা যায়, ততই ভাল। ইহা খুবই সম্ভব যে আইন ভঙ্গ করার উগ্র আয়োদ ছাড়াও, ভাবসাধকদের দশা-প্রাপ্তির চেষ্টাকে বিক্রম করাও ওমরের উদ্দেশ্য। উপবাস ও নিদিধাসনের কালে যে অবস্থা তাঁহার লাভ করিতে চান, ওমর যেন এই নিষিদ্ধ সেবন-উল্লাসের সাহায্যেই তাহা প্রাপ্ত হইতে পারেন। সুকীরা যেমন ঈশ্বরের সহিত যোগসাধনের উপযোগী একটি বিশেষ অবস্থার অমূল্যলন করিয়া থাকেন, ওমরও তেমনি ঈশ্বরকে আমলে না আনিবার জন্য সেই একই অবস্থা লক্ষ্য করিবেন। ভাবপন্থিগণের অভ্যাসের হাস্যজনক অনুকরণে তিনি যেন ভাব-সাধনা-ব্যাপারটিকেই হাসিয়া উড়াইবেন। ব্যঙ্গ, বিদ্রোহ ও হতাশাময় অভিব্যক্তির ভিতর দিয়া সেই ভগবৎ অস্তিত্বেরই নিশ্চয়তার অশ্রু অধিকতর ব্যাঘাত তাঁহাকে দৃষ্ট করিতেছে, যে ভগবানকে অজ্ঞভাবে অনাকাঙ্ক্ষিত মনে করিয়াও তিনি সম্পূর্ণরূপে বঞ্জন করিতে অক্ষম। নৈরাশ্রের প্রচার-বাণীতে বা দুঃখের পীড়নে যে বিষাদ-গীতি বাজিয়া উঠে নাই, ওমরের এই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা বিদ্রোহী আত্মা তাহা ধ্বনিত করিয়া তুলিয়াছে।

“ভুবন হ’তে বাজিয়ে সপ্ত-স্বর্গ-তোরণ-বিজয়-ভেরী,

উর্দ্ধলোকে শটনশ্বরের সিংহাসনও এলাম ঘেরি ;

গমন-পথে কতই না সে রহস্যজাল ছিন্ন হ’ল ;

খুললো না কো শক্ত বাঁধন কেবল যা’ এই অদৃষ্টেরি।”

ওমরের রুবাইগুলিতে সপ্ত তোরণ বা সপ্ত স্বর্গের উল্লেখ বহুবার দেখা যায়। উর্দ্ধতম স্বর্গে—তপোলোকে—ঈশ্বরের আসন রক্ষিত এবং ওমর খৈয়াম উপবাস ও প্রার্থনার সাহায্যে নিজেকে এই স্বর্গে উন্নীত করিয়া-

ছিলেন। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে, চিন্তের একটি বিশেষ প্রকার।

ভগবৎমিলন লাভের চেষ্টা ভাবাস্তর সংগঠনের দ্বারা ভগবানের সহিত
ঐহিক যোগ-সাধনের সম্ভাবনায় বিশ্বাস ভাব-
সাধন-প্রণালীগুলির অঙ্গীকৃত। বেদান্ত, অবশ্য, এই যোগ দু'টি বিভিন্ন]
অস্তিত্ব হিসাবে ভগবানের সহিত মানবের যোগ বলিয়া স্বীকার করেন
না—বরং মানুষের ষষ্ঠাধ্ব স্বরূপেরই পুনঃপ্রাপ্তি বা ঈশ্বরত্বে মানুষের
বিকাশ বলিয়া ম'নেন। তাঁহার মতে মায়িক অজ্ঞানবশত ই এই স্বরূপ
বুদ্ধি লুপ্ত বা স্তম্ভ হইয়া থাকে। জ্ঞানানুশীলনের ভিতর দিয়া ওমর
খৈয়ামও এক অজ্ঞাত উপায়ে ভগবৎ-সান্নিধ্যলাভ করিয়াছিলেন। সে
ব্রহ্মস্বয় ভাব-মিলন দেহ-বন্ধের ভিতর হইতে বা দেহের গণ্ডী অতিক্রম
করিয়া, তাহা ওমর খৈয়াম বলিতে পারেন না। তবে এটুকু তিনি জানেন
যে, অনেক মিথ্যার ও ভ্রমের বন্ধন তাহাতে ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল এবং
বহু বাধাবন্ধও তাহাতে দূরে সরিয়া গিয়াছিল। একটি পরমানন্দময়
মিলনানুভূতিতে ক্ষণকালের জগৎ তাঁহার আকারগত অস্তিত্ব যেন লয়প্রাপ্ত
হইয়াছিল। কিন্তু তিনি যেরূপ আশা করিয়াছিলেন, সে মিলনের ফল
সেইরূপ হয় নাই। চরমতম ব্রহ্মস্বটির মর্শ্বোদ্ধার করিতে পারিবার পূর্বেই
পৃথিবীতে তাঁহাকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয় - সে ব্রহ্ম জীবনের, মৃত্যুর
শাস্ত-পুরুষের।

“দেখহু সে এক রুদ্ধ দ্বার—গেল না তার চাবিই পাওয়া,
তুলছে কি এক কুহেলী-জাল বাহার পারে যায় না চাওয়া,
মুহূর্তকাল “তোমার” “আমার” একটি দু'টি ক্ষণিক কথা—
তাঁহার পরে দৌহার মাঝে বিশ্বরণের বইল হাওয়া।”

যে স্ববনিকা ব্রহ্মস্বরাভিকে আচ্ছন্ন করিয়া
লক্ষ্যমান, তাঁহার আড়াল হইতে তোমার।

আমার একটু আলাপ ঘটিল—তারপর কোথায় তুমি—কোথায় আমি।

এই কথাটির মধ্যস্থ তাৎপর্য বুঝিবার জন্য সুফী-কবি করিম উদ্দীন আস্তর হইতে দু'টি উদ্ধৃতি দিয়া ইহার উদ্দিষ্ট অর্থত্ববাদকে কতক পরিমাণে বোধগম্য করা যাইতেছে।

“রহস্য-স্বনিকা পার হইতে জগৎ-শ্রষ্টা দায়ুদকে বলিলেন,—তুমি আমার প্রতীক মাত্র, যদি ইহা সেই আমি না হই, যাহার প্রতীক বা সমকক্ষ তুমি খুঁজিয়া পাইবে না। যেহেতু কিছুতেই আমার বিনিময় হইতে পারে না, সেজন্ত আমাতেই বাস করা বদ্ধ করিও না। আমিই তোমার অন্তরতম আত্মা; আমি হইতে বিচ্ছিন্ন থাকিও না। আমি অনিবার্য, তুমি আমার আশ্রয় সাপেক্ষ, আমি হইতে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব কামনা করিও না।”

“নিরবধিকাল আমিই তুমি এবং তুমিই আমি—আমরা উভয়েই এক। তুমিই আমি হও অথবা আমিই তুমি হই, এ ব্যাপারে কোনো বৈত আছে কি? হয় আমিই তুমি এবং তুমিই আমি, কিংবা তুমি, স্বয়ং তুমিই। চিরদিনই যখন তুমিই আমি ও আমিই তুমি, তখন আমাদের দু'টি দেহ একই। এই শেষ কথা।

এটি ভগবানের সহিত মিলনের, সুফী মতবাদমূলক একটি উদাহরণ এবং ভারতীয় বৈদান্তিক মতই ইহার উৎস। ওমর খৈয়ামের জন্মের বহু পূর্বে হইতে খোরাসানে বৈদান্তিক মত কয়েক শতাব্দী ধরিয়া প্রসার লাভ করিয়াছিল। বেদান্তের বাণী পারস্যের জনসাধারণের মনে বদ্ধমূল হইয়াছিল। বৈদান্তিক মতের সহিত ওমর খৈয়াম নিশ্চয়ই সুপরিত্রিত ছিলেন এবং সম্ভবতঃ উভয় পদ্ধতির মধ্যেই সত্যাত্মকরণের চেষ্টাও করিয়াছিলেন। ভারতীয় উপনিষদের জ্ঞানাভাসও ওমরের

অনেক চতুর্পদীতে স্পষ্ট লক্ষিত হয় এবং ছান্দোগ্য উপনিষদের “তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো”র আত্মবৃত্তিক উপদেশগুলি হইতেও প্রাচ্য অদ্বৈতবাদের মূল কথাটি এই প্রসঙ্গে স্বয়ং করা যাইতে পারে। আপন স্বাভাব্য ঘুচাইয়া পুনরায় ভগবানে পরিণতি লাভের জন্য, সাধকের আত্মহারা হওয়ার ঐকান্তিক লক্ষ্যের দৃষ্টান্ত জ্বাল উদ্দিন রুমির প্রসঙ্গ এক উপভোগ্য উদাহরণ হইতে স্পষ্ট করিতেছি—

“একজন প্রিয়তমের (ঈশ্বরের) দ্বারে আসিয়া করাঘাত করিতে লাগিল। ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল, “দুয়ারে কে?” আগন্তুক উত্তর করিল,—“আমি।” ভিতরের দর বলিল—“এ বাড়ীতে তোমার ও আমার উভয়ের স্থান নাই।” দ্বার খুলিল না।”

অতঃপর প্রেমিক (মানবাত্মা) নিরুদ্দেশে প্রস্থান করিল এবং নির্জনে প্রার্থনা ও উপবাসাদিতে মন দিল।

বর্ষ পরে পুনরায় প্রিয়তমের রুদ্ধ দ্বারে আসিয়া সে করাঘাত করিল। ভিতর হইতে প্রশ্ন হইল—“কে?” উত্তরে প্রেমিক বলিল—“তুমিই।” দুয়ার খুলিয়া গেল।

অবগুপ্ততা প্রকৃতির কোলে, ওমরও জীনায়েতের কার্যে প্রবৃত্ত হইয়া কোনো এক স্থলগ্নে এমনই এক ভগবৎ-সমাধিলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু অবগুপ্তন আবার স্বস্থান-লব্ধ হইয়া গেল—তুমি ও আমি পৃথক সত্ত্বা বিচ্ছিন্ন হইল,—অনৃষ্ট-বহন অনাবিকৃতই রহিল। সঙ্গার ধরণীকে জিজ্ঞাসা করিয়া ওমর খৈয়াম কোনো উত্তর পাইলেন না। আবর্তিত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী নির্বাক চাহিয়া রহিল—একাক্ষ ইন্দ্রি ও বুদ্ধি শুভিত হইয়া গেল। অবশেষে নৈরাশ্রভরে,—

মুং পিরানায় মিলিয়ে দিলুম অধরখানি

রহস্তটির অর্থটুকু প্রকাশ পথে আনতে টানি’,

ওঠে ওঠে বললে সে গো—“পান ক’র ভাই যাবছীবন
বারেক ম’লে কিরবে না আর এই কথাটাই আসল জানি।

যেন বা একটি দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত অবোধকে বুঝিবার আশা ক্ষণ-
কালের জ্ঞা ছাড়িয়া ওমর স্থির করিলেন—“আচ্ছা, চুলোয় য’ও আপাততঃ ;
ক্ষুণ্ণির সাহায্যেই তোমাকে প্রমাণ করিব ; অতএব “লে আও
পিয়াল।”

পিয়ালার অধর পরশের সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু সঙ্কল্প বদল হইয়া গেল—
ওমরের মনে হইল : —

“উজ্জ্বলিত ঐ কথা যে কুহরনের আভাস ভাষায়—
ঐ পিয়াল।ও ছিল সজীব দুঃখে, স্তখে, ক্ষুংপিপাসায়
হয়তো কোন অতীত যুগে ; শীতল তাহার ওই অধরেই
কতই চুমার আদান প্রদান করতো তখন দিবস নিশায়।

বাক্যধারা প্রাণহীন বস্তুর প্রতি সঙ্গহুভূতির উদ্দেশ্যে কল্পনা-শক্তি
অন্তরতম প্রকৃতিকে আঘাত করিল। “বনস্পতি ওষধিতে এক-দেবতার
অখণ্ড অক্ষয় ঐক্য”-কথ তাঁহার স্মরণে জাগিয়া উঠিল ; জগৎ ও
জগদীশ্বরের ঐক্যবিদ্যক যে বিশ্বাস তাঁহার মধ্যে বহুকাল আছে. তাহারই
স্মর স্মরাপাত্তের ভিতর হইতেও বাজিতে লাগিল।

ওমরকে অনেক লেখক রোমীয় কবি দার্শনিক লুক্রেসিয়াসের সহিত
এমনভাবে তুলনা করিয়াছেন যে, এতদুভয়ের মতামত ও ধ্যান-ধারণার

অভিন্নতা যেন একই প্রকারের। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে
ওমর খৈয়াম ও
লুক্রেসিয়াস
এতদুভয়ের মধ্যে ষথার্থ কোনই মিল নাই।

ওমর খৈয়াম যে সব জিনিষ অতি সহজভাবেই
স্বীকৃত বিষয় হিসাবে গ্রহণ করিয়াছেন, লুক্রেসিয়াস তাঁহার মহাকাব্যে
তাহার অস্তিত্বহীনতা প্রমাণ করিবার জ্ঞা প্রাণান্ত পৰিচ্ছেদ করিয়াছেন।

তাহার দার্শনিক কাব্যগ্রন্থের প্রথমতঃ দ্বিতীয় ভাগে তিনি ইহাই দেখাইতে চাহিয়াছেন যে, জগতের আদিম সৃষ্টির অথবা পরবর্তী পরিচালনার মূলে কোনও প্রকৃত নায়ক ছিল না। অপরপক্ষে, ওমর খৈয়াম কখনও এ বিষয়ে সন্দেহ করেন নাই যে, তিনি ভগবানের সৃষ্টি এবং তাহারই হস্তের ক্রীড়াপুত্তলি। লুক্রেসিয়াস আণবিক তথ্যের ধারাগুলিকে অন্তঃ-প্রকৃতির ব্যাখ্যাকার্য্যে প্রয়োগ করিয়াছেন এবং প্রমাণ করিতে গিয়াছেন যে, দেহের বিনাশে আত্মাও বিনষ্ট হয়,—অপরপক্ষে অমরতার জগৎ ওমরের ব্যাকুলতা এবং উহা প্রমাণ করিতে না পারার জগৎ মর্মান্তিক আক্ষেপ, এমন একটি মানসিক অবস্থার দিকে অভুলি নির্দেশ করিতেছে, যাহা নাস্তিকতা হইতে অনেক বিভিন্ন প্রকৃতির। লুক্রেসিয়াস বলিয়াছেন যে, জগৎ নিজেও যেমন দৈবী নহে, তেমনই আবার দৈবশক্তি-চালিতও নহে। সর্বপ্রকার ধর্মবিশ্বাসেরই শত্রুতাবরণে লুক্রেসিয়াস এখানে কৃতসঙ্কল্প। ওমর খৈয়াম কিন্তু প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত এই জগতের অতি স্বাভাবিক পরিচালনার দৃঢ়-বিশ্বাসী এবং একবারও এমন সংশয় প্রকাশ করেন নাই যে, মানুষের কোন নিয়ামক বা স্রষ্টার অস্তিত্ব না থাকিতেও পারে। এককথায়, লুক্রেসিয়াস ধর্মের এই দুইটি ভিত্তিভূমিকেই অস্বীকার করেন যে, জগতের একজন নিয়ন্তা বিদ্যমান আছেন এবং আত্মার ভবিষ্যৎ-জীবন আছে। অপরপক্ষে ওমর খৈয়াম এই যুগল ভিত্তির প্রথমটিকে সর্বাস্তবরূপেই গ্রাহ্য করিয়াছেন এবং দ্বিতীয়টি সম্বন্ধেও একটি ক্ষীণ আশা প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছেন। বর্তমান উপভোগের প্রবণতায় উভয়েই মিঃভাবাপন্ন বাটে, তবে প্রথম দৃষ্টিতে যতটা মনে হয়, প্রকৃতপক্ষে ততটা নহে। লুক্রেসিয়াস দাবী করেন যে, তিনি সাধনার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছেন। ওমরের আত্মপ্রাণা এতদূর পৌঁছায় নাই। অনেকগুলি দিক আছে—যেখানে এতদুভয়ের

মিল খুব ঘনিষ্ঠ। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে যে, জীবন মূল-কারণ, প্রকৃতির গতিপথ এবং মানবের সহিত ইহার সম্বন্ধ-নির্ণয়ে উভয়েই সমান উৎসুক ; উভয়েরই দার্শনিকতায় ধর্মশাস্ত্রের সহিত বিজ্ঞানের লড়াই সুস্পষ্ট ; উভয়েই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিশ্বপ্রকৃতির ব্যাপারগুলি অধ্যয়নে নিয়োজিত-চিত্ত এবং উভয়েই চিন্তাশীল জীবন বাছিয়া লইয়াছেন। কিন্তু গুরু বিষয়গুলি সম্বন্ধে ধারণা ও বিশ্বাসের বিরোধগুলির তুলনায় এ সকল মিল বৃদ্ধি বা উল্লেখযোগ্যই নহে। কারণ, ওমর আর যাহাই হউন না কেন, নাস্তিক ছিলেন না। তিনি সত্যের একজন সন্ধানী মাত্র ; কিন্তু যাত্রা আরম্ভ করিয়াছেন বিশ্বাসকেই বৃকে লইয়া। উহা সহজাত বিশ্বাস। তিনি ইহার মূল্য প্রমাণ করিতে না পারিলেও ঐ বিশ্বাস অল্প দূর্ব্ব নহে। এ বিশ্বাস এই যে, “ভগবান আছেন।” তাঁহার সলন্ত জীবনে এই বিশ্বাসটির মূল শিথিল হয় নাই। সময়ে সময়ে ভাবনার কুল-কিনারা না পাওয়ার তিনি বলিয়াছেন বটে,—

“দেবতা আর মানুষ নিয়ে কাজ কি মাথা ঘুলিয়ে ফেলায়,
আসছে কালের দু ভাবনা ভাসিয়ে দে সব হাওয়ার ভেলায় ;
ঘুরুক এবার অঙ্গুলি তার এলোকেশের নিবিড় বনে,
কঁাকালে যার সুরার কলস, সুরার পরশ অধর-বেলায়।

তথাপি সুরা বা সাকী কখনও তাঁহার দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করিতে পারে নাই,—ভগবানই তাঁহার দৃষ্টিতে অনাদি-অনন্ত থাকায় বাধা ঘটে নাই,—অথবা মানুষও আপন অস্তিত্বের জগৎ ভগবৎ-নির্ভরতা পরিহার করিতে পারে নাই। এ সম্বন্ধে ওমরের আগাগোড়াকার কথা—

“যাচ্ছে লিখে সচল, কলম, পড়ছে ঝরে আখর-মালা ;
কুথাই রে তোয় ধার্মিকতা, জ্ঞান-গরবের মশাল জ্বালা ;
পিছনে হটে ঐ লেখনী কাটবে না আর একটি কথাও—
মুছতে তারে পারবে না তোয় সাগর-প্রমাণ অশ্রু-ঢালা।”

অদৃষ্টের উপর হস্তক্ষেপ করিবার উপায় অভাবে অসহিষ্ণু হইয়া ওমর
বর্তমান সর্বস্বতায় মধ্যে মধ্যে যেন ও সকল চিন্তা হাসিয়া উড়াইয়া
দার্শনিক যুক্তি দিতেই চাহিয়াছেন। এমনই একটা লঘু মুহূর্ত্তে
ওমর লিখিয়াছেন,—

“বারেক যদি লভ সুরার পাত-অধর-পরশ-প্রীতি—

সকল ‘নেতি’ই মহোন্মাদে উঠবে বলে—‘ইতি’ ‘ইতি’।

অবৈ দেখ যাবৎ জীবন, ভবিষ্যতের ‘নেতি’ আছে,

মধ্যে ‘ইতি’র আশ্বাদনে মূল্য কয়ার নাইকো ভীতি।”

পরিহাস-গত হইলেও এই যুক্তির মধ্যে গভীর চিন্তাশীলতা প্রচ্ছন্ন
রহিয়াছে। “আমি যখন কিছুই না” তিনি বলেন—তখন ক্ষুধি না
করিব কেন? আমি কিছুই ছিলাম না—ভবিষ্যতেও কিছু থাকিব না,
অতএব ‘অতীতের আমি’ বা ‘ভবিষ্যতের আমি’ হইতে ‘বর্তমানের
আমি’ মন্দ কিসে?” ভবিষ্যৎ তাহার মানস-দৃষ্টির সম্মুখে অন্ধকারে
বিলীন থাকায়, বর্তমানই তাহার তুলনার উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে।
কিন্তু নিজের অজ্ঞতা ও দৌর্বল্যের প্রতি ব্যঙ্গ ছাড়া ইহার মধ্যে আরও
অনেক ইঙ্গিত আছে। ইসলাম-একেশ্বরবাদ ও ধরা-বাঁধা কর্মবদ্ধতির
বিরুদ্ধে মুকী মতবাদ অগতঃ প্রতিক্রিয়া হওয়ায়—বিশেষতঃ মহম্মদ-
কবিত ভূমিতে, প্রাচীন বৈদান্তিক চিন্তার, বা ব্রাহ্মণ্য ‘ভূমা’-বাক্যেরই
কলমের চারারূপে গজাইয়া উঠায়—দৃশ্যমান জগতের অলীকতা-বিষয়ক
ধারণাটিকে মুকী-সম্প্রদায় সম্পূর্ণরূপেই তাহাদের ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে
গ্রহণ করিয়াছিলেন। “মারামরমিদমখিলং হিত্বা, ব্রহ্মপদং প্রবিশান্ত
বিদিত্বা” ই, মুকী-মতবাদের মধ্যে এই অগতঃ, অনাত্মার উপর আত্মার
প্রতিবিম্বরূপে দাঁড় করাইয়াছিল। ভগবানই সত্য, কিন্তু জগৎ অলীক—
এই ছিল তখনকার বক্তব্য। ‘ব্রহ্মপদং প্রবিশান্ত’র তাৎপর্য অপেক্ষা
ওমর ধৈর্যম—১০

‘জগতের মায়াময়ত্বই যেন শ্রেণীবিশেষের মধ্যে অধিকতর লক্ষ্যস্থানীয় হইয়া উঠিয়াছিল। এ ক্ষেত্রে ওমর যদি নিজেকে বর্তমানে ‘কিছুই না’ বলিয়া থাকেন, তবে সে উক্তি এক শ্রেণীর প্রচারক যাহা বলিতেন, তাহারই প্রতিধ্বনিমাত্র। এ মতে অতীতের বা জন্মের পূর্বে তিনি (ভগবান না হওয়ার ?) কিছুই ছিলেন না—ভবিষ্যতে বা মৃত্যুর পরে কিছুই থাকিবেন না, আর জগতের অলীকতা সম্বন্ধে উক্ত ভাবুকদিগের ধারণা যদি সত্য হয়, তবে জগতেরই অংশীভূত হওয়ায় বর্তমানেও কিছুই নহেন। তিনি নিজেই যখন অলীক, তখন কাহারও আপত্তির কারণ ন। ঘটাইয়াই একটু আমোদ প্রমোদের অলীকত্বও উৎপাদন করিতে পারেন। আপন মস্তিষ্কের মত তাঁহার পানোৎসবের অস্তিত্বও অলীক ; অতএব ভিন্নস্বাদেরও অযোগ্য।

কিন্তু এ পর্য্যন্ত আমরা তাঁহাকে হয় পরিহাস, আর না হয় যুক্তি ও বিদ্রোহের তাহে পর্য্যায়ক্রমে আঘাত করিয়া আসিতেই দেখিতেছি। এইবার এমন একটি পদ্যের পরিচয় লাভ করিব, যেখানে আশা ও সংশয় পরস্পরকে পরাভূত করিবার জ্ঞান প্রবলবিক্রমে ঘূর্ণমান।

“অতল অপার গোলক মালার কক্ষ-ভ্রমণ-চক্রগুলির মাঝে,
চরমভ্রম পানের লাগি’ সবার তরেই পাত্র সে এক আছে ;
আসবে যখন তোমার পালা, কেলো না কে। কল্‌জ-কাটা খাস,
অসঙ্কোচে পান করো তব, সর্কাবসান অনেক দূরে রাখে।”

“ঝরঝরে তুই হোস রে যদি ধুলোর পোষাক ছেড়ে ধুলোর’পর,
নীলাবরের মাঝখানেতে দাড়াবি এক আত্মা দিগম্বর,—
বসবি বিকুর সিংহাসনে। লজ্জা ভু হব না কি রে তোয়
হেখায় এসে ব’সে থাকার, উঠে খরে তুচ্ছ মেটে ঘর ?”

“অন্ত কিছু নরকে! খৈয়াম, তাঁবুই বটে শরীরখানা ভোর,
নৈশ-বিরাহ লভেন হেথা, বাবশাহ এক-চলার নেশায় ভোর ;

শয্যা বখন ছাড়েন তিনি, যত্ন-নকীব ভাঙতে আসে তাঁর—

নতুন করে খাটায় আবার, বিরাম সময় আসলে গুর।”

এই কবিতাত্রেয়ে ওমর এমন এক আলোকে দেখা দিয়াছেন, বাহ্য অলম্ব কোথাও লক্ষিত হয় নাই। আমরা দেখিয়া আসিয়াছি যে

ভগবদ্ভিখাসীর যে দুইটি প্রধান আশ্রয়, তন্মধ্যে
আত্মার অমরতা ও প্রথমটি ঈশ্বরের অস্তিত্ব ওমরকে দৃঢ়ভাবেই
ওমর ঐশ্বর্যময় অনুপ্রাণিত করিয়াছে। এখানে স্পষ্টতই দেখিতেছি

যে, দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও আত্মার অবিনশ্বরতায় তিনি আত্মবান।

ভাব-তন্ময়তার অনুরাগী না থাকিলেও, ঐ পদ্ধতিটি যে ওমরের পক্ষে
ক্ষতিকর হইতে ছাড়ে নাই, তাহার প্রমাণ—মধ্যে মধ্যে তিনি মানব-
ধর্মের প্রতি অবজ্ঞা ও মানুষের ব্যক্তিবিশেষত্বের প্রতি সংশয়ই প্রকাশ
করিয়াছেন। কিন্তু এখানে সে প্রবণতা সবলে পরিহার করিয়া ব্যক্তি-
বিশেষত্ব—স্বীকারের আবশ্যকতাই যেন তিনি উপলব্ধি করিতেছেন।
আপন চেতনার ভিতর হইতেই যেন তিনি এই মহা সিদ্ধান্তটি মানিয়া
লইয়াছেন—“আমি চিন্তা করি, সুতরাং আমি আছি।” সমস্ত পারি-
পার্শ্বিক মত বিশ্বাসের প্রভাব অতিক্রম করিয়া তিনি নিজেকে এখানে
এক চিরন্তন ও আত্ম-সচেতন বর্ত্তারূপে জানিয়াছেন। জানিয়াছেন
যে, এই আত্মাই—এই জীবে জীবে বিশেষ আত্মাই একীকরণ-মহের সূত্র
নুত্র এবং ইহারই অস্তিত্বের সহিত অবিনশ্বরতার রহস্য বিজড়িত।

অধুনার মধ্যে ধণ্ড আত্মার নিমজ্জন-সম্ভাবনা ওমর বহুদূরই
বিনা আপত্তিতে মানিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু এখানে সর্বব্যাপী অধঃপত্তা
হইতে তাঁহার আত্মা যেন পৃথক যেন বাদশাহের মতই, কিছুদিনের
অলম্ব ছোট ঘরে বাস করিলেও, কোনও বৃহত্তর পরিণতির অভিমুখেই
ধাবমান। সে পরিণতি যেমনই হউক, উহা যে একটা ভাবী-জীবনেরই

নিবেদক, তব্বিরে সন্দেহ নাই। দেহ এখানে ব্যক্তি নহে,—মাতৃষটাকে (ওমরের ভাষায় তাঁবুকে) মৃত্যু আসিয়া উৎপাটন করিবে; কিন্তু অহার ভিতরের বাদশাহ মৃত্যুর অধীন নহে—উহাই আত্মা। এগুলি বিভিন্ন সময়ের রচনাই হউক বা কোনও বিশেষ মুহূর্ত্তেই বিরচিত হউক, প্রাচ্য বিশ্বাসের উচ্চতম স্তরকেই স্পর্শ করিয়াছে।

মৃত্যুর চরম-পানপাত্র আমাদের কাছে, অসকোচে, দীর্ঘনিশ্বাস না ফেলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে—কেন ? কারণ, উহাই ‘সর্বাবসান’ নহে—উচ্চতর ভবিষ্যৎ আমাদের অগ্ন্য প্রতীক্ষায় আছে। দেহবন্ধন পরিহার করিয়া তাহা লাভ করা আবশ্যক। কিন্তু বস্তু ও আত্মার পৃথকরণ কি সম্ভব ? সম্ভব নহে শুধু—ইহাই অপরিহার্য ; দেহ (তাঁবু) মৃত্যুর অধীন, কিন্তু আত্মা (বাদশাহ) চির-গতিশীল।

কিন্তু ওমরের চতুস্পদীতে ভাব-সামঞ্জস্য খুঁজিবার চেষ্টা করা কঠিন। রবরসিকতা তাঁহাকে ছাড়িয়া অধিকক্ষণ অহুপস্থিত থাকিতে পারে না—যেহেতু, গড়িয়া তুলি। অপেক্ষা ভাঙ্গিয়া ফেলিবার দিকেই তাঁহার বৌক বেশী। তবে এটি খুঁই সম্ভব যে, দার্শনিকতার ক্ষেত্রে তাঁহার ব্যঙ্গ-বিদ্রোপগুলি অনেক স্থলেই রঙ্গদর্শনের জগ্যই—অন্তর্যতম বিশ্বাসের অভিব্যক্তি নহে। এমন কি, দৃশ্যতঃ তাঁহার কাব্যের আকার ঐহিক-ভোগসুখপ্রধান মনে হইলেও, উহা কবির অন্তরের প্রতিচ্ছবি কি না, তব্বিরে সন্দেহ হয়।

“আছে কি নেই বিচার করা দার্শনিকের জ্ঞান-নিকষে,

সারাজীবন ভাসিয়ে দেওয়া বীজগণিতের সূত্র বশে,

জের হয়েছে এই জীবনে ; পাইনি তবু এমন কিছু

মেলে না যা সব-ভোলানো, মন-মজানো আক্ষারসে।”

কূল কবিতাটিতে ওমর বলিয়াছেন যে, আত্মা ও অনাত্মার রহস্য

তিনি উহাদের ব্যবহারিক ও যৌগিক উত্তর অর্থেই ‘পরখ’ করিয়াছেন :
কিন্তু উহাদের উদ্দিষ্ট তত্ত্বমতের মধ্যে এমন কোনও উচ্চতাবের সম্ভব

পান নাই, বাহা না কি স্মার ভাণ্ডারে নাই।
ভাবমত্ততা ও হুয়া
মত্ততার ভেদাভেদ
ভাবের নেশাকে এইরূপে মদের নেশার তুল্যতুল্য
করায় উদ্দেশ্য একশ্রেণীর ভণ্ড-ভণ্ডীর প্রতিই

কটাক্ষপাত করা। ওমর বলিতে চাহেন যে, ইহাদের লক্ষ্য
লক্ষ্য হইতে উন্নততর নহে, তবে ভাবের মাতাল ও মদের মাতাল বিভিন্ন
পথে অচেতন অবস্থার উপনীত হয়, এই যা প্রভেদ।

যে শাস্তি কখনও আসে না, তাহার অন্য চির-অশান্ত আত্মার চরম
আবেদন নিম্নোক্ত চতুঃপদীতে প্রকাশ পাইয়াছে :—

“মুক্ত কর আমার প্রভু, ‘বেশী’ ‘কমের’ দ্বন্দ্ব কর দূর ;

ডুবাও আমার তোমার মাঝে, তুমি-আমির হৃদয় কর দূর ,

বৃদ্ধি আমার ঘুরিয়ে মারে মন্দ-ভালর গোলক-ধাঁধায়—

সব চেতনা ভরণ করি’ সদসত্তের সন্দ কর দূর।”

এই সত্যাত্মবোধীট সেই প্রকৃতির লোক—যিনি জীবনের সকল পক্ষই
পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন—জগতের উদ্বেগ ও উল্লাস, আশা ও নৈরাশ্রের

সকল মর্ম্মই চরম করিয়া আনিয়াছেন—এক
ওমরের প্রকৃতি
আনিয়াও অবসাদ ও নৈরাশ্র-জনিত ভিত্তভঙ্গ

সহিত সকলকে বিক্রপেরই সামগ্রী করিয়া তুলিয়াছেন। নিজের সমস্ত
পাণ্ডিত্য, সমস্ত উত্তম নিয়োগ করিয়াও তিনি বাহা পাইলেন না, তাহা
নিখাস-প্রশ্বাসেরই মত সংজ্ঞভাবে পাইয়াছে বলিয়া বাহ্যিক
মর্যাদার দাবী করে, তাহাদিগকে ব্যঙ্গবিদ্ধ করিতে কখনও তিনি
ক্লান্তি অনুভব করেন নাই। তাহাদিগের ধারণা ও বিশ্বাস স্বভাবতই
হ্রাস বা যুক্তির সর্বপ্রকার সম্পর্করহিত, সুতরাং ওমরের নিকট সম্পূর্ণ

মুশাহীদ। আপন বাঁজগণিতের ভূমিকায় স্পষ্টাক্ষরেই এই ব্যাপারের প্রাতি ইঙ্গিত করিয়া তিনি বলিয়াছেন—

“আধুনিককালে যাহারা পাণ্ডিত্যের অভিমান রাখেন, তাঁহাদের আধিকাংশই মিথ্যাকে সত্যের ছদ্মবেশে সংজ্ঞান এবং শিক্ষার অহংকার ও অভিনয়ের গভী ছাড়িয়া কখনও এক-পা’ও অগ্রসর হন না। যৎসামান্য বিদ্যার পুঞ্জিকে নীচ বার্থসিদ্ধি ও ব্যক্তিগত লাভালাভের অবস্থা ক্রীড়াস করিয়া তুলাই তাঁহাদের অভ্যাস। যদি এমন একটা মানুষ তাঁহাদের চোখে পড়ে, যে মুখোদ পরিবার বা প্রতারণা চালাইবার চেষ্টাকে সর্বপ্রথমে পরিহার করিয়াই চলিতে চাড়ে, তবে তাহার উপর এই সমস্ত পণ্ডিতের ঘৃণার আর অন্ত থাকে না : এবং শরাঘাত-ক্ষত বক্ষে বহন করাই দাঁড়ায় সে বেচারীর ভাগ্যালিপি।”

নিম্নোক্ত কবিতাটিতে ওমর নিজেকে এই বলিয়া প্রবোধ দিয়াছেন—

‘জীবন তোমার মন্দ ব’লে কেন খৈয়াম দুঃখে মর ?
অমৃততাপে ফল কি গুনি ? বরং কসে ক্ষুধিত্তি কর।
পাপী যে নয় বিভূর দয়ার নেইকো তাহার কোনই দাবী,
করণ। তো পাপীর তরেই এই আশাতে জীবন ধর।’

এ আত্ম-প্রবোধ যেমন করণ — তেমনই সুন্দর।

জানেন বিষয়ে ওমরের শেষ কথা সংশয়বাদীরই কথা। তাঁহার মতে অজ্ঞেয়বাদ, অনিশ্চয়তা এবং চির সংশয়ই, সকল প্রকার যুক্তির্জক সত্ত্বেও, মানব-জগতের অলঙ্ঘনীয় নিয়ম হইয়া থাকিবে :—

“দেখছো খাসা জগৎ, তবু কিছুই না-ও দেখছো যা-সব ;
কলছো য’তা, অসার সবই, কিছুই নহে তনুছো যা-সব ;

বিশাল ধরার চতুঃসীমার বা'-কিছু পাও, স্বপ্ন শুধু—

ককিকারী,—রক্ত ভেবে যত্নে বুকে লুকাও বা'-সব ।”

মানুষের বোধি ও বুদ্ধি যে সমস্ত ভাব ও যুক্তির আল বুনিয়া চলে,
আসলে তাহা অসার বাগ্‌বিভ্রাস ছাড়া অণু কিছুই নহে। সত্যের
আবরণ উহা কোনও কালেই উন্মোচন করিতে পারিবে না। যত কিছু
প্রচলিত বিশ্বাস, যাবতীয় প্রথা-পদ্ধতি, প্রত্যেকটিই দ্বিধাশূন্য চিন্তে
বর্জন করা আবশ্যক—

“কেউ বা ‘প্রধায়’ সত্য খোঁজে, কেউ বা ‘আচার-ব্যবহারে’

‘নানান মূনির মত’ খেঁটে কেউ, তাহে যাচাই কর্বে তাহে ;

ঘোমটাতানির আড়াল থেকে এদের ডেকে বলছে বাণী—

‘পথের আভাস নেই রে মূঢ়, এই দু’পথের কোনো ধারে’ ।”

“মন্দিরে বা মঠের মাঝে, মসজিদে বা শিক্ষাশালায়,

স্বর্গ-লোভ আর নরক-ভীতি, বক্ষে আগে পালায় পালায় ;

প্রাণের আলোয় বিধির বিধি ঊঠলে অলে জ্ঞানের মূলে,

অসার ও-সব গল্পকথা হৃদয় থেকে ছুটে পলায় ।”

সমস্ত বিশ্ব-ব্যাপারের মধ্যে বাহ্য নুনিশ্চিত, তাহা এই যে,
ধর্মমতমাত্রই অসত্য। ইহা সত্য নহে, বা সত্য হইতেও পারে না যে,
মানুষ কোনও এক দু্যলোক-বাসী খেয়ালী অগদীশ্বরের লীলা-উপভোগ্য
অন্ত, গোড়া হইতেই বিভিন্ন ললাট-লিপি লইয়া দেখা দিরাছে। কিন্তু কি
জ্ঞান আমাদের জীবনধারণ, কি জ্ঞান আমরা সত্যের এবং কি জ্ঞানই বা
মনে করি যে, জড় ও শক্তির সমবায়ের একটি স্বপ্নময় অস্তিত্বের মধ্যে
কলকালের জ্ঞান ফুটিয়া বাহ্য অশুভব করিতেছি, তাহার কারণ বুঝিতেও
সমর্থ—এ সমস্তার নিরাকরণ সম্বন্ধে কবি কোনও সম্ভাব্য সমাধানের
ইঙ্গিত করেন নাই। স্বর্গ-নরক সম্বন্ধে অণুত তিনি বলিয়াছেন—

“জল ঢেলে দে নরক-শিখার, আশুন জালা স্বর্গ জুড়ে ।
সত্য বা’ ভা’ এইটুকু যে জীবনখানা চলছে উড়ে ;
সত্য শুধু এইটুকু, আর বাদবাকী সব নিছক মিছে
বারেক ফুটে মরে রে ফুল চিরকালের চিতায় পুড়ে ।”

ভয় দেখাইয়া বা লুব্ধ করিয়া স্নেহ-সকল জ্ঞানী ধর্মাচরণের প্রবৃত্তি
জাগাইয়াছেন, ওমরের দৃষ্টিতে তাঁহাদের উদ্দেশ্যের দৈন্য তিরস্কারযোগ্য ।
ওমর ভারতীয় দর্শনের দ্বারা প্রভূত পরিমাণেই প্রভাবান্বিত হওয়ায়, ভয়
বা লোভকে কোনও মহৎ উদ্দেশ্যের সহকারী শক্তি-হিসাবে গৃহ্য করা
দূরে থাকুক, অবজ্ঞা করিতেই বাধ্য । জ্ঞানী কখনও স্বর্গ-কামনা করেন
না, বা নরকের ভয়ও রাখেন না । শুধু ভারতীয় কেন, অগ্ৰজও এ সত্য
সমান গ্রাহ্য । জেরেমী টেলার কর্তৃক বিবৃত এক আখ্যানিকা হইতে এ
বিষয়ের একটি স্মরণ দৃষ্টান্ত স্মরণযোগ্য :—

“সেন্ট আইভো কোনও উপলক্ষে সেন্ট লুইসের উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া
পথের মাঝখানে দেখিলেন যে, একটি বিষম-গস্তীর প্রোচা রুমণী এক হাতে
জলপাত্র ও অপর হাতে প্রজ্জ্বলিত মশাল লইয়া চলিয়াছে । স্বাভাবিক
কৌতূহলের বশবর্তী হইয়া আইভো তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন ;
উত্তরে রুমণী বলিল,—আমার উদ্দেশ্য এই মশাল দিয়া স্বর্গকে দগ্ধ করা
এবং এই জ্বলের নিষেকে নরকের আগুন নিভাইয়া দেওয়া ; এরূপ না
করিলে মানুষ ভয় বা আশা পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র ভগবৎ-প্রীতির
অগ্নিই, তাহাকে নিষ্কামভাবে চাহিবে না ।”

“ব’লে গেছেন যে-সব-কথা দূর অতীতের তত্ত্ব-জ্ঞানী
আমাদিগের পূর্বপুরুষ ভক্তগণের আশ্র-বাণী,
গল্প সবই—সুখের কাকে সঙ্গী জনে শুছিয়ে বলা,—
শেষকালেতে পড়তে চলে ঘুমটুকুকেই চরম মানি !”

মৃত্যুর রহস্য—মহা মহামনীষী ও সাধুগণের যুগ-যুগান্তরের চেষ্টার বিরুদ্ধেও রহস্যই থাকিয়া গিয়াছে। দার্শনিক সমাধানই বল, আর ঋষিদের আপ্তবাক্যই বল, সমস্তই সমান মূল্যহীন এবং নিতান্তই রূপকথা। জগতের অন্ধকাররাজির ভিতর হইতে কোনও নিরাপদ ও নিশ্চিত পথ বাহির করিতে অক্ষম হইয়া সকলেই নিজের নিজের গল্প গাঁথিয়া গিয়াছেন এবং নিজেরাও ঐ মৃত্যুর অন্ধকারে মিশাইয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের সমাধান যে সত্য, এইটুকু বলিবার জ্ঞান—মহা মহা জ্ঞানী হওয়া সত্ত্বেও—কিহিন্মা আসাটুকু পর্য্যন্ত সকলেরই সাধ্যাতীত।

সংশয়বাদ ও জাতীয় চরিত্রের উৎসমুখ হইতে একটি বিষয় সুর সমুখিত

হইয়া ওমরের সমস্ত রক্ত-রসিকতার উপর ছড়াইয়া
ওমরের দুঃখবাদ পড়িয়াছে এইটি তাঁহার রোবাইয়াতের কেন্দ্রীয়

সুর। কড়ি ও কোমল উভয় পর্দাতেই এই দুঃখবাদ বাজিয়া উঠিয়াছে। বিপুল বিশাল ও বুদ্ধির অনধিগম্য ব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থলে নিঃসঙ্গ মানবের অপরিণীত নিরাশায় একদিকে যেমন এই দুঃখবাদ অস্তিব্যক্ত—অপর দিকে আবার জীবনের শোক-তাপ-মৃত্যুর ভিতর দিয়াও উহা উচ্ছ্বসিত। একমাত্র সংশয়কে সদিরূপে লইয়া বিশ্বাসহীন মানবের জীবনধারণ যে কি হতাশায়, তাহা নিম্নোক্ত চতুষ্পদীতিতে স্পষ্টীভূত :—

“গির্জা-ঘরের বৈরী আমি, মসজিদে মোর প্রবেশ মানা,

- কোন্ মাটিতে জীবন-স্বামী গড়লে এখন বরাতখানা ?

গেরুয়া-হারী সন্ন্যাসী বা কুশী বারনারীর মতন,

ভবিষ্যে মোর নেইকো আশা, বর্তমানেও দুঃখ নানা।”

এই জাতীয় আর একটি রুবাই সাফোক্রিসেরই বাণী স্বরণ করাইয়া

দেয়—

“বা’ কিছু পাই আমরা সবাই দুঃখ-তাপের এই আগারে,
যখন সেটি শোকের দাহন, কিংবা গাহন আঁখির বীরে,—
তখন শুধু তারাই সুখী, আস্তে যাদের হয় না হেথা ;
কিন্তু যারা এসে আবার, সকাল সকাল সরতে পারে ।”

কিন্তু মানুষ সব সময়েই সম্ভাপ ও বিবর্তন মধ্যে ডুবিয়া থাকিতে পারে
না। জীবন অন্ততঃ বিবিধ ইন্দ্রিয়-ভূমিকর
ওমরের প্রমোদ-
প্রিয়তা প্রমোদের উপকরণ সরবরাহ করিতে উদার-হস্ত।
অতএব সুযোগ ঘটিলে তাহাদিগের আশ্রয় গ্রহণ
করা এবং উহাদিগকে ব্যবহারে লাগাইয়া জীবনধারণ ব্যাপারটিকে
যথাসম্ভব লঘু করিয়া তোলা অসম্ভব নহে। সুতরাং দুঃখবাদ “বাবজীবেং
নুখং জীবৎ” ধরনের লোকায়তিক মতবাদে পরিণত হইয়া গেল এবং
নৃত্য গীতের মধ্যে তত্ত্ব-চিন্তার অবসাদ নিমজ্জিত করার আবশ্যকতাও
দেখা দিল। নিম্নোক্ত পংক্তিচতুষ্টয় লক্ষ্য করিলে উক্ত বিবর্তন স্পষ্ট
হইবে :—

“মরুদেশের বাত্যা বা ঐ স্রোতস্বিনীর স্রোতের মত
এই জীবনের গোলা-দিবস ফুরিয়ে আসে অবিরত ;
আমল তবু দিইনে আমি মনের কোণে দুটো দিনে,—
যে দিনখানা আসছে এবং হরে গেছে যে দিন গত ।”

সংশয়রাজির ভিতর হইতেও কবি বলেন যে, আমাদের অহুত্ব
করিবার যে শক্তি আছে, এইটুকুই আমাদের নিকট একমাত্র নিশ্চিত
বস্তু। মানুষ মিথ্যা হইতে মিথ্যান্তরে যাত্রা করে, এ কথা যদি সত্য হয়
হউক, কিন্তু শরীর নুহ ও মনের দান্য থাকিলে বেড়ার কোলের বুনো
ফুলও তাহার চোখে সুন্দর হইয়া উঠে। একখানি সুন্দর মুখ, ষষ্ঠপ্রান্তের
একটু টোল, একটু প্রীতি-মধুর হাসি, মানব জীবনের বিবিধ ক্রটির সহস্র-

শুণ কতিপূরণ। হরত বা অজুরাগও সর্বশেষে, মনের ভ্রম ছাড়া অন্য কিছুই দাঁড়াইবে না—তথাপি ইহাই আপাততঃ উত্তম ও সত্য বলিয়া অনুমিত হইতেছে এবং ইহা টেকসইও বটে। কাজেই—

‘প্রাণ মন ঢালি, ভালবাসি খালি, গোলাপী-গুণ্ড-ছুটি ;
সুনার সঙ্গ-সোহাগ হইতে হাতের দিইনে ছুটি ;
প্রতিটি অংশে করেছি নিয়োগ তার করণীয় কাজে,
প্রতি-অংশটি এক সময়ে যাবৎ না উঠে ফুটি ।’

নিয়োক্ত তথাই ছুটিতে আরিস্তোভল ও প্লেতোর দার্শনিক-আখ্যায় বাকী এখানে কি সুন্দরভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

“জীবনখানির গোপন কথা হৃদয় যদি হেথায় জানে,
মরণফালেও বুঝবে তবে ঐশীয়ার আসল মানে ;
ধাক্কাতে জীবন চেতনাময়, আজ যদি না বুঝিস কিছুই
কেমন করে ধরবি তা’ কাল চেতনহারা অশাড় প্রাণে ?”
‘সত্যমিছের বিশেষ রেখা—চুলের মত সূক্ষ্ম বা সে,
‘খেই’টি তাহার দেখতে পাবি ‘আলিফ’টিরই অর্ধাভাসে ;
ধরতে যদি পারিস তা’রে, জগৎ হবে আপন অতি—
পৌঁছে গেলেও যেতে পারিস, স্বয়ং জগৎ-পতির পাশে ।”

‘প্রেম’ সম্বন্ধে কবি অতি সুন্দরভাবে বলিয়াছেন—

“প্রেমের প্রতিমা কহিল একদা ভক্তেরে তার ডাকি,—
কেন আজ তুই আমার পূজারী, জানিস, ভক্ত তা কি ?
তোর নয়নের বাতায়ন-পথে যে প্রাণ রয়েছে চাহি’
রঞ্জিত মোরে করিয়া গেছে সে নিছেরি আলোকে আঁকি ।”

জীবনের পথে ওমর খৈয়াম বেপরোয়া পথিক ; যত্ন ও নির্দোষের প্রতি

নির্ভীক তর্জনীহেলন করিয়া' জীবনের দান গ্রহণ করিতে করিতে
অগ্রসর হইয়া চলিয়াছেন—ওষ্ঠের প্রান্তে হাসিটুকু শেষ পর্য্যন্ত

নির্ভীকতা ও
নৈতিকতা।
সভাগ। ক্ষয়রে উদারতা, স্পষ্টবাদিতা এবং
নিঃসঙ্কোচভঙ্গী তাঁহার রুবাই মাত্রকেই যেন
বিশেষ একটি মর্যাদা দান করিয়াছে। জীবনযুদ্ধে

ভয়োত্তম সজীদিগকে প্রোৎসাহিত করিবার জন্য সমরোপযোগী আশ্বাস-
বাণী তাঁহার রসনার নিত্য আগ্রত :—

“সকালবেলায় শপথ করি - ‘রাত কাটাবো অমৃতাপে,
পানশালাতে আর ধাব না, থাকবো না আর কোনোই পাশে।
কিন্তু এ যে বসন্তকাল ; কেমন ক’রে শপথ রাখি !
কেমন ক’রে কাঁধতে বসি, গোলাপ যখন হাত্তে কাঁপে।”

অদৃষ্টের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহবাণী নিক্ষেপের সঙ্গে সঙ্গে ওমরের
উক্তি :—

“শক্তি যদি থাকতো আমার খোদায় স্তম্ভগণা দিতে,
আদেশ দিতাম, আকাশ এবং ভুবনখানা বোঁটিয়ে নিতে ;
গড়িয়ে নিতাম এমন জগৎ, থাকতো যেখানে সম্ভাবনা
পূর্ণ হওয়ার সব বাসনাই, উদ্ভূত যা’ এই মানব-চিত্তে।”

একদিকে যেমন নির্ভীক পথিক, অপর দিকে মর্যাদা বৃদ্ধিতেও
তিনি জগতের অপরাপর বাধীন চিন্তাশীলগণের সমকক্ষ। উন্নত মস্তকে
যদি মানবসমাজে বিচরণ করিতে চাও, তবে ওমরের পরামর্শ :—

“দুঃখ কারেও দিও নাকো এই কথাটি রেখো স্মরণ
জেলো নাকো রোষের আশুন করুতে কারো শাস্তিহরণ ;
অন্তরে না, পীড়ন ক’রে পীড়ন ক’রো আপনাকেই
সাধ যদি রে চিরদিনের আনন্দেই করতে বরণ !

বরং ভাল প্রফুল্লতার মাতিয়ে তোলা একাট প্রাণী,
 নয়কো তবু রোপন করা মরুর বুকে নগর আনি ;
 হাজার হাজার কষেদীকে মুক্ত ক'রে দেওয়ার চেয়ে
 একটি স্বাধীন প্রাণে বরং পরাও প্রেমের বাঁধনখানি ।”

নৈতিক আদর্শেও সে মনীষী নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন না, যিনি না কি
 সকল দার্শনিকতার চূষকটুকুকে এই বলিয়াই মূর্ত্ত করিয়া গিয়াছেন,—

“খাবার মত খানিক রুটি, মাথা গোঁজার একটু কুঁড়ে,
 আছে যাহার, আনন্দ তার নৃত্য করুক স্বদয় জুড়ে ।
 চায় না যে জন দাস্ত কারো, নয়কো নিজে কাহারো দাস,
 তাহার সমান ভাগ্যখানি, কে পাবি বল জগৎ ঘুরে ।”

যে-সকল চতুষ্পদীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় এখানে আমরা গ্রহণ করিলাম,
 তাহা বহু শতাব্দী পূর্বের বটে, তথাপি ইহার আধুনিকত্ব আজ পর্য্যন্ত
 অপরিমিত । দেশ-দেশান্তরের শিক্ষিত সমাজে যে-

শেষ কথা

সবল সমস্তা চিরন্তন, মানব-প্রকৃতির ভিত্তিমূলে
 যে-সকল বৃত্তি চিরনবীন, ধর্ম ও দর্শনের ক্ষেত্রে সে-সকল চিন্তা মৃত্যুঞ্জয়ী
 ওমরের রুবাইগুলি ইঙ্গিত ও সঙ্কেতের ভিতর তাহা ধরিয়া রাখিয়াছে । ওমর
 তাঁহার কবিতার ভিতর দিয়া মানব-সমাজের একটি বিশেষ কল্যাণসাধন
 করিয়াছিলেন এই হিসাবে যে, ফিলিস্তী প্রমুখ কবি-কুলের কাব্য, সে যুগে
 যে প্রভুত্বের লোভ ও লড়াইয়ের প্রবৃত্তি উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল, ওমরের
 দার্শনিকতা-গর্ভ চতুষ্পদীগুলি তাহার গতিরোধ করে ও লোকের মনের
 বৌক অত্র দিকেই কিরাইয়া দেয় । অনেকের বিশ্বাস যে ভারত-সম্রাট
 আকবরের ধর্মমতের ঔদার্য বহুল পরিমাণে ওমরের রুবাইগুলির নিকট ঋণী ।
 এটা অবশ্যই অসম্ভব-কথা, যেহেতু ইহার কোনও ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া
 যায় না ; তবে “আইন-ই আকবরি”র পাঠকমাত্রেরই আনন্দ যে, ওমরের
 রুবাইগুলি আকবরের এত প্রিয় ছিল যে, তিনি হাকিমের একটি করিয়া গজল

পাঠের পর ওমরের একটি কবিতা রুবাই পড়িবার ব্যবস্থা দিরাছিলেন ; কেন না, তাঁহার মতে, প্রথমেই মাদকতা-পানের পর দ্বিতীয়ের অনুপান রসের সঙ্গতি রক্ষার জন্য অপরিহার্য্য ।

অন্ততঃ ৫০০০ রুবাই ওমরের নামের সহিত জড়িত হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে, কিন্তু তাহার সবগুলিই তাঁহার রচিত নহে । সঙ্কলিত রুবাই-এর প্রাচীনতম পাণ্ডুলিপিও ওমরের মৃত্যুর ওমর রচিত রুবাই-এর প্রায় সাড়ে তিন শত বৎসরের পরে গ্রন্থবদ্ধ হওয়ায়, বিশেষতঃ পারস্যের প্রায় প্রত্যেক কবিই কিছু না-কিছু রুবাই আপনাপন গ্রন্থাবলীর অঙ্গীভূত করায়, প্রতিধ্বন-গণের স্মৃতির দোঁরাভ্যে একের রচনা অণ্ডের নামে চলিয়া যাওয়ার খুবই সুযোগ ঘটিয়াছে । তথাপি যে বিশেষজ্ঞেরা কতকগুলি রুবাইকে ওমর-বিরচিত বলিয়া নির্ধারণ করিতে পারিয়াছেন, সে শুধু উহাদের সরল অন্তরের সাক্ষ্য, গঠনের বৈশিষ্ট্য ও বিষয়গত ঐক্য প্রভৃতির বিচার করিয়া ; এবং সেই সঙ্গে ইহাও দেখিয়া যে, ওমর খৈয়ামের চতুস্পদী সংগ্রহের ভিন্ন ভিন্ন পাণ্ডুলিপিতে ঐ সকল রুবাই-এর উল্লেখ সাধারণ । এইরূপ হিসাব-নিকাশের ফলে ২৫০ হইতে ৩০০টি রুবাই মাত্র আসল বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, বাকীগুলি অবশ্যই সংক্ষিপ্ত ।

অনেকের ধারণা আছে যে ফিটজেরল্ডই (Fitzgerald) ওমর খৈয়ামের রুবাই আবিষ্কার করিয়া ইয়োরোপের সহিত প্রথম পরিচয় করাইয়াছেন ।

ওমরের রুবাইয়ের
প্রথম আবিষ্কারক ও
পরিচালক

একথা কিন্তু সত্য নহে, হিব্রু ও আরবী ভাষায়
অধ্যাপক ডাঃ টমাস হাইডই (Dr. Thomas
Hyde) এ সম্মানের অধিকারী । তিনি ১০০০

খৃষ্টাব্দে ওমরের কয়েকটি রুবাই আবিষ্কার করেন ;
ইহার পর বিখ্যাত ঐতিহাসিক এলফিনষ্টোন (Elphinstone) কাকুলের

ইতিহাস সকলনের সময় ওমরের আরও কয়েকটি রুবাই আবিষ্কার করেন। প্রথম অনুবাদকের সম্মানও ফিটজেরল্ডেরও প্রাপ্য নহে; অধ্যাপক হাইডই প্রথম অনুবাদক। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে হামর পুর্গষ্টাল (Hammer Purgstal) ওমর খৈয়ামের কয়েকটি রুবাইয়ের অনুবাদ করেন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে গার্সা—ডা-তাসি (Garcin de Tassy) আরও কয়েকটি নূতন রুবাইয়ের অনুবাদ ও ওমর সম্বন্ধে এক প্রবন্ধ রচনা করেন। ইহার পর, ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ফিটজেরল্ড স্বয়ং অনুবাদ করেন। আজকাল ইয়োরোপে ওমর খৈয়ামের কবিতার যে অসাধারণ আদর হইয়াছে, এডওয়ার্ড ফিটজেরল্ড (Edward Fitzerold) কৃত অনুবাদ হইতে সে আদরের আরম্ভ। ইহার কলেই ইয়োরোপের প্রায় সমস্ত ভাষাতে এবং আমেরিকাতে ওমরের রুবাইয়ের অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। বাস্তবিকই ওমরের রুবাই পাঠের অগ্নি ইয়োরোপ, বিশেষ করিয়া ইংলণ্ড এবং আমেরিকাতে মাদকতা আসিয়াছিল।

ইয়োরোপ, ইংলণ্ড ও আমেরিকার সহিত বাংলার সাহিত্য-শিল্পীগণও ওমরের নামে অরঞ্জন করেন। সুবিখ্যাত রাজেন্দ্রলাল মিত্রের “বিবিধার্থ সংগ্রহ” পত্রে ওমরের কয়েকটি রুবাইয়ের প্রথম বঙ্গভাষায় ওমরের রুবাইয়ের অনুবাদ প্রকাশিত হয়। ইহার পর ওমরের রুবাইয়ের অনুবাদ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে একাধিক সচিত্র সংস্করণও প্রকাশিত হইয়াছে। হিন্দী ও উর্দু ভাষাতেও কয়েকটি অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা হইতে বঙ্গদেশ তথা ভারতবর্ষে ওমর খৈয়ামের কিরূপ আদর হইয়াছে বুঝিতে পারা যায়।

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

পরিসমাপ্তি

জীবন-নাট্য-মাত্রেরই পরিসমাপ্তি ঘটে, মৃত্যুর স্ববনিকা-পাতে । সাধারণতঃ লোক-সমাজে, এই জীবন ও মৃত্যু পরস্পর-বিরোধী বলিয়াই পরিগণিত । কিন্তু বাহারা লোক-শিক্ষক, তাঁহারা এতদ্ব্যয়কে একই ধর্মের পরিপোষকরূপেই দেখিয়া থাকেন ; অন্ততঃ ওমর খৈয়াম, জীবন ও মৃত্যুকে বিরুদ্ধধর্মী না বুঝিয়া পরস্পরের সম্পূরক হিসাবেই দেখিতে অভ্যস্ত ছিলেন । তাঁহার কোনো একটি রুবাইয়ে প্রকাশ—“মৃত্যুকে যে ভয় করি, তাহা মরণ-ভীরুতার জ্ঞান নহে ; যিনি জীবন দিয়াছেন, মরণরূপী হইয়া তিনিই উহা গ্রহণে সমাগত, অতএব মৃত্যু কোনক্রমেই ভয়কর নয় ; তবে যে ভয় পাই, সে শুধু এই জ্ঞান যে, পুণ্যময় জীবন ধাপন করিতে পারি নাই ।”

ওমর খৈয়ামের প্রজ্ঞাদীপ্ত জীবন নাট্যের স্বাভাবিক রিখ-নিয়ম-অনুসারে মৃত্যুতেই পরিসমাপ্ত হইয়াছিল বটে—তথাপি এ সমাপ্তি যেমন অসাধারণ তেমনি বিস্ময়কর । “দার্শনিক ওমর খৈয়াম” শীর্ষক পরিচ্ছেদে আমরা ইঙ্গিত করিয়া আসিয়াছি যে, ওমর খৈয়ামকে যথার্থভাবে বুঝিতে হইলে তাঁহার মৃত্যুকালীন উক্তিগুলির প্রতি সতর্ক লক্ষ্য রাখিতে হইবে । এইবার সেই উক্তিগুলি লিপিবদ্ধ করিবার সময় আসিয়াছে—কিন্তু তৎপূর্বে তাঁহার মৃত্যুর জিহাটি পাঠকের চক্ষে ধরিয়া দেওয়া আবশ্যক ।

সাধারণতঃ, রোগই মৃত্যুর পুরস্কার-রূপে দেখা দেয়—কিন্তু ওমরের পক্ষে এরূপ ঘটে নাই । তবে কি দৈবদুর্ঘটনাবশতঃ ওমরের, অগভাতমৃত্যু ঘটয়াছিল ? উত্তর, —না, তাহাও নহে । তবে ?

সেই কথাই বলিতেছি। প্রথমতঃ, ওমরের অন্ততম ছাত্র ও তাঁহার যত্নবটনার প্রত্যক্ষদর্শী, ইমাম মহম্মদের সাক্ষ্য গ্রহণ করা যাক :—

“ওমর খৈরাম, আবু-সিনার দার্শনিক গ্রন্থ পাঠ করিতেছিলেন। ঐ গ্রন্থের যে অধ্যায়ে “ওহবাদত কসরৎ” (একত্ব ও বহুত্ব) আলোচিত

হইয়াছে, সেই অধ্যায়টি পড়িতে পড়িতে সহসা

প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পঠিত পাতাখানিতে কোন একটি বিনিস রাখিয়া

উহা বন্ধ করেন এবং আমাকে আবেশ করেন—‘সকলকে ডাক, আমি

শেষ উপদেশ দিয়া যাই।’ আদেশানুযায়ী আমরা সকল শিষ্য একত্রিত

হইয়া তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিলাম এবং তিনি আমাদের উপস্থিতি

বেন একেবারেই বিস্মৃত হইয়া, নমাজ পড়িতে দণ্ডায়মান হইলেন।

বিরামের নতজানু হইয়া নতি-সহকারে তিনি বলিতে লাগিলেন—

‘কথাসাধ্য আমি তোমাকেই খুজিয়াছি ভগবন্—ক্ষমা কর আমার সে

অক্ষম আবেশণ,—তোমাকেই যে চাহিয়াছি এইজন্তই সকল কষ্ট,

সকল অপরাধ মাফকরিয়া আমাকে শাস্তি দাও,—আমি আজ

তোমাকেই আত্ম-নিবেদন করিতেছি।’ এই কথাগুলি বলিতে বলিতে

তিনি ভগবানের উদ্দেশে প্রণত হন; অতঃপর আর তাঁহার সংজ্ঞা কিরে

নাই।” (১)

ওমরের যত্ন-বটনার দ্বিতীয় সাক্ষ্য, শহজুরী-লিখিত ইতিহাস। সে ঐতিহাসিক বিবরণটি এই :—

“একদিন ওমর খৈরাম আবু-সিনার দার্শনিক গ্রন্থ “কিতাব-উল-শীকা” অধ্যয়ন করিতেছিলেন। ঐ গ্রন্থের “ওহবাদত কসরৎ” শীর্ষক অধ্যায়টির

দ্বিতীয় বিবরণ যাকথানে সোনার দাঁত-কাটিটি (tooth pick)

রাখিয়া তিনি উঠিয়া দাঁড়ান এবং সহ্যা সমাপ্ত

দেখিয়া নমাজ আরম্ভ করেন। সেদিন তিনি সম্পূর্ণরূপে উপবাসী

ওমর খৈরাম—১১

ছিলেন। যে কার্পেটের উপর দাঁড়াইয়া নমাজ পড়িতেছিলেন, তাহাতেই নতশির হইয়া সহসা উচ্চকণ্ঠে বলেন—‘ভগবন্, বখালাখ্য আমি তোমাকেই চাহিয়াছি; আজ এই ভিক্ষা জানাইয়া তোমার আত্ম-নিবেদন করিতেছি, যেন তোমার করুণা ও ক্ষমা হইতে বঞ্চিত না হই’। ইহার পর তাঁহার নতমস্তক আর উন্নত হয় নাই।”(১)

যতদূর দেখা যাইতেছে, উক্ত দুটি বিবরণই মূলতঃ এক। ইহার দ্বিতীয়টি, প্রথমটির প্রভাবে লিপিবদ্ধ কিনা তাহা বলা যায় না; তবে এই বিবরণের মূলে যে সত্য আছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন বৈধ কারণ নাই। অতীতঃ ওমরের মৃত্যুর এই বিবরণ দেশ-দেশান্তরের বিভিন্ন ভাষায় আজ প্রামাণ্য বলিয়া গৃহীত। এ বিবরণ সত্য হইলে বলিতে হয়—ওমর জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটয়াছিল মৃত্যুর স্বনিকা-পাতে নহে; পরন্তু মৃত্যুর হোমানলে জীবনের স্বেচ্ছাপ্রদত্ত আহুতিতে—আর ঐ মৃত্যুর আড়ালে, ওমর তাঁহাকেই দণ্ডায়মান দেখিয়াছিলেন, যাহাকে তিনি আজীবন বিব্রোহে জলিয়া, বিশ্বাসে গলিয়া, বিজ্ঞপে বিধিয়া, ভক্তিভে কঁদিয়া, খুঁজিয়া ফিরিয়াছেন। এরূপ মৃত্যু কে-কোনো মর-জীবনেরই পরম কাম্য—আর ওমরের এই অপূর্ণ মৃত্যুই তাঁহার আপাতঃ-বৈষম্যময় জীবনের বার্থ দীপিকা। এ দীপিকা ইহাই নির্দেশ করিতেছে, যে ব্যবহারিক জগতে জ্যোতির্বিদ, গণিতবিদ, দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, ভেষজ-শাস্ত্রজ্ঞ ও কবিরূপে সম্মানিত হইলেও, আসলে তিনি ছিলেন একজন পরম ভক্ত; আর তাঁহার জীবনের এই চরম অর্থাৎ প্রকাশ পাইয়াছিল তাঁহার মৃত্যু-চিত্রে। ওমরের শিষ্যসম্প্রদায় তাঁহার “শেষ উপদেশ দিয়া” বাইবার প্রস্তাব কি আলোকে গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিতে

পারি না—তবে তাঁহাদের উপস্থিতি বিন্যস্ত হইয়া নমাজ পড়িতে দণ্ডায়মান হওয়া ওমর বুঝিবা ইহাই শেষে বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে—

“মহা-অনারণ্য-মাঝে নিতরু নির্জনে” কেমন করিয়া, ভক্ত ও ভগবানে মিলন ঘটিয়া থাকে।

ওমর খৈরামের মৃত্যু-তারিখ সাধারণ্যে ৫১৭ হিজরাদ (১১২৩-২৪ খৃষ্টাব্দ) বলিয়া প্রচারিত। কিন্তু সম্বন্ধনযোগ্য প্রমাণাভাবে, স্বর্গীয় অধ্যাপক ব্রাউন (E. G. Brown) ঐ তারিখটির সত্যাসত্য সন্দেহে সম্মত। তাঁহার মতে, ওমরের মৃত্যু ১১১৫—১১৩৫ খৃষ্টাব্দের মধ্যে, অর্থাৎ ১১৩৫ খৃষ্টাব্দেরই অধিকতর নিকটবর্তী সময়ে ঘটিয়া থাকিবে।

কবি হাকেমের মৃত্যুর পর, তাঁহাকে বিধর্মী বিবেচনায় অনেকে “আনাজা” (মৃত্যু-মন্ত্র) পড়িতে অস্বীকার করিয়াছিল বলিয়া শুনা যায়। ওমরের মৃত্যুতে এরূপ দুর্ঘটনা ঘটে নাই। জীবনে তাঁহার শত্রু অনেক ছিল বটে, কিন্তু এই বিষয়ে হাকেম অপেক্ষা তাঁহাকে ভাগ্যবানই বলিতে হয়।

ওমরের ভবিষ্যদ্বাণী তাঁহার ধ্বংস সমাধির ইঙ্গিত করিয়াছিল, মৃত্যুর পর তাঁহার সমাধিটি অবিকল সেইরূপ স্থানেই নির্দিষ্ট হইয়াছিল। যে স্থানের পুষ্পবৃক্ষ বৎসরে দুইবার করিয়া সমাধিগায়ে পুষ্প বর্ষণ করিবে, ঠিক সেইরূপ উজ্জানেই ওমরকে সমাধিস্থ করা হয়। এই সমাধিকে উদ্ভেদ করিয়া ওমরের দেহযুক্ত আত্মা—রোমক-কবি হোরেসের (Horace) উক্তিগুলির অঙ্গসংগে,—আজও বুঝিবা বলিতে পারে—

“...নিঃশেষে কতৃ হব না লুপ্ত, নিশ্চয় ইহা জানি—

সমাধি-আধার, হয়ে যাবে পার, আশার অনেকখানি ;

লাবণ্য লভি, ভাবী-মানবেক, খ্যাতির ভিত্তর দিরা,

হত যাবে কাল, বাড়িয়া চলিব ঘোঁষন বিস্তরিয়া।

মানব-কণ্ঠে জাগিব, একটি চির-পরিচিত নাম,—
 ইতিহাসে আমি হয়তো প্রথম একযোগে সাধিলাম
 জ্যোতিষের সাথে ভেষজ-শাস্ত্র ; বাহু-বিরোধ ভুলে,
 গণিতে-কাব্যে পরিণয়পাশে বাধিলাম প্রাণ-মূলে ।

মৃতের মাঝারে, পরিচিত যা'রা, ছিল আমাদের সনে,
 পাব না তাদের, নরকে অথবা নন্দন-উলবনে ;
 মিলিব তবু বার বার মোরা, মরণের বাধা টুটে—
 মেলে যেন। মৃত,—জীবিত লোকের রক্ত-অধরপুটে ।...

পরিশিষ্ট

রোবাইয়াৎ-ই-ওমর খৈয়াম

শ্রীশুরেশচন্দ্র নন্দী

(১)

জীবের বেহ ছাউনী সম রচিত হয় দুদিন ভরে,
রাজ অতিথি আত্মারে সে বসায় বারেক বড় করে
রাজ অতিথি বিদায় নিলেই ছাউনীকারী হত্যা আচল
ছাউনী খুলে নে যায় আবার নূতন কোন পাশা-বাশে ।

(২)

সুদীর্ঘকাল জ্ঞানের তাঁবু সৃজন করি ওমর খৈয়াম
দহ হ'ল, ধ্বংস হ'ল, লুপ্ত হ'ল তাহার নাম ;
জীবন-সুত্র ছিন্ন হ'ল অদৃষ্টের অস্ত্রাঘাতে,
বুধাই সে যে বিক্রী হ'ল মৃত্যুরূপী দালাল হাতে ।

(৩)

দোষ নিও না সাধুপুরুষ, মাতালের এই মতপানে ;
খোদার দয়া থাকলে মোরাও হ'য়ে যেতাম নিষ্ঠাবান ।
পরিণত হে ধর্মধন, তুমি আমার সত্য-বান্ধি—
কলসারীর শতশয পাশ সাধুর দায়াই হচ্ছে জানি ।

(৪)

তোমার আমার আগেও ছিল দিন রজনীর প্রবর্তন
 তোমার আমার আগেও ছিল সৌর জগৎ বিবর্তন ।
 পায়ের তলার এই যে ধূলি হ'চ্ছে দলন তোমার দ্বারা, ?
 হৃদয় কোন স্থানরীরই ছিল ইহা নয়ন তারা ।

(৫)

ঈশ্বরাম ! কেন কেঁদে বেড়াও জীবন তোমার মন্দ বলে ?
 ক্লেশ করে লাভ কিছু নেই, হর্ব আগাও মরম তলে ।
 নিলাপ যে কোথায় তোমার ক্ষমা পাওয়ার অধিকার ?
 কখন শুধু পাপীর তরেই—দুঃখ কর পরিহার ।

(৬)

সরাপ আনো—সরাপ আনো, হৃদয়ে আজ পূর্ণ আয়ার,
 সুখের হাসি কলিক রহে স্বপ্ন যথা গ্রীষ্ম নিশার ।
 আগো আগো, জীবনটা তো চলেই যাবে ক্রতগতি,
 জীবন তো নরীর মতই প্রাপ্ত হবে সন্নিহ-পতি ।

(৭)

নীতি আমার-সুখের স্রোতে করবে শুধু সন্মরণ,
 হর্ব আমার ভাগ করেছে তবু জ্ঞানের বন্দ-রণ ।
 জগৎ আমার লক্ষী দেবী, বোঝুক তার গেলুম দিতে,
 নিল না সে, বললে শুধু কাল কাটাতে হর্ব চিতে ।

(৮)

মসজিদ সে তাড়িয়ে দিলে, গির্জা হ'ল শত্রু ঘোর,
হায় রে বিধি ! কোন মাটিতে গড়েছ এই চিন্তা ঘোর ?
নষ্ট করি ভণ্ড-সাদু-নষ্ট-রূপা-ভ্রষ্টা-সম
পরকালের সুখের আশা, ইহকালের শান্তি মম ।

(৯)

হায় নৈতিক ! আমার প্রতি করছ কেন অবিচার
পাপের বোঝা চাপিয়ে ঘাড়ে ? দোষ কি আছে অভাগার ?
জ্ঞানাকল ও স্বর্গ-পরীর মুক্ত-কারী আকর্ষণে
টলে বটে চিন্তা আমার, আর ত কিছু পাপ জানি নে ।

(১০)

পাপের পাকে ঝাচ্ছি নেমে, আমার কর উত্তোলন,
ধাক্ক-ভরা চিন্তে কর জ্ঞানের বাতি প্রজ্জ্বলন ।
কষ্ট করে অন্ন করতে হয় যদি গো স্বর্গ-দ্বার,
বদাগতা কোথায় তব ? শ্রমের সে ত' পুরস্কার ।

(১১)

স্বর্গ-সুখের কিংবা চির-নরক ভোগের আশ্বাদন—
অদৃষ্ট মোর কোন্টো আছে করতে নারি নির্ধারণ ।
পারব না ত করতে তব্ব স্বর্গ-সুখের আশার প'ড়ে
প্রথম, বীণা, মদের বাঁটা—মর্ত্য-সুখের বিসর্জন ।

(১২)

ফকরকালে আরা আমার ভবিষ্যতের কার্খাবলী
 জানুত সবি পানুত দিতে এক একটি সকল বলি' ।
 কখনই বা করছি আমি, সে ত কেবল আদেশ তাঁরি,
 তবে কেন নরক-ভোগের শাস্তি পাব বুঝতে নারি ।

(১৩)

ব্যর্থ জাহের সেবার জানী, চির জীবন করলে দান,
 অস্তি, নাস্তি—ব্যর্থ বিচার করছে তোমার অহুধ্যান ।
 বস্তুটি শুক হ'ল শুক যথা ত্রাফা বল,
 সমর থাকতে আমার মত ত্রাফারলে হও সবল ।

(১৪)

শ্রাক্ষা-সুরা পান করেছি সমস্ত এই জীবন ভোর
 অস্তকার এ কাদের* রাতেও মত্ত হবে সখী মোর ;
 বাহর ভোরে পাত্রখানির কর্ত করি' আবেষ্টন,
 অকরে তার চুঘনিব, যক্ষে দিব আলিমন ।

(১৫)

একটি হাতে কোরাণ কেতাব, অগ্ন হাতে মত্ত নিয়ে,
 কব-ভালর মধ্যপথে দাঁড়িয়ে গেছি ধম্মমিয়ে ।
 হুদীল আকাণ বলছে মোরে "মুণ্য তুমি মূলগমান,
 নাই যদিও পুরো দস্তুর অধার্মিকের তুচ্ছ প্রাণ ।"

* কাদের—"শক্তি রজনী", যে রাতে কোরাণ একটি হ হয় ।

(১৩)

সমাজদারে সমাজ কারে বলছে যোরে দার্শনিক,
আল্লা জানেন ভাল নরক একটুও তার নরক ঠিক ;
দুখের কথা—এইটুকুও নরক আমার জান-গোচর,
কে আমি হার ! কেনই এলুম ঘুরতে মিছে পৃথীপর !

(১৭)

পূর্বভাগে উষারানী ধূত্র রেখা অন্ধ নিয়ে
হাসছে বখন, আঁকা-বধূর পবিত্র সে রক্ত দিয়ে
পাজ ভ'রো ! সবাই বলে, “সত্য বড় ভিক্ত লাগে,”
এই কপাতেই প্রমাণ হবে—সত্য লোভে মত্ত-রাগে ।

(১৮)

মসজিদ ও মন্দির হয় একজনেরই তবের গান,
সেই সুরেতেই ঘণ্টা বাজে গির্জা করি কল্পমান ;
ক্রশের চিহ্ন কোলাকুশী, যা কিছু সব তাঁরই তরে,
বিশ্ব ভরি তাঁরই পূজা ভিন্ন ভাবায় ভিন্ন করে ।

(১৯)

অনিচ্ছাতেই পৃথী পরে হ'চ্ছে মোদের বাওরা-আসা,
খেলার পুতুল যেমন, মোরা তেয়ি করি হেলার বাসা !
পেরালা সখি, কোমর বাধ, পাজ ভ'রে যোগাও মদ,
ধ্বংস হবে হিংসা ঘৃণা সংসারের ঐ সব আপদ ।

(২০)

আল্লা বেদিন আনুলে মোরে, সংশ্লিষ্ট চিত্ত মোর,
জীবন হ'তে বুঝু বা, তা ধূত গুল ধাস্ত মোর ।
করতে হবে অনিচ্ছাতেই পৃথী হ'তে নির্গমন ;
জানি না হার ! কেনই মিছে আসা, বাওরা, প্রাণ-ধারণ !

(২১)

হৃদয় আমার শফায়ুত নরক যত্ন-ভরে,
জীবন-পথের শকা বেশী মরণ-পারের পথের চেয়ে ।
এই জীবন, বা নিমেষ তরে দেছেন মোরে অগত-স্বামী,
পরিশোধের সময় হ'লেই কিরিয়ে দিব তাঁরেই আমি ।

(২২)

দ্রাক্ষ-সুধার মহৌষধি দাও আমারে সজীগণ !
পাত্ত-বরণ মুখটি আমার উঠবে হ'য়ে সূচিকণ ;
যত্ন হ'লে সিদ্ধ করি দ্রাক্ষ-সুধার সিদ্ধনেতে,
রক্ষা কর দেহটি মোর দ্রাক্ষা গাছের সিদ্ধকেতে ।

(২৩)

হস্ত আমার সবাই যেন দ্রাক্ষাবধূর স্পর্শ পায়,
চিত্ত থাকে স্মারী সে বর্গপরীর আকাঙ্ক্ষায় !
“প্রাশস্তিত্ব” কর সকলে “দিবেন তোমার-অগত-স্বামী !
আল্লা নিজে দিলে পরেও পাব না তা করতে আমি ।

(২৪)

ভবিষ্যতে কি হবে তাই জানতে ভাবনা ভেবে,
মিছে কেন চিন্তটাকে উষ্মগেতে ভরিয়ে দেবে ?
দূর করে দাও চিন্তা তব, আল্লা ভাবুন ভাবনা তার ;
অদৃষ্ট সে গড়লে যখন, যুক্তি নিলে কই তোমার ?

(২৫)

বিশ্ব-প্রয়াস ব্যর্থ হ'লে তোমার অহুসঙ্কামেতে
অর্থ বল, দৈন্য বল, কিছুই নারে তোমায় পেতে ।
তোমার কথা সবাই বলে, কেউ শোনে না কেমন তর ;
কেউ দেখে না চক্ষু মেলে, সবার কাছেই বিরাজ কর ।

(২৬)

উচ্চতর জীবন-তরে করব বলে নীড়-রচনা
ঘুরে ঘুরে শূন্য-পথে করছি শুধুই আনা-গোনা ।
উচ্চ নীড়ের পথ দেখানে নাই যে কেহ হেথায় তাই,
যে পথ দিয়ে এলুম হেথা সে পথ দিয়েই পালিয়ে যাই ।

(২৭)

এই যে এমন দেহটি যোর, হঠাৎ তোমার শক্তি-বলে,
যত্ন করে রেখেছ তাই শতেক বয়স জীবন চলে ।
সারাটা এই জীবন ধরে পরীক্ষা এই চলছে যোর—
আমার পাপ কি তোমার ক্ষমা কোনটা হবে অধিক জোর ।

গ্রন্থকার-পরিচিতি

১২০৭ বঙ্গাব্দের ১৪ই ভাদ্র শুক্রবার পূর্ণিমা তিথিতে রাজি ১২টা ৫০ বিম্বিতে (ঈশ্বরী ২০এ আগস্ট ১৮২০) প্রাচীন কলকাতার এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে সুরেন্দ্রচন্দ্রের জন্ম হয়। তিনি ভূমিষ্ঠ হন চন্দ্রনগরে বাতুলগায়ে। পিতা অধরচন্দ্র দিল্লীস্থ ডেপুটি কন্ট্রোলার অফ পোস্ট এণ্ড টেলিগ্রাফস-এর সহকারী অডিট অফিসার ছিলেন। তিনি সাহিত্যাহুরাগী ও কাব্যরসিক ছিলেন। দিল্লী প্রবাসকালে কবি হেমচন্দ্রের কাব্য গ্রন্থাবলী তাঁর নিত্যসঙ্গী ছিল। মাতা ভবভারিণী দেবী চন্দ্রনগর-নিবাসী গদাধর পালের কন্যা।

১২০২ ঈশ্বরে ২৩এ জানুয়ারী পিতা অধরচন্দ্রের অকালমৃত্যু ঘটলে সুরেন্দ্রচন্দ্র ভারত সরকারের ডাক ও তাঁর বিভাগে যোগদান করেন। পিতার মৃত্যুপূর্ব হওয়ার এই সময় সংসারের সমস্ত দায়িত্বভার তাঁর ওপর পড়ে। বিধবা মা ও ছোট ছোট পাঁচটি ভাই বোনদের নিয়ে এই সময় তিনি অতি কষ্টে দারিদ্র্যের মধ্যে দিন যাপন করেন। ক্রমশ চাকুরীতে উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সংসারের সকল অভাব, অনটন ও অসচ্ছলতা দূর হয়; সংসারের সকল দিকে পুনরায় শ্রী কীরে আসে।

বাল্যকাল থেকেই সুরেন্দ্রচন্দ্র সাহিত্যাহুরাগী। ছাত্রাবস্থাতেই তাঁর কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ রচনা শক্তির উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে। সেই সময় থেকেই তাঁর কবিতা ও প্রবন্ধ মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। শুধু তাই নয়, এই বয়সেই তিনি ‘আশা’ (১৩১২-১৩) নামে একখানি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন। তখন ‘আশা’ সম্পাদকের অকল্পিত সাহিত্যপ্রীতিতে মুগ্ধ হয়ে বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য তাঁকে ‘অবসর’ (১৩১২-১৪) মাসিক পত্রিকার কার্যালয়ে নিয়ে আসেন। ‘অবসর’ সম্পাদক সুরেন্দ্রচন্দ্রকে সহকারী নিযুক্ত করেন। এখানে উল্লেখ্য যে ‘অবসর’ মাসিকের প্রকৃত সম্পাদক ছিলেন পণ্ডিত সুরেন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য,

যাঁর দেহছায়ায় সুরেশচন্দ্র সাহিত্য-সাধনায় প্রেরণা লাভ করেন। তঁর ‘অবসর’ মাসিকেই নয়, এর পর তিনি মলিনীরঞ্জন পণ্ডিত সম্পাদিত ‘আহুবা’ (১৩১৬), মলিনীরঞ্জন পণ্ডিত ও কণীন্দ্রনাথ পাল সম্পাদিত ‘স্মৃনা’ (১৩১৭), অমূল্যচরণ সেন সম্পাদিত ‘অর্ঘ্য’ (১৩১৮-২০), সুরেশ-নাথ রায় সম্পাদিত ‘ত্রিবেণী’ (১৩২৪), পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ‘সাহিত্য’ (১৩২৮-২৯) প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় সহকারী সম্পাদকের কাজ করেন। এই সমস্ত পত্রিকায় সেই সময় তাঁর অনেক রচনা প্রকাশিত হয়।

‘আহুবা’ পত্রিকার কার্যালয় ছিল মারিকতলায় পণ্ডিত অমূল্যচরণ বোম বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের ‘এডওয়ার্ড ইন্সটিটিউশন’ নামে দিক-প্রতিষ্ঠানে। এটি দিনে ছিল ভাষাশিক্ষার বিজ্ঞালয়; রাত্রিতে কল সাহিত্যের আসর। অনেক নবীন প্রবীণ কবি, সাহিত্যিক, পণ্ডিতমণ্ডলী এখানে সম্মা থেকে সমবেত হতেন। সম্মা থেকে চলত গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, নিবন্ধ, পঠন-পাঠন ও সাহিত্যিক আলাপ-আলোচনা। ‘আহুবা’ মাসিক পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সুরেশচন্দ্র অচিরে পণ্ডিত মহেন্দ্রনাথ বিজ্ঞানিধি, পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ, চারুচন্দ্র মিত্র, বোম্বকেশ মূর্ত্তবী, সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বাণীনাথ নন্দী, হরিশাধন মুখোপাধ্যায়, বোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়, অমিনাশচন্দ্র দাস, বোগেন্দ্রনাথ শুক্ল, কল্পানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়, মোহিতলাল মজুমদার, ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রভাতকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, প্রেমাক্ষর আতর্ষী, হেমেন্দ্রকুমার রায় প্রমুখ সমাগত নবীন-প্রবীণ-কবি-সাহিত্যিক পণ্ডিতদের সঙ্গে পরিচিত হন এবং পরে সকলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বস্বজ্ঞে আবদ্ধ হন। এই সময় (১৩১৬) সুরেশচন্দ্র তাঁর অতি-ছন্দস্বন্দ কবি বিজয়কৃষ্ণ ঘোষের গীতিকবিতা সংগ্রহ “অন্ন” কাব্যগ্রন্থটি সম্পাদনা করেন।

কবি বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (পরে ‘দীপালী’ সম্পাদক) ছিলেন

সেকালের বিখ্যাত মাসিকপত্র ‘মানসী’ পত্রের অন্যতম সম্পাদক। সুরেশচন্দ্রের মত বসন্তকুমারও ছিলেন ডাক ও তার বিভাগের পদস্থ কর্মী। সুরেশচন্দ্র তাঁকে অফিস সহকর্মীরূপে পেরেছিলেন। বসন্তবাবুর পিতামহ বিষ্ণুচরণ চট্টোপাধ্যায় ছিলেন ব্রাহ্ম সমাজের গায়ক। সেই সূত্রে ঠাকুর পরিবারের সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা ছিল। বিশেষ জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর তাঁকে বধেই স্নেহ করতেন। কবিরাজ বসন্তকুমারের সঙ্গে সুরেশচন্দ্র হাঝে মাঝে জোড়ালংকোর ঠাকুর বাড়ী যেতেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কিত। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ তরুণ লেখক সুরেশচন্দ্রকে বিশেষ প্রীতির চক্ষে দেখতেন। এই সময় তিনি সুরেশচন্দ্রকে গী দে ঘোপাসাঁ, আলফঁস বোদে প্রমুখ ফরাসী লেখকদের গল্প বাঙলায় অনুবাদ করতে উপদেশ দেন। সেই উপদেশে সুরেশচন্দ্র প্রবাসী, সাহিত্য, বাশরী, ত্রিবেণী প্রভৃতি মাসিকে অনেকগুলি ফরাসী গল্পের অনুবাদ করে প্রকাশ করেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল এই গল্পগুলি গ্রন্থাকারে ‘পূরবী’ নামে প্রকাশ করবেন। এই সংবাদ ‘প্রবাসী’ পত্রে একাধিক গল্পের পাদ টীকায় প্রকাশিত হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়নি।

সুবিখ্যাত ‘মানসী ও মর্মবাণী’ মাসিক পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক প্রভাতনাথ উপাধ্যায়ের প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়-ও ছিলেন সুরেশচন্দ্রের অফিস সহকর্মী। প্রভাতকুমার ভিন্ন বিভাগীয় উচ্চপদস্থ বয়োজ্যেষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও সুরেশচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতা হতে দেহি হয়নি। কারণ উভয়েই ছিলেন একই পথের পথিক—সাহিত্যতীর্থের পথযাত্রী। প্রভাতকুমার একদিন ‘মানসী ও মর্মবাণী’র অগ্র তাঁর প্রিয় উপাধ্যায়ের তারকনাথ মুখোপাধ্যায়ের একটি জীবনী লেখার জন্য সুরেশচন্দ্রকে আদেশ-অনুরোধ করেন। এই বিষয়ে তিনি সুরেশচন্দ্রকে বিশেষ সাহায্য ও সহযোগিতা করতেন, এ আশাসও দেন। সেই আদেশ-অনুরোধ ও আশাস বাক্যে

অল্পপ্রাণিত হয়ে সুরেশচন্দ্র তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনী রচনার হাড দেন। তারকনাথের আত্মীয়-পরিজন, বন্ধু-বান্ধব প্রভৃতির দ্বারে দ্বারে ঘুরে কিছু দিনের মধ্যে তিনি তারকনাথের প্রায় লুপ্ত বিস্তৃত জীবনের অনেক তথ্য সংগ্রহ করতে সক্ষম হন। কয়েক বছরের আশ্রাণ চেষ্টার ফলে তিনি তারকনাথের বিস্তৃত জীবনী রচনা করেন। জীবনী রচনার দ্বারা তাঁকে সাহায্য ও উৎসাহ দান করেন তাঁদের মধ্যে সাহিত্যাচার্য অক্ষয়চন্দ্র সরকার, স্ত্রী গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রসরাজ অমৃতলাল বসু, তারকনাথের সহপাঠী ব্রজলাল চক্রবর্তী (হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বক্তৃতার সংকলক ও প্রকাশক), প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়, জলধর সেন, মধুসূদনের জীবনীকার কবি নগেন্দ্রনাথ গোস্বামী প্রমুখের নাম স্মরণীয়। জীবনীটি 'মানসী ও মর্মবাণী'তে প্রকাশের কথা ছিল, কিন্তু একটি অপ্রীতিকর ঘটনার জন্ম তা সম্ভব হয়নি। এরপর জলধর সেন 'ভারতবর্ষে' প্রকাশ করার মনস্থ করেন, কিন্তু তাও হয়নি। অবশেষে প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়ের আগ্রহে 'তারকনাথ গঙ্গোপাধ্যায়' জীবনীটি ধারাবাহিকভাবে ১৩২২ সালে 'সাহিত্যে' প্রকাশিত হয়।

পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিজ্ঞানভূষণের ব্যক্তিগত গ্রন্থাগার থেকে সুরেশচন্দ্র পারস্তের অমর কবি শেখ সাদী-র 'গুলিস্তা' ও 'বুস্তা' কাব্য গ্রন্থ দুটি পাঠ করেন। গুলিস্তা ও বুস্তার নীতি উপদেশপূর্ণ গল্পগুলি পাঠ করে মুগ্ধ হন এবং অনেকগুলি গল্প অঙ্কবাদ করেন। অনূদিত গল্পগুলি 'গুলিস্তার গল্প' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। পত্রপত্রিকায় বিজ্ঞাপন পর্বন্ত বেরিয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত কিন্তু এই বইটিও পাঠক সাধারণের মুগ্ধবর্শন ঘটে নি।

'গুলিস্তার গল্প'এর ভূমিকা স্বরূপ সুরেশচন্দ্র কবির সংক্ষিপ্ত জীবনী, 'গুলিস্তা' ও 'বুস্তা' কাব্য গ্রন্থদ্বয়ের পরিচয়-মূলক দুটি প্রবন্ধ রচনা করেন। লেখা দুটি মাসিক 'সাহিত্য' পত্রিকায় ১৩২৮ সনে যথাক্রমে ভাদ্র ও মাঘ

সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই সুনিখিত প্রবন্ধ ছাট পাঠ করে তদানীন্তন বঙ্গবর্তী-সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, প্রবাসী-সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দবাজার পত্রিকা-সম্পাদক প্রফুল্লকুমার সরকার প্রমুখ সুবী সম্পাদকগণ মুগ্ধ হয়ে প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে নিজ নিজ পত্রিকায় প্রশংসা-ব্যঞ্জক মন্তব্য প্রকাশ করে লেখককে অভিনন্দন করেন। সেই উৎসাহে শ্রুরেশচন্দ্র প্রবাসীতে “শেখ সাদীর কসিদা ও গজল,” মাসিক বঙ্গবর্তীতে “কবি শেখ সাদী ও তাঁর বৃত্তা,” ভারতবর্ষে “গুলিস্তার গুল সৌরভ,” আনন্দবাজার পত্রিকায় “কবি শেখ সাদী ও রবীন্দ্রনাথ” প্রভৃতি প্রবন্ধ লেখেন। কবি শেখ সাদীর সঙ্গে কবি রবীন্দ্রনাথের তুলনামূলক প্রবন্ধটি পাঠ করে কবিশ্রদ্ধ রবীন্দ্রনাথ আনন্দিত হন এবং একটি পত্রে লেখককে অভিনন্দন জানিয়ে উৎসাহিত করেন। এছাড়া অজ্ঞাত পত্র-পত্রিকায় তাঁর কবি শেখ সাদীর জীবনকথা সম্পর্কে গবেষণা-মূলক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

এই প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে প্রখ্যাত সাংবাদিক ও সাহিত্যিক স্বর্গগত পাণ্ডকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রাণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, ‘সংস্কৃত, পার্সি, কাশ্মীরী, ও আরব্য প্রভৃতি আধৃত্যাবার আলোচনার জন্তঃ এবারকার মেদিনীপুরের সাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি অধ্যাপক ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় হিন্দু মুসলমানকে আহ্বান করিয়াছেন। বড় আনন্দের বিষয় ললিতকুমারের আহ্বানের পূর্ব হইতে শ্রীশ্রুরেশচন্দ্র নন্দী কাশ্মীরী কবির জীবনকথা কাব্যালোচনা করিয়া ভাবা ও সাহিত্যের প্রকৃত উন্নতিকামী হিন্দু ও মুসলমানের ধন্যবাদ হইয়াছেন। সাদীর জীবন কথা বাব্য পরিচয়, কসিদা ও গজল সম্বন্ধে সাহিত্য, প্রবাসী প্রভৃতি পত্রে শ্রুরেশচন্দ্র যে কয়টি প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, সকলগুলিই মূল্যবান, বঙ্গ সাহিত্যে অপূর্ণ, সুচিহ্নিত, পাণ্ডিত্যপূর্ণ, প্রথম আলোচনা ও গবেষণামূলক প্রবন্ধ। প্রত্যেক সম্বন্ধে লেখকের পরিশ্রম, উৎসাহ সংগ্রহ ও দক্ষতার প্রচুর পরিচয়

পাওয়া যায়। তিনিই বাঙালী সাহিত্যে কাঙ্গালী কবি ও অসামান্য কবিত্ব-সাহিত্যের আলোচনার সূত্রপাত করেন।' (সাহিত্য, কৈশাখ ১৩৩৩)।

বঙ্গাব্দ ১৩৩০ সালে তাদ্র মাসে 'কবি শেখ সাদী' জীবনী গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। বইটির ভূমিকা লেখক ছিলেন আরব্য ও পারস্য ভাষা এবং সাহিত্যে সুপণ্ডিত শামসু-উল-উলুম, খান বাহাদুর অধ্যাপক ডঃ হেদায়েত হোসেন। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে 'কবি শেখ সাদী' সাহিত্যক্ষেত্রে অভাবনীয় আলোড়ন সৃষ্টি করে। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সুখী সাহিত্যিক 'পণ্ডিতমণ্ডলী' কর্তৃক অভূতপূর্ব প্রশংসায় অভিনন্দিত হয়। সমালোচক বীরবল (প্রমথ চৌধুরী) এখটি সম্পর্কে একটি পত্রে লেখককে লেখেন, "আপনার রচিত 'কবি শেখ সাদী' পেয়েছি। এই বই যে আপনি সাদীর সূত্র গ্রন্থ আলোচনা করে লিখেছেন, এতে আমি যারপর নাই সুখী হয়েছি। বাঙালী দেশের হিন্দুরা যে কাঙ্গালী পড়েন না, এটা আমার ক্ষতে নিতান্তই দুঃখের বিষয়। হিন্দু-মুসলমানের মনের মিল তখনই জন্মাবে যখন আমরা পরস্পরের সাহিত্যকে শ্রদ্ধা করতে শিখব। তাছাড়া কাঙ্গালী ভাষা না শিখলে 'আদর' মুসলমান যুগের ইতিহাসও লিখতে পারব না। শেখ সাদীর এই জীবনী বাঙালী পাঠক মাত্রেরই পড়া উচিত। আমাদের একটা অজ্ঞ সংস্কার আছে যে মুসলমান সভ্যতা শুধু ক্ষাত্র সভ্যতা। কিন্তু এই ক্ষাত্রতার অন্তরে যে একটা মত্ত ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা আছে এই-ছোট বইখানির ভিতর তার স্পষ্টই পরিচয় পাওয়া যায়।"

ইম্প্রিয়ারিয়াল লাইব্রেরীর (অধুনা জাতীয় গ্রন্থাগার) গ্রন্থের তৎকালীন বর্ণনামূলক তালিকায়কা বহু ভাষাবিদ পণ্ডিত হুরেলনাথ কুমার বলেন, "The present work has the modest pretension to give within a very small compass a popular exposition and a general survey of the life and works of one of the great poets of

Persian The name of Sadi is not altogether unknown to the literate Bengal and in the modern days of oriental research the songs of the rapt nightingale of Iran has found a world wide appreciation. We greatly appreciate the effort made by the author of this little volume to present the Bengali reading public with a brief survey of the works of the great exponents of the Sufistic poetry. Mr. Nandy exhausts all the sources of information available on the subject."

এরপর সুরেশচন্দ্র পারশুর অমর কবি-জ্যোতির্বিদ 'ওমর খৈয়াম' এর জীবনী রচনার হাত দেন। বাঙলা ভাষার ওমর খৈয়ামের একাধিক অনুবাদ থাকলেও একখানিও ইতিহাসমূলক জীবনী ছিল না। সুদীর্ঘ চার পাঁচ বছর গভীর অধ্যবসায় সহকারে গবেষণা ও আলোচনার ফলে তিনি 'ওমর খৈয়াম' জীবনী গ্রন্থটি রচনা করেন। এই গ্রন্থের অন্তর্গত প্রবন্ধগুলি যখন 'প্রবাসী,' 'বহুমতী,' 'ভারতবর্ষ' ও 'কল্লোল' প্রভৃতি বিভিন্ন মাসিকে প্রকাশিত হতে থাকে তখনই মূল্য সাহিত্যিক পণ্ডিতমহলে বেশ একটু সাদা পড়ে যায়। প্রবন্ধগুলির উপর আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়, স্ত্রী যত্ননাথ সরকার, হেমেন্দ্র প্রসাদ ঘোষ, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, অলখর সেন প্রমুখের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং সেগুলি প্রভূত প্রশংসাধন্য হয়। প্রবন্ধগুলির ইতিহাসিক ও সাহিত্যিক মূল্য প্রথম ধরা পড়ে সুবিখ্যাত সাংবাদিক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের পাণ্ডিত্যের কষ্টিপাথরে। তিনি বিভিন্ন মাসিক পত্রে প্রকাশিত ওমর খৈয়াম সম্পর্কীয় প্রবন্ধগুলির অংশবিশেষ কখনওবা সম্পূর্ণ প্রবন্ধটিই নিজ সম্পাদিত প্রবাসী পত্রের 'কষ্টিপাথর' বিভাগে প্রকাশ করেন। আর স্ত্রী যত্ননাথ সরকার প্রবন্ধগুলি পাঠ করে মুগ্ধ বিন্মিত হয়ে স্বতঃপ্রসূত হয়ে গ্রন্থের বিস্তৃত কৃত্তিকা

লিখে দেন। কবি “শেখ সাদীর” মত “ওমর খৈয়াম”ও সে যুগের কবি সাহিত্যিক সুখী পণ্ডিতমণ্ডলী ও বিখ্যাত পত্র পত্রিকা কতক অভূতপূর্ব সমাদর ও প্রভুত প্রশংসা লাভে ধৃত হয়। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক স্বর্গত রমেশচন্দ্র মজুমদার বইটি পাঠ করে লিখেছিলেন— “সুরেশচন্দ্র নন্দী প্রণীত ওমর খৈয়াম গ্রন্থখানি পাঠ করিয়া সুখী হইলাম। বিশ্ববিখ্যাত কবি ওমর খৈয়ামের বহুমুখী প্রতিভার পরিচয় এবং তৎসঙ্গে খোরাসানের ইসলাম সংস্কৃতির এই রূপ বিস্তৃত আলোচনা অত্র কোন গ্রন্থে পড়ি নাই। গ্রন্থখানি বাংলা সাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি করিয়াছে ইহা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করি। কবি ওমর খৈয়ামের নাম সুপরিচিত হইলেও তাঁহার সম্বন্ধে যে বহু নূতন তথ্য এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহার জন্য গ্রন্থকারের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা নিবেদন করি।”

বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসকার আচার্য শ্রীসুকুমার সেন লিখেছেন, “ওমর খৈয়ামের রুবাই ও জীবনী সম্বন্ধে শিক্ষিত জগতের কৌতূহল অপরিমীম। আমাদের সেই কৌতূহল অনেকটা মিটিয়েছেন স্বর্গত সুরেশচন্দ্র নন্দী এই গ্রন্থটিতে। তিনি এ কাজের সম্পূর্ণ উপযুক্ত ছিলেন। তিনি শেখ সাদী প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক, কারগী কবিতার আলোচনার ও অনুবাদে সর্বিশেষ স্বাচ্ছন্দ্য দেখিয়েছিলেন এবং তাঁর সময়ে তিনি একাধিক পত্রিকা সম্পাদনে ও প্রবন্ধ রচনায় কৃতিত্ব দেখিয়ে গিয়েছেন...”

‘ওমর খৈয়াম’ রচনা শেষ করে সুরেশচন্দ্র বাঙালীর গৌরব অতীত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের বিস্তৃত জীবনী প্রণয়নে মনোনিবেশ করেন। কয়েক বছর গবেষণার কলে তিনি ‘মাসিক বসুমতী’, ‘হিতবাদী’, ‘অর্চনা’, ‘উদয়ন’ প্রভৃতি মাসিক পত্রিকার অষ্ট-দশটি প্রবন্ধ রচনা করে প্রকাশ করেন। এই সময় হঠাৎ তাঁকে পারিবারিক নানা কারণে ব্যস্ত থাকতে হয়। কলে জীবনী রচনা কার্য আর অগ্রসর হয়নি। এর পর দীর্ঘকাল তিনি সাহিত্যজগৎ থেকে সম্পূর্ণ দূরে সরে ছিলেন।

১৯৪৫ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে সুরেশচন্দ্র চক্করী থেকে অবসর গ্রহণ করেন, এর কিছুকাল পর তিনি বরানগরে নিজ রুত্ত বাসভবনে স্থায়ীভাবে বাস করতে থাকেন। এই সময় তিনি প্রচুর অবসর পান এবং পুনরায় সাহিত্যসেবার আত্মনিয়োগ করেন। তিনি সাংবাদিক গুরু হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, বঙ্গবীর কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস, ভারতীয় ভার্সিটিজের ইতিহাস, গান্ধীর শিল্প, ও অতীশ দীপকর শ্রীজ্ঞানের জীবনী রচনায় হস্তক্ষেপ করেন। এই সকল গ্রন্থের উপকরণ সংগ্রহের ব্যাপারে তিনি দিনের বেশীর ভাগ সময় জাতীয় গ্রন্থাগারে অভিযাত্রিত করতেন এবং বাড়ী কিংবে গভীর রাত্রি পর্যন্ত সেইসব উপকরণ অবলম্বনে প্রবন্ধ রচনা কার্ঘ্যে ব্যাপৃত থাকতেন।

এইভাবে কিছুকাল যাওয়ার পর হঠাৎ তাঁর মানসিক পরিবর্তন ঘটে। একদিন ‘উদ্বোধন’ অফিসে একজন সন্ন্যাসী বন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সন্ন্যাসী বন্ধুটি ঐ দিন দীর্ঘ সময় তাঁর সঙ্গে ভক্তি ও ভক্তিশাস্ত্র সম্বন্ধে গভীর আলোচনা করেন এবং পরিশেষে সন্ন্যাসী বন্ধু তাঁকে ‘ভক্তিতত্ত্ব’ বিষয়ে প্রবন্ধ রচনার অল্প অনুরোধ করেন।

ভক্তিতত্ত্ব বিষয়টি সুরেশচন্দ্রের মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করে। তিনি সকল রচনাকার্য পরিত্যাগ করে কেবল মাত্র ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন ও আলোচনার আত্মনিয়োগ করেন। এর ফলশ্রুতিস্বরূপ কিছু কালের মধ্যেই তিনি বৈদিক শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধাবৃত্তি, ভক্তিবৃত্তি, ভক্তিতত্ত্ব, শ্রীতিতত্ত্ব, ভীষ্মের শ্রীকৃষ্ণ শ্রীতি, মন ও ইন্দ্রির এক বুদ্ধিবোগ প্রভৃতি অধ্যাত্মবিষয়ক দার্শনিক প্রবন্ধ প্রণয়ন করেন। এই সমস্ত প্রবন্ধ তাঁর জীবদ্দশায় ও মৃত্যুর পর ‘উদ্বোধন’ ও ‘মাসিক বসুমতী’তে প্রকাশিত হয়।

বঙ্গাব্দ ১৩৬৩ সালের ৪ঠা মাঘ (ইংরেজী ১৮ই জানুয়ারী ১৯৫৭) সকাল নটার সময় হঠাৎ তিনি সেমিট্রাল থ্রম্বসিস রোগাক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করিলেন।

নির্দেশিকা

অরিস্তোডল— ৮২, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৯০, ৯২

অকর ওয়াইন্ড— ১০৫,

অল-কিনী— ৩৪, ৪৩, ৭৭, ৯০, ৯১, ৯২, ১২২

অল-কুরাজুনির— ৩৭

অল-গজালী— ৭০, ৭৩, ৭৪, ৭৫

‘অল-অবর ওয়াল মোকাবলা’— ৩৫

অল-কলসফা— ৮৬-৮৯, ৯৩, ৯৪

অল ক্যারাবী— ৪৪, ৭৭, ৯০, ৯৩, ১২২

অল বালামী— ১৬

অল বৈহাকী— ১০

‘অল-মওয়ালীন অল-সানী’— ৯১

অল-মাজেস্তে— ৪৭

অল শহরতানী— ১০

অল-শেখ-অল-যুনানী— ৮৭

অল-সিদ্ধ-হিন্দ— ৪৭

অল-হরিরী— ১৬

অল-হামদানী— ১৬

‘আইন-ই-আকবরি’— ১৫৭

আকবর-উল-উলেমা— ৭৮

আজা-ইব-উল-বিলাদান— ৭

‘আতশকদা’— ১১৬

আনুসারী, কবি— ১০, ১৬, ১২২

আকগানিস্তান— ৭

আফ্রাভুন-ই-মিশরী— ৮৭

আবদুল রশিদ, কাজি— ৭১

আবদুল রজ্জাক— ৭০

আবদুল হসন আল-বৈহাকী—৭৬

আবীউর্রাদী—১৬

আবু আলি সিনা (আবুসিনা)— ১৮, ২৬, ৩৮, ৪৪, ৪৫, ৭৭, ৮০, ২০
২১—২৩, ১২২, ১২৩, ১৬১

আবু ইমাম গজ্জালী—১০

আবু জকারিয়া আল হসর— ৩৩

আবু তাহির—২৭, ২৮, ৩৮, ৩৯

আবু নসর আল-ইসমাইল—৭৫

আবু নসর কুন্দুরী ১৬

আবু রাইহান-আল-বেক্রনী— ৪৮, ৪৯, ৫২, ৬২

আবুল ওয়াকফা - ৩৫

আবুলওয়ালি মহম্মদ বিন আহমদ (ইবনে য়োশেদ)— ৪২, ৪৭

আবুল কতেহ আবদুল রহমান খাজির— ৫৪

আবুল কতেহ ইবন কুশাক— ৫৫

আবুল কতেহ মুহম্মদ শহরস্থানী—৮৭

আবুল-হাসান-আল-আহোমাদী—৪৬

আবু শকর—১২১, ১২২

আবু সাদ—৬০

‘আবুসিনার অবতার’—১২, ৩৮, ৬৪

আবু সৈয়দ—১২২

আকাস বংশীয় খলিফা— ২

আমীর আলী— ১১২

আমীর ইয়াকুব—১২১

আৰ্য্য ভট্ট—৩৪, ৪৬

আর দাশির বাপাকান—৭

আরিস্তোতল—১৮, ২১, ২৫, ৪২, ৪৪, ১৫৫

আলেকজান্দ্রিয়া—৮৮, ৮৯

আসজাদি (কবি)—১২২,

আসাব-উল-বিলাদ—৩৭

আসাদী—১০

আহমদ-ই-হাগানী—১৬

ইউক্লিড—৩৮, ৮১, ৮২

ইএমলিকাশ—৮৯

ইত্তিরা লাইব্রেরী—৪১

ইবন কোশাক—৫৪

ইবন খল্লিখান—১২, ২০, ২৪

ইবন রোশদ—৪২, ৪৪, ৭৭, ৯০, ৯৩, ১২২

ইব্রাহিম বিন-হাবিব-অল খাজারি—৪৬

ইমল-উল-কেয়াড—৬৮, ৬৯

ইমাম উদ্দিন খাতির—১১৬

ইমাম উলহার ম্যোনের—৭৪

ইলম্ অল-জবর ওয়াল মোকাবল—৩৩

ইলম-উল-কালাম—৬৮

ইলম-উল-তফিসির—৫৮

ইলম-উল-হদীস—৬৮

ইয়াকুব বিন্ তারিখ—৪৬

ইয়াহানি—৪৫, ৫৪, ৫৮, ৫৯, ৭০

এডওয়ার্ড গীঘন—৫৬

এরেশা—৬৫

এনাঙ্গাগোয়াস—২৫

এপিকিউয়াস—১০৫

‘এরাইয়ান্ন নকিসা’—৭৫

এলকিন টোন—১৫৮

‘ওরাবৎ-অল-আন্ননে’—১২

ওস্তি—৫৪

‘ওহবাদত কসন্ন’—১৬১

কনস্তান্তিনোপল—৬৫

‘কবি-পরগঘর’—১০

কসিদা—১০

কাট—১০৭

কারী—৬২, ৭০, ৭১

‘কিতাব উল-কাহ্ন’—২৪

কিরন্ন—৬২, ৭০

কীরাম—৭

কীশই—২

‘কুবাসনামা’—১৬, ২৩, ১২১

খলিকা অল মায়ুন—৮৫

খলিকা আলি—৮৪

খাকান-শাগন-উল-মুন্ড—৮১

খাকান-শাম-উল-মুন্ড—৬১

খুলাস২ উল-আগন্ন—১১৭

মওরাক্কি উদ্দিন—১৬,২৭

মনহুর—২০

‘মনিরত্ব বিজ্ঞান’—৬৩

মলিক-উল-খোদারা—১১০

মলিক শাহ—৮০,৮১,১১০

‘মলিক-উল-খোদারা’—১১০

মহম্মদ আওফি—১১৬

মহম্মদ ইবন মুসা। অল খোদারেশহী খোদারেশহী—৩৪

মহম্মদ কাজী—৫৪

মহম্মদ বিন আহমদ মামুরি বাহকি—৫৯

মহম্মদ শহজুরি—৬৬,৭০,৭১,৭৬,৭৭

মহম্মদ হামছুরা মুস্তাওফি—১১৬

মামুন—২২,২৩,২০,৩০

মামুন—২২,২০,৩০

মামুন ইবন নজিব ওস্তি—৫৯

মামুন—৪০,৫৪,৬১

মিজান-উল-হিকাম—৬৫

‘মিযাত-ই-জাহান-নাশা’—৭২

মিরসাদ-উল-এবাদ—

মিশর—১১,২০,৪৭

মুনাজ্জিদ-ই-মাহী—৫০,৫৭,৮১,১১৪

মুনাজ্জিদ—১২১

মুর্শী। উগেক—৪১

‘মুসকিলাত-ই হিসাব’—৪১

মুতানব্বা—১৬

- সুইজি (কবি)—১১০
 বেসোপটেমিরা—৬৫
 ‘ম্যাকাবথ’—১০৭
 ম্যাসিনাস—২৭, ২৮
 ম্যাপলোনিয়স—৮০
 রকি-ই-নিশাপুরী—১০
 রসিদ উদ্দিন—১৬
 রাজা সলোমন—৮৪
 রাজা রাজেন্দ্রলাল বিজ্ঞ—১৫০
 রুমকী, অক্ষ কবি—৩, ১৬, ১২১
 রুমী—৭
 ‘লওরাজিয়-উল-আরকিনা’—৬৫
 লকানী অল্ হরিরী—১৬
 লিবারী—৪১
 লীডেন পাঠাগার—৪০, ৪১,
 লুকম্যান—৮৪
 লুডক আলি বেগ—১১৬
 ‘লুবার-উল-আলবাব’—১১৬
 লুফেসিরাস—১০৫, ১৪২, ১৪৩
 ডেললুক—৪৮, ৫০, ৫৪, ৮০
 শইজুরী—৭০, ৭৬ ১৬১
 শহরতানী—১২৭
 শায়স-ই-কাইস—১২১
 শাহ ভানুরস্—৭
 শাহনাবা—১৬

- শেখ আবু ইলিয়াস আবু হুসাইন—১২২, ১২৩
 শেখ সাঈদী, কবি—১০
 শেখজিলা—৪১
 শোপেনহায়ার—৪২, ১০৮
 সত্যজিৎ—২৫, ২৭, ১০০, ১০২
 সঙ্কর—৮১
 'সজরী পঞ্জিকা'—৫৪
 সদরউদ্দিন মহম্মদ বিন-অল-মুজাক্কর—৬১
 সাকোরিল্লা—১৫৩
 সবার কন্দ—১১২
 'সীকা'—২৩ ২৪
 সুর ও হুবাফি অল-ককতুল—৩৩
 'সুরাৎ-উল-জোবা'—৫২
 সুলতান অল-অরসলান—৫১
 সুলতান আলি উদ্দিন—৪০, ৫০, ৫১, ৫৩, ৫৫
 সুলতান মলিকশাহ—৫০, ৫৮, ৫৫, ৪০, ৫১, ৫৩
 সুলতান সঙ্কর—৫৪, ৫৫, ৬৬, ১১২
 সেন্সিটিভ—১০৭
 সেমনার—৭
 সেন্ট লুইস—১৫২
 সেন্ট আইভো—১৫২
 সেন (কডোভা)—৪২
 সৈয়দ আলি বিন মহম্মদ আল-হুসেনী—৮০, ১১৭
 হকিম—৮৭
 হকিম আবুল আব্বাস লোকবী—৫৪

হকিম-ই-মওসিনি—

হল্যাও—৪০

ডঃ টমাস হাইড—১৫৮

হাজী খলিকা—৫৭

হাকিম—১৩২, ১৫৭, ১৬৩

হাবান ১০

হামদুল্লা মুস্তাফি—১২, ৩৬, ৬৩

হামার পূর্ণিষ্ঠান—১৫২

হারিদি—১৬

হারুন আল রসিদ—২০

হার্কাট স্পেনসার—২৮

হাসান আলী ইব্ন ইশাক—১৬

হাসান ইবনে ইশাক—১০

হালান বিন সফা—১৬

হিলা—৫৮

হীরা—৬০

হুজুর-উল-ইসলাম—৭৩

হুজুর-উল-হক—১৭, ৭৬

হিপোক্রেতস—১৮, ২৫

হোরেনস—১৬৩

- 'A History of Classical Scholarship'—୮୧, ୮୨
 'A Literary History of Persia'—୧୭, ୨୧, ୨୬, ୨୭୨, ୨୨୦
 Alberuni's India—୭୫
 Alexendria—୮୮, ୫୨, ୮୨
 'Algebra'—୭୭
 Anaxagoras—୮୭
 'Arabic Medical Works'—୨୨, ୨୧
 'Arabic Thought and its place in History'—୮୭
 Arab scholasticism, ୨୬
 Aristotle—୨୮, ୫୨, ୨୧, ୮୨, ୮୧
 Bankipure Catalogue—୨୭
 Beal—୨୦
 Book of Victory—୨୧
 Broune, Prof. E. G.—୨୭, ୨୭୭
 Calderwood—୨୦୨
 Carra de vauz—୨୭
 "Catalogue of Arabic and Persian Manuscripts in the
 Oriental Public Library"—୨୨୧
 'Catalogue of Oudh Mss.'—୨୨୧
 'Catalogue of Oriental Manuscripts in the
 • Leyden University Library—୨୨୧, ୭୧
 Catalogue of Persian Mss. kept in the India
 Office Library—୨୧
 Catalogue of Persian and Arable Mss. kept in
 the Oriental Public Library, Bankipore—୨୧
 "Civillization of Ancient India"—୭୦
 Colebrook's Dessertation—୭୧
 Cyclo of Education—୭୧, ୫୬
 Decline and fall of the Roman Empire—୫୨, ୮୧ ୧୭

De Lacy ୭' Lary—୮୭

Democritus—୧୦୧

Divine Dialogues—୨୭

Diophantus—୭, ୫୬, ୭୫

Dozy—୬୬୩

Dutta, R. C—୭୦

Eclecticism—୮୮

'Encyclo'. Britanica—୨୬, ୭୦, ୭୫, ୭୧, ୭୭, ୫୬, ୫୭, ୫୮, ୫୯

'Encyclo' of Educations—୭୭

'Encyclo. of Islam'—୭୭, ୭୫, ୫୭, ୫୫, ୫୬, ୫୭, ୫୮

'Encyclo' of Religion and Ethics—୮୨, ୮୫, ୮୧, ୮୩, ୮୮, ୫୭,
୫୧, ୫୫, ୫୭

Epicurus—୬୦୧

'Essays on Religion of the Parsis'—୫୦

Exodus—୬୦୦

Fall and Decline of Roman Empire—୭୭, ୮୩

Fitzgerald, Edward—୬୧୮, ୬୧୭

Gallan—୬୮

Garcin de Tassy—୬୧୭

Gauss, Edmond—୭୫

Geographie d' Abul Feda—୧୦, ୧୧, ୧୭

Gerald Murmann—୫୬

Gibbon, Edward—୧୭, ୮୩, ୮୮

Goethe—୬୦୧

Hammer Purgstal—୬୧୭

Haug, Martin, Prof.—୫୭

Heracitus—୨୧, ୨୩

Herman, Dr. Ette—୨୧

Heron Allen, Edward—୮୩, ୨୭

Herbert Spencer—୨୮

Hippocrates—१८

'Historic dis sciences Mathematicquesen Itall'—८१

'History of Eastern Philosophers—८७

'History of Mathematics—७८, ७९, ८१

'History of Philosophy—८६

History of Sanskrit Litarature—७०, ७८

'Horace—१७७

Hyde, Dr. Thomas—१६८

Iamblicus—८२

Irani, Prof. K. D. J—१२०

Introduction. Quatriaens of Omar Khayyam—६७

Intreduction. Rubaiyyat of Omar Khayyam—८१, २७

Intultions of the Mind—२८

Jackson—८७

'Journal of Royal Asiatic Society'—१७

Levy—१२२

Libri—८१

'Litarary History of Parsla'—१७, २१

'Litarary History of the Arabs'—२८, ७०

Lucretius—१०६

Macdonald—६७, ८७

Macdonell, A. A.—६०, ७८

Maarit 1925—७२

M. F. Woespeck—८१

'Moral Philosophy'—१०२

Morris—८६

Mrs. Batson's Commentary—२७

Monroe—७१, ८१

Muslim Theology—६७

- Nicholson, R. A.—୧୫, ୭୦
 Neoplatonism—୪୭, ୪୮
 'Nouv. Jour. Asiatique'—୫୬
 Oriental Biographical Dictionary—୧.
 Oscar Wilde—୧୦୧
 Persian Literature—୧୧୧
 Persian Prosody—୧୧୦
 'Phaedo'—୩୧
 Philostratus—୪୩
 Plato—୧୧, ୪୧, ୪୨, ୪୪, ୩୧, ୩୨, ୧୦୭, ୧୧୧
 Plotinus—୧୧, ୪୨, ୪୩
 Porphyry—୪୩
 Prince of Philosophers—୩୩
 Reinaud—୧୦, ୧୧, ୧୭
 'Republic'—୩୧
 Sachau—୭୫
 Samuel Smith—୧୧୧
 Sandys—୪୧, ୩୩
 Schopenhauer—୩୩
 Sheddilot—୫୬
 'Specimen Calculi Fluxionals'—୫୬
 Spranger, Dr.—୧୧୭
 Ueberwg—୪୧
 Whinfield, E. H.—୧୭
 Woepeck, M. F—୫୬
 'Yet more light on Umar Khayyam'—୧୭
 Zoraster—୫୭



